সংসার-মঙ্গল-বিজ্ঞান

উপেক্ষিতের উপকারিতা

রায় শ্রীযুত তারকনাথ সাধু সি, আই, ই, বাহাদুর

প্রণীত

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির

[বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড]

১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

মূল্য—৬'০০ টাকা

শ্রীমণীন্দ্রলাল দত্ত কর্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতা রমানাথ সাধুর উদ্দেশ্যে—

বাবা,

উদ্ভিজ্জ ব্যবসায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আপনি ভেষজ-বিশারদ নামে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বদেশী গাছগাছড়ার গুণাগুণ আপনার নখদর্পণে প্রতিফলিত হইত। বহু প্রসিদ্ধ চিকিৎসকও এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার অকাল-বিয়োগ জন্য আপনার পদতলে বসিয়া সে বিদ্যা শিক্ষা করিবার সুযোগ আমার হয় নাই। তাই আইন ব্যবসায়ে—সরকারী কার্য্যের বিরলপ্রাপ্ত অবসরের ভিতরও বাঙ্গালীর কল্যাণপ্রদ খাদ্য-নিচয়—অনাদৃত দেশী ভেষজসমূহের যথাসাধ্য অনুশীলন করিয়া এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি। আপনার পুণ্যস্মৃতি স্মরণে আপনাকে ইহা নিবেদন করিলাম।

সরকারী উকিলের খাসকামরা
কলিকাতা, ২০শে আষাঢ়
১৩৪২

সেবক
শ্রীতারকনাথ সাধু

মুখবন্ধ

আমরা গন্ধবণিক্ জাতি, দ্রব্যগুণবিষয়ে চর্চ্চা আমাদের জন্মগত অধিকার। হিন্দু রাজত্বে গন্ধবণিক্ জাতিই যে রাসায়নিক দ্রব্য ঔষধ-বিক্রেতা (Chemist and Druggist) ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বর্ত্তমান যুগেও গন্ধবণিক্-সমাজ-গৌরব বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় সেই ব্যবসায়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

অধুনাতন কবিরাজেরা অনেকেই গাছ-গাছড়া চেনেন না,—জানেন না। গাছ-গাছড়ার গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁহাদের পুঁথিগত বিদ্যা থাকিতে পারে, কিন্তু জিনিস চেনার বিষয়ে জ্ঞান অতি অল্প। গন্ধবণিকগণ যাঁহারা এই বিষয়ে চর্চ্চা করিতেন, তাঁহারাও এখন এই বিষয়ে উদাসীন। ফলে গাছ-গাছড়া চেনার ভার চাষী, মালী ও বেদেদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। দেশ-জাত অনেক দ্রব্যেরই নাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সব নাম সকলের জানা নাই। এই সব কারণে স্বদেশ ও বিদেশজাত দ্রব্যগুলির নাম, উৎপত্তিস্থান ও গুণাবলী জানা বিশেষ প্রয়োজন।

গন্ধবণিক্ জাতির একটি সভা আছে। গত ১২ বৎসর যাবৎ প্রতিবর্ষে সেই সভার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। সেই সভার একটি অধিবেশনে আমি প্রস্তাব করি যে, উদ্যমশীল গন্ধবণিক্ যুবকগণ প্রত্যেকে এক একটি দ্রব্য বা গাছ লইয়া চর্চ্চা করিবেন এবং সেই বিষয়ে একটি করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিবেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করি। 'গন্ধবণিক' নামে—গন্ধবণিক্‌দিগের একখানি নিজস্ব মাসিকপত্রও আছে। এই সম্মেলনে আমি প্রস্তাব করি যে, প্রত্যেক

গন্ধবণিক্ যুবক দেশী গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে যে আলোচনা ও চর্চ্চা করিবেন, তাহা প্রবন্ধাকারে 'গন্ধবণিক্ পত্রিকায়' ছাপা হইবে। কিন্তু এক বৎসর পরে যখন দেখিলাম যে, কোন গন্ধবণিক্ যুবকই একটিও প্রবন্ধ রচনা করেন নাই, তখন গন্ধবণিক্ যুবকগণের স্বদেশের উন্নতি বিষয়ে এইরূপ তাচ্ছিল্যে মর্ম্মাহত হইয়া, আমি নিজে এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করি। আজ ১০ বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি দ্রব্যের আলোচনা ও গবেষণা করিয়া 'গন্ধবণিক' ও 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রচার করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য ও প্রয়োজনীয় হওয়ায় এ সকল বিষয়ে আরও কিছু আলোচনার জন্য অনেকে অনুরোধ করেন। পাঠকগণের উৎসাহ পাইয়া আমি দীর্ঘকাল এ সকল বিষয়ে যথাসাধ্য চর্চ্চা করিয়া আসিতেছি। সেই প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া ছাপাইবার প্রস্তাব আমার বন্ধুপুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট জানাই। তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হইয়া প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

যে সব দ্রব্যের উপকারিতা বা গুণ অনেকেই জানেন না—যাহা শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে উপেক্ষিত, সেই সব দ্রব্যের গুণাগুণ—জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনায় পূর্ণ বলিয়া এই পুস্তকখানির নাম হইয়াছে "উপেক্ষিতের উপকারিতা"। আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক জিনিস নূতন শিখিবেন ও আনন্দ অনুভব করিবেন। গৃহলক্ষ্মীরা যদি এই জিনিসগুলির উপকার বুঝিয়া উহা ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

সরকারী উকিলের খাসকামরা
কলিকাতা, ২০শে আষাঢ়
১৩৪২

শ্রীতারকনাথ সাধু

সূচী

উপেক্ষিতের উপকারিতা

—(০)—

শাক

শাক বলিলে আমরা সচরাচর শাকপাতাই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় শাকশব্দে পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, মূল, মজ্জাদিও শাক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তাই হেমচন্দ্র অভিধানে দেখি, শাক দশবিধ—

"মূল-পত্র-করীবাগ্র-ফল-কাণ্ডাধিবাঢ়কাঃ।
ত্বক্ পুষ্পং কবকং শাকং দশধা শিগ্রকঞ্চ তৎ॥"

(শিগ্রকং=শাক)

১। মূল—যেমন মূলা
২। পত্র— " পলতা
৩। অঙ্কুর— " বংশাদির অঙ্কুর
৪। অগ্র— " বেতাদির ডগা
৫। ফল— " কুষ্মাণ্ডাদি
৬। কাণ্ড—" উৎপলাদির কাণ্ড
৭। মজ্জা—" খর্জ্জুরাদির মজ্জা

৮। ত্বক্—যেমন ছোলঙ্গাদির ত্বক্
৯। পুষ্প— " রক্তকাঞ্চনাদির ফুল
১০। কবক—" ছত্রিকা বা ব্যাঙের ছাতা

আবার শাকবৃক্ষ অর্থে সেগুনগাছ।

সে যাহা হউক, আমরা এই প্রবন্ধে কেবল শাকপাতার কথাই বলিব। কারণ, সাধারণ বাঙ্গালীর দেহধারণ কেবল শাকপাতা খাইয়া।

আজকাল কালিয়া, পোলাও, কোর্ম্মা, কাবাব না দিলে নিমন্ত্রিত লোকেরা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দু রমণীগণ শাক-রন্ধনেও কতই কৃতিত্ব দেখাইতেন। আর পুরুষেরাও শাক খাইতে খাইতে রাঁধুনির কতই না সুখ্যাতি করিতেন।

তাই আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাঠ করি—

"শাকেতে ঈশ্বর বড় প্রীত ইহা জানি—
নানা শাক দিলেন প্রকার দশখানি।"

এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবও শাক ভোজন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—

"আমি ত' এমন কভু নাহি খাই শাক
সকল বিচিত্র যত করিয়াছ পাক।"

আচার্য্যদেব দধি, দুগ্ধ ও নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু কেবল দশ প্রকার শাকেরই প্রশংসা করিলেন।

আবার কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে দেখিতে পাই, যেদিন ধনপতি সদাগর দশ জন বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান করিয়া খুল্লনা সতীকে রন্ধন করিবার জন্য আদেশ করিলেন—

"প্রভুর আদেশ ধরি রান্ধয়ে খুল্লনা নারী
স্মরিয়া সর্ব্বমঙ্গলা

* * * * *

ঘৃতে নালিতার শাক তৈলেতে বেথুয়া পাক
বোদালি হিলঞ্চ শাক কাটিয়া করিলা পাক,"

ইত্যাদি বহুবিধ শাক রন্ধনের প্রক্রিয়া দেখি—

কেন না, তাঁহাদের—"বনশাকে বড়ই পীরিতি" ছিল।

এখনকার দিনে মা-লক্ষ্মীরা পোলাও, কালিয়া এবং মাংস রন্ধন করিয়া নিমন্ত্রিত লোকজনকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, তাই কাজের বাটীতে কেবল পেঁয়াজের গন্ধে সমস্ত বাটীটা তোলপাড় করিয়া ফেলে।

আর তখনকার দিনে খুল্লনা দেবী যখন রন্ধন করিতে বসিলেন, তখন প্রথমই রন্ধন করিলেন অন্ন আর শাকপাতা, আর কবি বলিলেন—

"শুভক্ষণে খুল্লনা করিল অন্ন রন্ধ
প্রথম রন্ধনে উঠে অমৃতের গন্ধ।"

আবার পরিবেশন করিবার সময় খুল্লনা সতী স্বয়ং

"প্রথমে সুক্তার ঝোল দিল ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করয়ে সবে খুল্লনার পাক॥"

অন্যদিকে চাঁদ সদাগরের পত্নী সনকা দেবীকে দেখিতে পাই রন্ধনে তিনিও সিদ্ধহস্তা—

"স্নান করিল গিয়া বণিক্-সুন্দরী
রন্ধন করিতে যায় অতি তাড়াতাড়ি।
* * * * *
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বরদান
মুই যেন রন্ধন করি অমৃত সমান।"

কি কি শাক রন্ধন করিলেন, শুনিবেন ?—

"পাটায় ছেঁচিয়া নেয় পলতার পাতা
রান্ধেন বেগুন দিয়া ধনিয়া পলতা।

জবানী পুড়িয়া ঘৃতে করিল ঘন পাক
সাজ ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতা শাক।
কোমল বেথয়া শাক করিয়া কেচা কেচা
নাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে দিয়া আদা ছেঁচা।
নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমড়ার শাক।
একে একে দশ শাক করিলেন পাক।"

সুতরাং তখনকার দিনে শাক রন্ধন করিয়া রমণীগণ যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেন, আজকাল তাঁহারা পোলাও-কালিয়া রান্ধিয়া সে সুখ্যাতি পান কি না সন্দেহ।

আর আজকাল আমাদের মা-লক্ষ্মীরা শাক রাঁধিতে ভুলিয়া গিয়াছেন; আর পুরুষগণের ত' কথাই নাই। তাঁহারা পাতে শাক দেখিলেই নাক সিট্‌কাইয়া উঠেন; বলেন, আমরা কি গরু যে শাকপাতা খাইয়া উদর পূর্ণ করিব ?

পুনশ্চ আমরা বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশে পাঠ করি—

"স্বচ্ছন্দ-বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কূর্য্যাৎ পাতকং মহৎ।

অর্থাৎ বনমধ্যে স্বভাবজাত শাক দ্বারাই যখন উদর পূর্ণ করিয়া জীবন-ধারণ করা যায়, তখন অকারণে এই পোড়া পেটের জন্য প্রাণিবধ করিয়া মাংস-ভক্ষণ-মহাপাপে লিপ্ত হইবে কে ?

আবার দেখি, বকরূপী ধর্ম্ম যখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে চারিটি প্রশ্ন

করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক প্রশ্ন ছিল, "কশ্চ মোদতে, অর্থাৎ সুখী কে" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন—

"দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ···বারিচর স মোদতে।"

যিনি দিবসের শেষভাগে শাক দিয়াও অন্নাহার করেন, তিনিই সুখী।

সুতরাং শাক-ভোজনের প্রশংসা তখন হইতে প্রসিদ্ধ এবং ধর্ম্মে অনুমোদিত।

বাস্তবিক ইহাই হিন্দুর ধর্ম্মাদেশ। আমরা কিন্তু এখন আর সে আদেশ মানি না, কেবল মাংস-ভক্ষণের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াই। কেহ কেহ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আওড়াইয়া বলিয়া থাকেন—

"শাকং ভিনত্তি বপুরস্থি নিহন্তি নেত্রং
বর্ণং বিনাশয়তি রক্তমথাপি শুক্রম্।
প্রজ্ঞাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে পলিতঞ্চ নূনং
হন্তি স্মৃতিং গতিমিতি প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ॥
শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগাস্তে হেতবো দেহবিনাশনায়।
তস্মাদ্ বুধঃ শাকবিবর্জ্জনন্তু কুর্য্যাৎ তথাম্লেষু স এব দোষঃ॥"

অস্যার্থ—শাকে শরীর ও অস্থি নাশ করে, নেত্র, বর্ণ, রক্ত, শুক্র, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও গতি সমুদয়ই বিনষ্ট করে; এবং ইহা অকালে বার্দ্ধক্য জন্মাইয়া থাকে। এমন কি, শাকে সমস্ত রোগই বাস করে, তাই ইহা শরীর-বিনাশের মূল। অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি শাক পরিত্যাগ করিবেন, ইত্যাদি।

আরও বলিয়া থাকেন—

"মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রস-পাকয়োঃ।"

অস্যার্থ—সমস্ত মাংসই বায়ুনাশক, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, তৃপ্তি-প্রদ, গুরুপাক, হৃদ্য, মধুররস ও মধুরবিপাক।

কথাটা কতদূর সত্য জানি না, তবে আমরা এখন ধর্ম্মনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে দীর্ঘজীবী দেখিতে পাই; তাহার অর্দ্ধেক পরিমিত কাল মাংসাহারিগণকে জীবিত দেখিতে পাই না।—মাংসাহারিগণের মধ্যে অনেকেই বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া, অকালে ভববন্ধন মোচন করিয়া, পুত্রকন্যাকে কাঁদাইয়া কোথায় পলায়ন করেন।

আর স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এখনও যত বড় বড় পণ্ডিত জীবিত আছেন, তাঁহাদের স্মরণশক্তির বা মেধার অভাব দেখা যায় না।

যেদিন নবদ্বীপাধিপতি লোকমুখে রমানাথ তর্কসিদ্ধান্তের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে কিছু নিষ্কর ভূমির বন্দোবস্ত করিয়া দিবার মানসে তাঁহাকে পণ্ডিতোচিত ভাষায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার কিছু অনুপপত্তি আছে?"—উত্তরে যখন শুনিলেন, কোন অনুপপত্তি নাই, যখন তাঁহাকে পাণ্ডিত্য ছাড়িয়া সাদাসিধা কথায় বলিতে হইল, "আপনার কিছু অভাব থাকে ত' বলুন, আমি এখনই আপনাকে কিছু নিষ্কর ভূমির বন্দোবস্ত করিয়া দিই।" তখন কিন্তু রমনাথ বলিলেন, ঐ যে সম্মুখে তিন্তিড়ীবৃক্ষ দেখিতেছেন, তাহার পত্র রন্ধন করিয়া সুখে দিনপাত করি, আপনাকে আর নিষ্কর ভূমির ব্যবস্থা করিতে হইবে না। ঐ তিন্তিড়ীপত্র ভক্ষণ করিয়াও তাঁহার স্মৃতিশক্তির বা মেধার কিছু ক্ষতি হয় নাই। শুনা যায়, তিনি ৮২ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছিলেন, আর তাঁহার স্মৃতি বা মেধাশক্তির ত' কথাই নাই, তখনকার দিনেও তিনি ভারতের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

আবার সম্প্রতি সুদক্ষ ডাক্তারগণ বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মাংস আহার করিলেই যত প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়—কিন্তু যাঁহারা

ফল মূল শাকাদি ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করেন, তাঁহাদের শরীর সর্ব্বদাই নীরোগ, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হয়েন।

আজকাল য়ুরোপের বড় ডাক্তারগণ বলেন যে, অন্নের সহিত শাকাদি ভোজনে যে কেবল আয়ুর্বৃদ্ধি করে, তাহা নহে। মাংসাহারিগণের মধ্যে যে সকল ব্যাধি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল ব্যাধি নিরামিষ-ভোজনকারিগণের দেহে আদৌ দেখা যায় না। সুতরাং যাঁহাদের শরীরে (Gout) বাত প্রভৃতি কষ্টকর ব্যাধি আছে, তাঁহাদের পক্ষে নিরামিষ ভোজন বিশেষ উপকারী ; বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে।

যে সকল য়ুরোপীয়গণ অধিক দিন যাবৎ ভারতবর্ষে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সেখানে কেবল মাংস আহার করিয়া থাকিতে পারা অসাধ্য, তজ্জন্য সকলকেই মাঝে মাঝে মাংস বন্ধ করিয়া নিরামিষ ভোজন করিতে হয়, এমন কি, তদ্দেশজাত শাকাদিও ভোজন করিলে তবে সেখানে সুখে বাস করা যায়। নচেৎ নীরোগ শরীরে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। *

আমরা সচরাচর নিম্নলিখিত শাকপত্রগুলিই ভোজন করিয়া থাকি।

কলম্বী পোতকী লোণী পালঙ্ক্যা হিলমোচিকা।
বাস্তুকং রোচনী শিখী শালীঞ্চ তণ্ডুলেরকঃ।
চণকপটলপত্রঞ্চ যাবনী মূলপত্রকম্।
কলায়-পট্টশাকঞ্চ ষোড়শং শাকমুত্তমম্॥

১। কলম্বী—কল্মীশাক।

২। পোতকী—পুঁইশাক।

৩। লোণী—নুণেশাক (ছোট ও বড়)।

---

* Old age Deferred by Arnold Lorand M. D. page 310.

৪। পালক্যা—পালঙ্‌শাক (চুকাপালঙ)।

৫। হিলমোচিকা—হিঞ্চেশাক।

৬। বাস্তুকং—বেতোশাক।

৭। রোচনী—পুদিনাশাক।

৮। শিখী—শুষণীশাক।

৯। শালীঞ্চঃ—শাঞ্চেশাক।

১০। তণ্ডুলেরক—নটেশাক।

১১। চণক—ছোলাশাক।

১২। পটলপত্রং—পলতা।

১৩। যাবনী—যোয়ানশাক।

১৪। মূলপত্রকং—মূলাশাক।

১৫। কলায়—কলাইশাক।

১৬। পট্টশাক—নাল্‌তা।

অতএব উক্ত শাকগুলির গুণাগুণ আমাদের সকলেরই জানা উচিত।

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে—

১। **কলম্বী** (কল্মীশাক)

কলম্বী শতপর্ব্বা চ কথ্যস্তে তদ্‌গুণা যথা।
কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী॥

কলম্বীর আর একটি নাম শতপর্ব্বা।

হিন্দীভাষায় ইহাকে করেবু কলমী এবং তৈলঙ্গ ভাষায়—তো-মেবচ্চ-লিতেট্টু, আসামবাসীরা ইহাকে কল্‌মৌ বলে।

ইহার ডাক্তারী নাম—Convolvulus repens (কন্‌ভল্‌ভিউলাস্‌ রিপেন্স)।

ইহার গুণ—স্তন্যদুগ্ধজনক, শুক্রবর্দ্ধক, মধুররস সুতরাং স্নিগ্ধ, শীত ও গুরু।

'স্নিগ্ধ'—"স্নিগ্ধং বাতহরং শ্লেষ্মকারি বৃষ্যং বলাবহম্."

অর্থাৎ যাহা স্নিগ্ধ তাহা বায়ুনাশক, কফজনক, বৃষ্য ও বলবর্দ্ধক।

'শীত'—"হ্লাদনঃ স্তম্ভনঃ শীতো মূর্চ্ছা তৃড্ দাহস্বেদজিৎ"

অর্থাৎ যাহাকে শীত বলা হয়, তাহা সুখকারী, অতিসার ও রক্তপ্রবৃত্তি-রোধক, মূর্চ্ছা তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্মপ্রশমক।

'গুরু'—"গুরু বাতহরং পুষ্টিশ্লেষ্মকৃচ্চিরপাকি চ।

অর্থাৎ যাহা গুরু, তাহা বাতহর, পুষ্টিপ্রদ ও শ্লেষ্মাজনক।

আমাদের দেশে প্রসূতির **স্তনদুগ্ধ** বৃদ্ধির জন্য কল্মীর ঝোল করিয়া প্রসূতিকে খাইতে দেওয়া হইত, কিন্তু আজকাল তাহার পরিবর্ত্তে বিলাতী ঔষধলিপি দেওয়া হইতেছে। **হিষ্টিরিয়া** রোগীকে ও মস্তিষ্কবিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে কল্মীশাক বিশেষ উপকারক। আজকাল হিষ্টিরিয়া রোগের অভাব নাই, কিছু কিছু কল্মীশাক দিলে ভাল হয়। **বসন্তরোগের** প্রথমেই কল্মীশাকের রস পান করিতে দিলে বসন্তের গুটিগুলি শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে, সুতরাং এই রোগের বিষ কাটিয়া যায়, প্রাণহন্তারক হয় না। কল্মীশাকের রস পান করিলে **ফোড়া** শীঘ্র পাকিয়া যায়। তবে যাহাদের শরীরে ফোড়া, খোস বা পাঁচড়া হইতে পুঁজ পড়িতে থাকে, তাহাদের পক্ষে কল্মী শাক নিষিদ্ধ। কারণ, ইহাতে পুঁজ আরও জোগান দেয়, শীঘ্র শুকাইতে চায় না।

কবিরাজগণ বলেন—আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত কল্মীশাক ভোজনে নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে, সুতরাং ঐ সময়ে কল্মীশাক ভোজন না করাই বিধেয়।

আবার বাসী কল্মীশাক বিশেষ অপকারক, তজ্জন্য এই শাক টাট্‌কা

তুলিয়া ভোজন করাই কর্ত্তব্য। একদিন কিনিয়া ৩।৪ দিন ধরিয়া ভোজন করা আদৌ উচিত নহে।

তাঁহাদের মতে—কল্মীশাক—প্লীহা, রক্তপিত্ত ও অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ ত্রিদোষ নিবারণ করে।

কল্মীশাকের ডগা ছেঁচিয়া এক ছটাক মাত্রায় রস পান করিলে পারাবিষ নষ্ট হয় ও উপদংশবিষ বিদূরিত হয়।

এদিকে পঞ্জিকাকারগণের মতে দশমী তিথিতে কলম্বী ভক্ষণ নিষেধ।

২। পোতকী (পুঁইশাক)

সংস্কৃত ভাষায় পুঁইশাককে—"পোতক্যুপোদিকা সা তু মানবামৃতবল্লরী" বলে।

(পোতকী, উপোদিকা ও অমৃতবল্লরী)

ইংরেজীতে ইহাকে বলে—Red Malabar Night Shade.

ডাক্তারী নাম—A Pot-herb.

লাটিন নাম—Lucida.

হিন্দী ভাষায়—পাইগো সাগ্।

গুজরাটী ভাষায়—পোথী।

মহারাষ্ট্র ভাষায়—মায়াল্লু, লধু বা থোর রাজগিগ মাঢ়বা, রুদবেলামরলা।

ইহার গুণ—

পোতকী শীতলা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তনুৎ
অকণ্ঠ্যা পিচ্ছলা নিদ্রাশুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ
বলদা রুচিকৃৎ পথ্যা বৃংহণী তৃপ্তিকারিণী।

অর্থাৎ ইহা শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, কণ্ঠের

অহিতকর, পিচ্ছিল, নিদ্রাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনিবারক, বলকর, রুচিপ্রদ, সুপথ্য, পুষ্টিকারক ও তৃপ্তিজনক।

ইহা কামোদ্দীপক; তজ্জন্যই আমাদের দেশে হিন্দু বিধবাগণের পক্ষে পুঁইশাক ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ।

পুঁইশাক তিনপ্রকার॥—সাধারণ, বনজ ও ক্ষুদ্রপত্র।

বনজ পুঁইশাক—উষ্ণবীর্য্য ও কটুতিক্তরসযুক্ত।

আর ক্ষুদ্রপত্র পুঁইশাকের গুণ প্রায় সাধারণ পুঁইশাকের মত।

পুঁইশাকের সহিত তিল দিয়া কখনও রন্ধন করিবে না।

দ্বাদশী তিথিতে পূতিকা ভক্ষণ নিষেধ।

পুঁইগাছের একটি শিকড় উত্তমরূপে বাটিয়া, একপোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া, সমস্তটা সেবন করিবে, পরে কাঁচা কলাইয়ের ডাল ভিজাইয়া ঐ ডাল চিনি দিয়া খাইলে পুরুষত্বহীনতায় বিশেষ উপকার দেয়।

অন্যদিকে অম্লশূলরোগীর পক্ষে ইহা একেবারে নিষিদ্ধ।

৩। লোণী (লুণেশাক)

লুণেশাক দ্বিবিধ;—ছোট লুণেশাক ও বড় লুণেশাক।

ছোট লুণেশাককে সংস্কৃত ভাষায় লোণা বা লোণী বলে, আর বড় লুণেশাককে ঘোটিকা বা বৃহল্লোণী বলে।

ছোট লুণেশাকের গুণ—

> লোণী রুক্ষা স্মৃতা গুর্ব্বী বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ।
> অর্শোঘ্নী দীপনী চাম্লা মন্দাগ্নিবিষনাশিনী॥

ইহা—রুক্ষ, গুরু, অগ্নিদীপক, অম্লরস, লবণস্বাদ; এবং ইহাতে অর্শরোগ, বায়ু, শ্লেষ্মা, অগ্নিমান্দ্য ও বিষদোষ নাশ করে।

'রুক্ষ—অর্থাৎ বায়ুজনক ও কফহর।'

আর বড় লুণেশাকের গুণ—

ঘোটিকাম্লা সরা চোষ্ণা বাতকৃৎ কফপিত্তহৃৎ
ত্বগ্‌দোষব্রণ-গুল্মঘ্নী শ্বাসকাসপ্রমেহনুৎ।
শোথলোচনরোগে চ হিতা তজ্‌জ্ঞৈরুদাহৃতা॥

অর্থাৎ ইহা অম্লরস, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতবর্দ্ধক এবং শোথ ও নেত্র-রোগে হিতকর। ইহা সেবনে কফ, পিত্ত, চর্ম্মরোগ, ব্রণ, গুল্ম, শ্বাস, কাস ও প্রমেহ রোগের শান্তি হয়।

নামভেদ—হিন্দীতে—লোণীয়া, লোণা, কুল্‌ফা বলে।

তৈলঙ্গে—অইলকুস্‌।

বোম্বায়ে—কুর্ফা।

তামিলে—কোরিলকীরই।

মহারাষ্ট্রে—ঘোল, লহাণ ঘোল।

গুজরাটে—লোণীঝীণী, লুণীমোটা।

কর্ণাটে—গোলি।

ফার্সীতে—স্থুরফা।

আরবীতে—বক্লতূল ছমকা।

ইংরেজীভাষায়—Purs lane (পার্শ লেন)।

লাটিন নাম—Portulaca Oleracea.

৪। পালঙ্ক্যা (পালঙ্‌শাক)

পালঙ্‌শাকের অন্য নাম ছুরিকা বা চীরতচ্ছদা।

আর একপ্রকার পালঙ্‌শাক আছে, তাহার নান চুক্রা বা চুকা পালঙ্‌। সংস্কৃত ভাষায় উহাকে চুক্রিকা, পত্রাম্লা, রোচনী বা শতবেধিনী বলে।

এতদুভয়ের গুণও বিভিন্নপ্রকার—

পালক্যা বাতলা শীতা শ্লেষ্মলা ভেদিনী গুরুঃ
বিষ্টম্ভিনী মদশ্বাস-পিত্তরক্ত-বিষাপহা।

অর্থাৎ ইহা বাতজনক, শীতবীর্য্য, শ্লেষ্মকর, ভেদক, গুরু, বিষ্টম্ভী এবং মদরোগ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নষ্ট করে।

আর চুকাপালঙ্কের গুণ—

চুক্রা ত্বম্লরসঃ স্বাদ্বী বাতঘ্না কফপিত্তকৃৎ
রুচ্যা লঘুতরা পাকে বৃন্তাকেনাতিরোচনী।

ইহা মধুর, অতিশয় অম্লরস, বাতঘ্ন, কফ ও পিত্তকারক, রুচিপ্রদ ও লঘুপাক। বিশেষতঃ বেগুনের সহিত পাক করিলে বিশেষ রুচিকর হয়।

৫। হিলমোচিকা (হিঞ্চেশাক)

নামভেদ— সংস্কৃতে—হিলমোচিকা।
বাঙ্গালায়—হেলেঞ্চা বা হিঞ্চে।
হিন্দীতে—তুরহুল।
বোম্বায়ে—হুরহুচী।
উৎকলে—হিরমিচা।
আসামে—মনোরাশাক।
লাটিন—Enhydra Fluctaus.

হেলাঞ্চাশাকের পর্য্যায়—ব্রাহ্মী, শঙ্খধরা, আচারী, মৎস্যাক্ষী ও হিলমোচিকা।

ব্রাহ্মী শঙ্খধরাচারী মৎস্যাক্ষী হিলমোচিকা।

ইহার গুণ—

"শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা"

ভাবপ্রকাশ।

অর্থাৎ ইহা সেবনে—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত নাশ করে।

ইহা বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়, দাক্ষিণাত্যে বড়ই দুর্লভ।

ইহা পুরাতন পুষ্করিণী কিম্বা জলাচ্ছন্ন ভূমিতে জন্মিয়া থাকে।

ইহার পত্র—লম্বা, সরু এবং স্বাদে তিক্ত।

ঔষধার্থে—ইহার পত্র সহিত কোমল প্রতানাগ্র ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা—স্বরস ১-৩ তোলা।

ভাবপ্রকাশ—

গাত্রের দুর্গন্ধে—হিঞ্চাশাকের রস, সমুদ্রফেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

বসন্তরোগে—সূক্ষ্ম শ্বেতচন্দনচূর্ণসহ হিঞ্চাশাকের রস পান করিলে বসন্তের গুটি বাহির হইয়া পড়ে। তজ্জন্য বসন্তরোগের প্রারম্ভে সেবনীয়।

Dymock—ইহা মৃদুরেচক, চর্ম্মবিকার এবং nerve (স্নায়ু) পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

৬। বাস্তূকং (বেতোশাক)

বেতোশাক দুই প্রকার—

সংস্কৃত পর্য্যায়—

বাস্তূকং বাস্তুকঞ্চ স্যাৎ ক্ষারপত্রঞ্চ শাকরাট্।

তদেব তু বৃহৎপত্রং রক্তং স্যাদ্ গৌড়-বাস্তুকম্॥

প্রায়শো যবমধ্যে স্যাৎ যবশাকমতঃ স্মৃতম।

অর্থাৎ বাস্তক, বাস্তুক, ক্ষারপত্র, শাকরাট্—আর যাহা রক্তবর্ণ বৃহৎপত্র-বিশিষ্ট, তাহাকে গৌড়-বাস্তক বলে। আবার ইহা প্রায় যবের মধ্যে হয় বলিয়া যবশাকও বলে।

নামভেদ—বাঙ্গালায়—বেতোশাক।

হিন্দীতে—বথুয়া, চিল্লী।

মহারাষ্ট্রে—চাকবত চিবিল।

কর্ণাটে—চক্রবর্ত্তী, বিলির্প, চিল্লীকে।

গুজরাটে—টাংকো, চীল।

ফারসীতে—মূসে লেসা সরমক।

আরবীতে—রোকবতুল, বাজামেলকুতফ।

ইংরাজী—White goose-foot.

ডাক্তারী—Cheno podium Album.

ইহার গুণ—বাস্তুক-দ্বিতয়ং স্বাদু ক্ষারং পাকে কটূদিতম্

দীপনং পাচনং রুচ্যং লঘু শুক্রবলপ্রদম্।

সরং প্লীহাস্রপিত্তার্শঃক্রিমি-দোষত্রয়াপহম্॥

অর্থাৎ—উভয়বিধ বেতোশাক (শ্বেত ও রক্তবর্ণ) মধুররস, ক্ষারযুক্ত, কটুবিপাক, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিপ্রদ, লঘু, শুক্র ও বলকারক, সারক এবং প্লীহা, রক্তপিত্ত, অর্শ, ক্রিমি ও ত্রিদোষনাশক।

যে বেতোশাকের পত্র বড় ও রক্তবর্ণ, তাহার আর একটি নাম গৌড়-বাস্তক।

ঢাকা ও বরিশাল অঞ্চলের লোকে বেতুয়াশাক বলে।

বৈদ্যকগণের মতে শাকের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাই ইহার অপর নাম শাকরাজ বা শাকশ্রেষ্ঠ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং এই বেথুয়াশাক-ভক্ত ছিলেন।

৭। রোচনী (পুদিনা)

সংস্কৃত ভাষায়—পুদিনার নাম রোচনী।

হিন্দীতে—পোদিনা।

মহারাষ্ট্রে—পুদিনা।

গুজরাটে—ফোদিনা।

ফার্সীতে—নোওনা।

আরবীতে—হবা।

আসামে—পদিনা।

ইংরাজী—Tall redument widmint.

লাটিন—Menthasylnestrio.

গুণ—ইহা অগ্নিদীপক, মুখের জড়তা নাশ করে, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকর ও অরুচিনিবারক।

রোচনী বহ্নিজননী বক্তৃ জাড্যনিসূদনী
কফবাতহরী বল্যা হৃদ্যা রোচককারিণী।

(আয়ুর্ব্বেদবিবেচনম্)

পুদিনস্তু গুভঃ স্বাদূ রুচ্যো হৃদ্যঃ সুখাবহঃ।
মলমূত্রস্তম্ভকরঃ কফকাসমদাপহঃ॥
অগ্নিমান্দ্য-বিসূচিঘ্নঃ সংগ্রহণ্যতিসারহা।
জীর্ণজ্বরং কৃমীংশ্চৈব নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্॥

(নিঘণ্টুরত্নাকরঃ)

প্রাচীন বৈদ্যগ্রন্থে পুদিনার উল্লেখ নাই।

পুদিনা তিন প্রকার;—বন্য, পার্ব্বতীয় ও বালুজ।

ইহা হিক্কা ও বমন নিবারণ করে। এই পাতার ভাবরায় জ্বর ও তরুণ কফ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

৮। শিখী (সুষুনী)

বাঙ্গালা—সুষুনী।

সংস্কৃত—শিতিবার, শিতিবর, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, শ্রীবারক, সূচীপত্র, পর্ণক, কুক্কুট ও শিখী।

হিন্দীতে—চৌপতিয়া, উটিংগণ, গুটবা, শিবিআরী।

মহারাষ্ট্রে—করভু।

কর্ণাটে—কুরড়াহকে, খড়রাতিরা।

তৈলঙ্গে—সুনিষণ্ণমনেশাকম্।

উৎকলে—ছুনছুনিয়া।

গুজরাটে—ওচীগণ, নাবী, খরকতিরা।

ফার্সী—অংজবা, তুখমে।

আরবী—বজহুল, অংজবা।

ডাক্তারী—Marsilca Quadrifolia or Blepharis Eclulis.

ইহা সকল প্রদেশে বকচরে বা জলাসন্নস্থানে উৎপন্ন হয়। ইহার চারিটি করিয়া দল থাকে, তাই ইহাকে চতুষ্পত্রী বলে।

গুণ—সুনিষণ্ণো হিমো গ্রাহী মেদোদোষত্রয়াপহঃ
অবিদাহী লঘুঃ স্বাদুঃ কষায়ো রুক্ষদীপনঃ।
বৃষ্যো রুচ্যো জ্বরশ্বাস-মেহকুষ্ঠ-ভ্রমপ্রণুৎ
মেধ্যো রসায়নো নিদ্রাকরো দাহবিনাশনঃ॥

—ভাবপ্রকাশ।

অর্থাৎ ইহা শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, অবিদাহী, লঘু, কষায়, মধুররস, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, বীর্য্যকর, রুচিপ্রদ, মেধাজনক, রসায়ন ও নিদ্রাকর।

তজ্জন্য বৈদ্যকগণ বলেন, ইহা মেদোরোগ, জ্বর, শ্বাস, মেহ, কুষ্ঠ, ভ্রম, দাহ ও ত্রিদোষনাশক।

ইহার পত্র ও বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

পত্র শাকরূপে ভোজন করে।

বীজকল্কের মাত্রা ১-৪ আনা।

চরকের মতে—

বাত-কাস-রোগীকে সুষুনীশাক ভোজনার্থ ব্যবস্থা করিবে।

বিষদোষে ইহা বিশেষ উপকারক পথ্য।

উরুস্তম্ভে সুষুনীশাক, তিলতৈল ও জলসহ পক্ক করিয়া বিনা লবণে ভোজন করিলে উরুস্তম্ভ আরোগ্য হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সুষুনীশাকের বীজ ঘোলের সহিত পেষণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ঘোলসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

সুশ্রুতের মতে—

রক্তপিত্তে সুষুনীশাক ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া ভোজন করিলে রক্তপিত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

আমাদের দেশে সুষুনীশাক নিদ্রাজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং উন্মাদাদি রোগে ইহা পথ্যস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

৯। শালিঞ্চ (শাঞ্চে)

শালিঞ্চঃ শিতসারঞ্চ শালঞ্চো লোহসারকঃ।

অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় শাঞ্চেশাককে শালিঞ্চ, শালঞ্চ, শিতসার ও লোহসার বলে।

ইহার গুণ—

শালিঞ্চো দীপনস্তিক্তঃ প্লীহার্শঃকফবাতনুৎ।

অর্থাৎ অগ্নিদীপক, কফবাতনাশক, তিক্তরস এবং প্লীহা ও অর্শরোগ নাশ করে।

কেহ কেহ বলেন—মকরধ্বজের সহিত শাঞ্চেশাকের রস অনুপান দিয়া সেবন করিলে অর্শরোগে ও প্লীহারোগে বিশেষ উপকার হয়।

অপিচ, যাহাদের ক্ষুধামান্দ্য হয়, তাহাদের পক্ষে শাঞ্চেশাক বিশেষ উপকারক।

১০। তণ্ডুলেরকঃ (নটেশাক)

ভাবপ্রকাশে আছে—

তণ্ডুলীয়ো মেঘনাদঃ কাণ্ডেরস্তণ্ডুলেরকঃ।
ভণ্ডীরেস্তণ্ডুলীবীজো বিষঘ্নস্থল্পমারিষঃ॥
তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
সৃষ্টমূলমলো রুচ্যো দীপনো বিষহারকঃ॥

অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় নটেশাকের নাম—

তণ্ডুলেরক, তণ্ডুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডের, ভণ্ডীর, তণ্ডুলীবীজ, বিষঘ্ন ও অল্পমারিষ।

দেশভেদে নামভেদ—

বাঙ্গালা—নটেশাক।
হিন্দুস্থানী—চৌলাইকা, জলচৌলাই, চবডাই
মহারাষ্ট্রে—তাংদুলজা।
কর্ণাটে—কিরুকুশালে।
তামিলে—মুল্লুকিরই।
গুজরাটে—তাংজলজো।
তৈলঙ্গে—মোলাকুবা।
দ্রাবিড়ে—কাণ্ডেমাট।
ফার্সীতে—সুপেজমর্জ্জা।

আরবী—বুকলেয়মানীয়।

আসামে—খুটরিয়াশাক।

ইংরেজী—Hermaphrodite Amaranta.

ডাক্তারী নাম—Amaranthus Tenifolius অথবা Prickl. Amaranth.

গুণ—নটেশাক লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক, রুচিকর, অগ্নিদীপক।

রোগে প্রয়োগ—ইহা পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি এবং বিষনাশক বলিয়া ইহার নাম বিনঘ্ন।

১১। চণক (ছোলাশাক)

বৈদ্যশাস্ত্রমতে—

রুচ্যং চণকশাকং স্যাৎ দুর্জ্জরং কফবাতকৃৎ
অম্লং বিষ্টম্ভজনকং পিত্তনুদ্দন্তশোথনুৎ।

অর্থাৎ ছোলাশাক রুচিপ্রদ, দুষ্পাচ্য, কফবাতবর্দ্ধক, অম্লরস ও বিষ্টম্ভী।

অম্লরস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পিপাসা, দাহ, ভ্রমঃ(ঘুরণো-রোগ), নেত্ররোগ, জ্বর, শোথ ও কুষ্ঠরোগ জন্মে।

কিন্তু শাকাদির অম্লে অল্প পরিমাণে উপকারও আছে।

আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা পাচক, রুচিজনক, লঘুলেখন (অর্থাৎ পিত্তভূত শ্লেষ্মাকে চাঁছিয়া তুলিয়া দেয়), উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও দন্তের উপকারক।

বিষ্টম্ভী অর্থাৎ রোধকারক।

গুণ—ইহা পিত্ত দমন করে এবং দন্তশোথ-নিবারক।

১২। পটোলপত্রং (পল্‌তা)

বাঙ্গালা—পল্‌তা।

সংস্কৃত—পটোলপত্রম্।

কোচবিহারে—নতি, বননতি।

হিন্দীতে—কতচে পরবল।

গুজরাটে—কড বা পটোল।

তৈলঙ্গে—সেস পদ্দলা।

ফার্সী—মোরহস্তী।

তামিল—কোয়ু পুনলৈ।

গুণ—পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু
স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ।

অর্থাৎ ইহা পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, শুক্রকর, উষ্ণবীর্য্য এবং জ্বর, কাস ও ক্রিমিরোগনাশক।

ভাবপ্রকাশমতে—

পিত্তঃবা বসন্তরোগে প্রথমেই পটোলমূলের ক্বাথ পান করাইবে এবং আরোগ্য হইলে পল্‌তার রস দিবে।

পিত্তজ্বরে—পল্‌তা ও যবের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া দিবে।

১৩। যাবনী (যোয়ানশাক)

বৈদ্যশাস্ত্রমতে—

যাবনীশাকমাগ্নেয়ং রুচ্যং বাতকফপ্রণুৎ।
উষ্ণং কটু চ তিক্তঞ্চ পিত্তলং লঘুশূলকৃৎ॥

অর্থাৎ যোয়ানশাক—অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকর, কফনাশক, উষ্ণবীর্য্য কটুতিক্তরস, লঘুপিত্তবৃদ্ধিকর ও শূলজনক

প্রয়োগ—যাঁহারা বায়ু ও কফরোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে যেমন উপকারক, তেমনি যাঁহারা পিত্ত ও শূলব্যাধিতে কষ্ট পান, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ অপকারক।

তবে ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর বলিয়া হজমশক্তিকে বিশেষ সাহায্য করে এবং ইহা সেবনে অরুচিরও রুচি হয়।

আমাদের দেশে বড় একটা যাবনীশাকের ব্যবহার নাই। কেবলমাত্র ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

১৪। মূলপত্রং (মূলা)

নাম— বাঙ্গালা—মূলা।

হিন্দী—মূরই।

গুজরাটী—মূলা।

তৈলঙ্গী—শৃতিদম্পা।

ফার্সী—তুখ্।

আরবী—ফজল কাজল।

ইংরেজী—Radish.

ইহার পত্র শাকরূপে ভোজন করে। মূল ব্যঞ্জনে ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার পুষ্প ও বীজ ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

পাচনং লঘু রুচ্যঞ্চ পত্রং মূলকজং নবম্
স্নেহসিদ্ধং ত্রিদোষঘ্নমসিদ্ধং কফপিত্তকৃৎ।

অর্থাৎ মূলার নূতন পত্র—পাচক, লঘু, রুচিকর ও উষ্ণবীর্য্য।

ইহা তৈলাদিসহ সম্যক্ পাক করা হইলে, ত্রিদোষ নাশ করে। কিন্তু সিদ্ধ না করিয়া ভোজনে কফপিত্ত বৃদ্ধি করে। চরকমতে—

অর্শরোগে—শুষ্ক মূলকের যূষ কিম্বা ছাগমাংসের যূষসহ শুষ্ক মূলকের যূষ সেবনে অর্শ আরোগ্য হয়।

শোথে মূলক বিশেষ উপকারী—শুষ্ক মূলকের ক্বাথ শোথে ব্যবহার করিবে।

হিক্কা—শুষ্ক মূলকের যূষ হিক্কা নিবারণ করে।

বাত বা কাসে—মূলক বিশেষ উপকারী।

সুশ্রুত—কর্ণশূলে মূলকের ঈষদুষ্ণ রস কর্ণকুহরে দিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

ছুলি—মূলকের বীজ অপামার্গের রসে পেষণ করিয়া ছুলিতে দিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

১৫। কলায় (কলাইশাক)

ভাবপ্রকাশমতে—কলায়শাকং ভেদি স্যাল্লঘু তিক্তং ত্রিদোষজিৎ।

অর্থাৎ কলাইশাক—ভেদক—লঘু—তিক্ত ও ত্রিদোষনাশক।

ইহা খাইলে কফ, পিত্ত, বায়ু সকল প্রকার রোগের বিশেষ উপকার হয়। তজ্জন্যই আমাদের দেশে কলায়শাক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা তিক্ত বলিয়া নিজে অরোচিষ্ণু; কিন্তু অন্য বস্তুতে রুচি উৎপাদন করে। ইহা তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, কফপিত্তক্রিমিদাহ ও রক্তপ্রকোপজনিত পীড়াসকল নাশ করে।

ভেদক—অর্থাৎ যাহা অবদ্ধ বা বদ্ধ কিম্বা বায়ু দ্বারা গুটিকীকৃত (অর্থাৎ গুটলে) মলকে ভাঙ্গিয়া অধঃপাতিত করে।

১৬। পট্টশাক (নাল্‌তে)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে—পট্টশাকস্তু নাড়ীকো নাড়ীশাকশ্চ স স্মৃতঃ

নাড়ীকো রক্তপিত্তঘ্নো বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ।

অর্থাৎ সংস্কৃতে পাটশাকের নাম—পট্টশাক, নাড়ীক ও নাড়ীশাক। দেশভেদে নামভেদ—

বাঙ্গালায়—নালিতাশাক।

হিন্দীতে—পটুয়াসাগ।

মহারাষ্ট্রী—নাড়ীশাক।

গুজরাটী—নালানীভাজী।

আসামে—সেকোতা।

ল্যাটিনে—Ipomhoea Reptams.

ডাক্তারী নাম—Corchorus Olitorius.

গুণ—ইহা রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী ও বাতপ্রকোপক।

আমাদের দেশে সচরাচর নালতেশাকের শুক্তা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইহাতে পিত্তদোষ দমন করে এবং অন্যান্য দ্রব্যে রুচিকর করিয়া থাকে। তজ্জন্যই অন্যান্য ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে শুক্তা ভোজন করা বিধেয় আছে।

১৭। শুল্‌ফা শাক

পূর্ব্বোক্ত বিবিধ শাক ভিন্ন আমরা শুল্‌ফাশাক ভোজন করি। ইহার সংস্কৃত নাম শতপুষ্পা (শুল্‌ফাশাক)। ইহা বিশেষ উপকারক। তজ্জন্য শুল্‌ফাশাকের গুণাগুণ লিখিত হইল।

নামভেদ—বাঙ্গালা—শুল্‌ফ বা শলুফাশাক।

হিন্দী—সোয়া, সোয়েকা।

গুজরাটী—শুকদানা।

তৈলঙ্গী—সদানা।

ফার্সী—শুৎ।

আরবী—বজরূল সীর্ব্বৎ।

ইংরেজী—Comondil fruit.

লাটিন—Pencedenum Graveolius Anethum sowa.

পর্য্যায়—শতপুষ্পা, শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ

অতিচ্ছত্রা সিতচ্ছত্রা সংহতিচ্ছত্রিকাপিচ।

শুল্‌ফাশাক—সরু সরু, লম্বা লম্বা, অল্পপরিমাণে খাইতে বেশ সুস্বাদু; কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইতে তিক্ত। সেই জন্য আমাদের দেশে প্রায় নটেশাকের সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া রন্ধন করে। কেহ কেহ চাট্‌নী করিয়া উপাদেয় বলিয়া ভোজন করে। ইহা হৃদয়ের বলপ্রদ বলিয়া গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকেরা শুল্‌ফার ক্বাথ পান করেন।

Dymock—ইহা ফোড়া পাকাইবার মহৌষধ। শুল্‌ফাশাক তৈলের সহিত পেষণ করিয়া গরম গরম প্রলেপ দিলে কাঁচা ফোড়া পাকাইয়া দেয় ও পরে ফাটাইয়া দেয়। শুল্‌ফাশাক বায়ুনাশক, পাচক, উষ্ণ ও স্তন্যবর্দ্ধক। গর্ভাবস্থায় বিবমিষা এবং হিক্কা নিবারণার্থে স্ত্রীলোকেরা ইহার ক্বাথ পান করেন।

ধন্বন্তরির নির্ঘণ্টু ও রাজনির্ঘণ্টু মতে—

শতাহ্বা কটুকা তিক্তা স্নিগ্ধোষ্ণা শ্লেষ্মবাতজিৎ।
জ্বরনেত্রব্রণান্ হন্তি বস্তিকর্ম্মণি শস্যতে॥

ভাবপ্রকাশ—শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃৎ দীপনী কটুঃ।
উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্মব্রণশূলাক্ষিরোগহৃৎ॥

চরক—বচ ও শুল্‌ফা স্নেহযোগে পেষণ করিয়া, কাঁজি দিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া, পোট্টলীবদ্ধ করিয়া শুষ্ক অর্শে দিবে, ইহাতে শুষ্ক অর্শ আরোগ্য হয়।

শুল্‌ফার বীজ গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া, অঙ্গে লেপন করিলে বাতরক্তা-ক্রান্তে বিশেষ উপকার হয়।

বঙ্গসেন—শুল্‌ফা ও সৈন্ধব জলে পেষণ করিয়া, গব্যঘৃতযোগে প্রলেপ দিলে মক্ষিকাবিষ নষ্ট হয়।

১৮। সর্ষপশাক

আর যত প্রকার শাক আছে, তন্মধ্যে সর্ষপশাক বিশেষ অপকারক; তজ্জন্য আমাদের দেশে ইহার ব্যবহার নাই বলিলেও চলে।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহা ত্রিদোষজনক, সুতরাং অখাদ্য।

রাজনির্ঘণ্টুকারমতে—

সার্ষপং পত্রমত্যুষ্ণং রক্তপিত্তপ্রকোপনম্
বিদাহি কটুকং স্বাদু শুক্রকৃদ্রুচিদায়কম্।

আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আনুষঙ্গিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, খাদ্যাখাদ্যাদির অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদের পূর্ব্বতন যাহা কিছু ছিল বা আছে, সে সমুদয়কে অনেক সময়ে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা যে শাকাদি ভোজনকে ব্যঙ্গ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা যাঁহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া শাকাদিকে অসার ও অভোজ্য পদার্থ বলিয়া ঘৃণা করেন—তাঁহাদের মধ্যেই আজকাল বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষা ও বহু গবেষণার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মাছ-মাংস খাও, রুটি-চিনি খাও, আলুসিদ্ধ বা চপ খাও, অথবা আপেল বেদানা প্রভৃতি অতি উত্তম উত্তম উপাদেয় দ্রব্য খাও—তাহাতে দেহের পুষ্টি হইবে, অথবা রসনার তৃপ্তিসাধন হইবে বটে, কিন্তু উক্ত দ্রব্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ

পরিমাণে শাকসব্জী ভোজন করা অতি প্রয়োজনীয়। কারণ, শরীর নীরোগ রাখিতে হইলে শাকসব্জী আহার অনিবার্য্য। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী বা আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মাসিক, দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রগুলিতে ঐ কথাই নানাপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে। তাঁহারা যে যে উপায় বা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—তাহা অতি কৌতূহলপ্রদ। অন্যদিকে, ইতিপূর্ব্বে আমরা যে-সকল বচন চরক, সুশ্রুত বা ভাবপ্রকাশাদির গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহৃত করিয়াছি, ঐ সিদ্ধান্তেই বা আমাদের দেশের বৈদ্যকগণ কেন উপনীত হইয়াছেন, তাহারও অনুসন্ধান করাও কম প্রীতিপ্রদ নহে।

১। বৈদ্যকগণের মত

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে—বায়ু, পিত্ত ও কফ শরীরকে ধারণ, পোষণ ও সঞ্চালন করে। সুশ্রুত বলেন, চন্দ্র যেমন স্বীয় শীতল কিরণ দ্বারা আমাদের পৃথিবীকে আর্দ্র করে, শোষণশক্তি দ্বারা শুষ্ক করে এবং বায়ু উক্ত উভয়বিধ গুণ দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ভূমণ্ডলকে পালন করে, সেইরূপ কফ, পিত্ত ও বায়ু জীবদেহকে যথাক্রমে আর্দ্র, শুষ্ক ও সঞ্চালনকরতঃ রক্ষা করিতেছে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ শরীরকে ধারণ করে বলিয়া, ইহাদিগকে ধাতু বলে, মলিন করে বলিয়া মলও বলে এবং কখনও কখনও দূষ্য করে বলিয়া দোষ নামে অভিহিত হয়। চরকমতে বায়ু পিত্ত কফের গতি ত্রিবিধ—ক্ষয়, সমতা ও বৃদ্ধি।

দোষের সমভাবকে আরোগ্য এবং বিষমভাবকে রোগ বলে। ইহাদের অন্য ত্রিবিধ গতিও আছে ;—উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্। দোষ উর্দ্ধগত হইলে রক্তপিত্ত, কাস, নাসারোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ প্রভৃতি উৎপন্ন করে।

অধোগতি হইলে অতিসার, উদরাময়, অর্শ ইত্যাদি জন্মাইয়া থাকে। আবার বক্রগতি দ্বারা শ্বাসাদি রোগ উৎপন্ন হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে পিত্ত ও কফ পঙ্গু; কেবলমাত্র বায়ুরই গতিশক্তি আছে।

ঐ বায়ু পঞ্চবিধ;—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান।

প্রাণবায়ু—হৃদ্দেশে অবস্থান করিয়া শরীরের রক্তসঞ্চালন ও দেহ ধারণ করে।

অপানবায়ু—পক্বাশয়ে অবস্থান করিয়া বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব অধোদেশে যথাকালে নীত করে।

সমানবায়ু—নাভিস্থলে থাকিয়া আমাশয় ও পক্বাশয় পর্য্যন্ত অধিকার করে, অগ্নির সহায় হইয়া আহার্য্য বস্তুগুলি পরিপাক করে এবং রসরক্তাদি, মলমূত্রাদি পৃথক্ করে।

উদানবায়ু—কণ্ঠদেশে থাকিয়া বাক্য ও গীতাদি ধ্বনির সহায় হয়।

ব্যানবায়ু—সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত থাকায় ইহা দ্বারা শরীরের রস প্রবাহিত হয়, স্বেদ ও রক্ত স্রাবিত হয়।

আর বায়ু কুপিত হইয়াই যত্‌প্রকার ব্যাধির উৎপাদন করে।

নিম্নলিখিত আহার-বিহারাদি দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হয়। স্নিগ্ধোষ্ণ ও তেজস্কর দ্রব্য, স্বাদু ও অম্লরসযুক্ত ভোজন ও তৈলাদি সেবন, অভ্যঞ্জন, স্নান ও মাংস ভক্ষণ এবং উপশম করিতে হইলে স্নেহপ্রলেপাদি ও শান্তিক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে।

এই জন্য বৈদ্যগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দমন করিবার জন্য পথ্য, তণ্ডুল, নূতন মাষকলাই, গোধূম, যব, তিল, কাঁজি দুগ্ধ, মাংস, বেগুন, পটোল, আলু, সজিনাডাঁটা, দ্রাক্ষা, আম্র, আমড়া, দধি, ছানা, ক্ষীর, লবণাক্তদ্রব্য, মিষ্টদ্রব্য, তৈলমর্দ্দন, স্নিগ্ধকরদ্রব্য ও গন্ধদ্রব্য

অনুলেপন, বিশুদ্ধ আমাদের সম্ভোগ, চিন্তাত্যাগ ও সুশীতল জলে অবগাহন-স্নান। বায়ু কুপিত হইয়া শিরঃপীড়ার উৎপাদন হইলে সুষুনীশাক, বেতোশাক ও কলম্বীশাক। কিন্তু আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত কলমীশাকে বায়ু আদি প্রকুপিত করে, সুতরাং উহা অপথ্য। দশমী তিথিতেও কলমীশাকে দেহে বায়ু, পিত্ত ও কফ তিনের বিকার ঘটায়। সেই জন্য দশমীতে কলমীশাক নিষিদ্ধ। পুঁইশাকও বায়ু নাশ করে; কিন্তু দ্বাদশী তিথিতে পুঁইশাক ভোজনে বিশেষ অপকার হয়। অন্যদিকে পুঁই-শাক ভোজনে অম্লশূল বৃদ্ধি পায়, সুতরাং অম্লশূলরোগীর পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ।

বেতোশাক—বায়ু, পিত্ত ও কফ ত্রিদোষ নাশ করে; সুতরাং বেতো-শাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই জন্য ইহার অপর নাম দিয়েছেন—শাকরাজ বা শাকশ্রেষ্ঠ।

পুদিনাশাক—কফ ও বায়ু নিবারণ করে।

শুল্‌ফাশাক—বায়ুনাশক ইত্যাদি।

আর বায়ুপ্রধান রোগীর পক্ষে অপথ্য—চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, অতি-বাক্যকথন, উপবাস, বমন, অধিক পরিশ্রম, অশ্বাদি আরোহণ।

বিশেষতঃ ছোলা, খেশারি, মটর দাইল, তালশাঁস, রুক্ষদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য প্রভৃতি অহিতকর।

ঠিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া পিত্ত ও কফাদি উপশমের জন্য বৈদ্যগণ অনেকগুলি শাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন—

কলম্বীশাক—শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে; সুতরাং সর্দ্দি প্রভৃতি হইলে কলম্বীশাক ভোজন করিবে না।

পোতকী (পুঁইশাক) শ্লেষ্মাকর।

লুণেশাক কিন্তু শ্লেষ্মা নাশ করে।

পালঙ্ক্যা (পালঙশাক)—শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, কিন্তু পিত্তকারক।

হিঞ্চেশাক—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত নাশ করে।

পুদিনাশাক—কফ নিবারণ করে।

সুষুনীশাক—রক্তপিত্ত রোগে ঘৃতে ভাজিয়া ভোজন করিবে।

শালিঞ্চে—কফ ও বাতনাশক।

নটেশাক—পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশ করে।

ছোলাশাক—পিত্ত দমন করে ; পল্‌তাশাকও তদ্রূপ।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমত চিকিৎসা করিয়া আমাদের বৈদ্যকগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বায়ু, পিত্ত ও কফাদি দমনাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নানাপ্রকার শাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইহার ফল প্রত্যক্ষ ; সুতরাং উপহাস করিবার বিষয় নহে। সকল শাকই প্রত্যহ ব্যবহার করিবে। বায়ু-পিত্ত-কফাদির দিকে লক্ষ্য রাখিবে না, এরূপ করিয়া অমৃত-সেবনেও যে সময়ে সময়ে বিষময় ফললাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যে উপায়ে শাকাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল।

বৈজ্ঞানিকরা মানবদেহকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাতে শতকরা—

জল—৫৯ অংশ

মেদ—২১ অংশ

প্রোটিন—৯ অংশ

স্নায়ু—৬ অংশ

লবণ—৫ অংশ

আছে এবং ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, শ্রমাদি নানা কারণে মানবদেহে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি ন্যূনাধিকভাবে হ্রাস হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যের পূরণ করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন। কিন্তু এই ভূমণ্ডলে এমন কোন একটি দ্রব্য পাওয়া যায় না, যাহার কেবলমাত্র ভোজনে উক্ত ক্ষয়ের পূরণ হয়। তজ্জন্যই মানবেরা নানাবিধ দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে।

সেই জন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাঁহাদের প্রত্যেক আহার্য্য-দ্রব্যকে বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন্ দ্রব্যে কত কত পরিমাণে উক্ত উপাদানগুলি আছে।

সাহেবেরা সচরাচর নিম্নলিখিত দ্রব্য আহার করেন। পাঁউরুটি, মাংস, মাখন, আলু, দুগ্ধ, ডিম্ব, পনীর, চা, আপেল, দ্রাক্ষা, বেদানা প্রভৃতি ফল।

		Protein	Fat	Carbohydrate	Salt
		ছানা	মাখন	শর্করা	লবণ
১।	পাঁউরুটি	৮˙০	১˙৫	৪৯˙২	১˙৩
২।	বিস্কুট	১৫˙৬	২˙৩	৭৩˙৪	১˙৭
৩।	গোদুগ্ধ	৪˙০	৩˙৭	৪˙৮	˙৭
৪।	টিনের দুগ্ধ	৩˙৬৮	৮˙৯০	৫৪˙৫৩	১˙৯৫
৫।	মাখন	১˙০	৯০˙৫	...	১˙০
৬।	পনীর	৩১˙০	২৮˙৫	...	৪˙৫
৭।	আলু	২˙০	˙১৬	২১˙০	১˙০
৮।	ডিম্ব	১৩˙৫	১১˙৬	...	১˙০
৯।	ছাগ-মাংস	২৪˙৬	২˙৫	...	১˙২
১০।	মেষ-মাংস	১৩˙৫	৩৩˙২	...	˙৮
১১।	আপেল	˙৩৯	...	৭˙৭৩	˙৩১

		ছানা	মাখন	শর্করা	লবণ
১২।	আঙ্গুর	·৫৯	...	২৪·৩৬	·৫৩
১৩।	সেমনমৎস্য	১২·১	৬·৭	...	১·০
১৪।	অন্যান্য তরকারী	২·০৫	·৩৪	৫·৫৩	...

অবশিষ্ট অংশ জলাদি

সুতরাং শাকসব্জী ও অন্যান্য তরকারী ভোজন করা আবশ্যক। তাঁহারা আরো পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, মানবশরীরে প্রত্যহ যে-সকল দ্রব্যের ক্ষয় হয়, তাহা পূরণ করিবার জন্য Protein বিশেষ আবশ্যক। তাই তাঁহারা মাংসাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে—

মাংসে	শতকরা	১৫	হইতে	২৬	ভাগ
দুগ্ধে	"	৩	"	৪	"
ডাইলে	"	১০	"	২৫	"
চাউলে	"	৪	"	৬	"
গমে	"	৬	"	৮	"
শাকসব্জীতে	"	০·১৫	"	৩	"

Protein আছে এবং ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে—

১০ বৎসরের বালকের জন্য ১ ছটাক ও ১১—১৬ বৎসরের বালকের জন্য ১।০ সোয়া ছটাক এবং প্রত্যেক যুবার জন্য দেড় ছটাক হইতে আড়াই ছটাক Protein আবশ্যক।

তাই তাঁহারা বলিতেছেন যে, প্রত্যহ আমাদের এমন দ্রব্য ভোজন করা আবশ্যক—যাহাতে ২৫০ গ্রেণ নাইট্রোজান এবং ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বণ পাইতে পারি।

কিন্তু এমন কোন পদার্থ নাই—যাহা ভোজন করিলে ঠিক তত পরিমাণে উক্ত পদার্থদ্বয় পাওয়া যায়।

সত্য বটে, /১ সের মাংস খাইলে ৩০০ গ্রেণ নাইট্রোজান ও ১৮০০ গ্রেণ কার্ব্বণ পাই এবং ৫ পোয়া চাউল হইতে ৭৮ গ্রেণ নাইট্রোজান ও ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বণ পাই।

সেই জন্য তাঁহারা স্থির করিলেন, উহাতেও চলিবে না। বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণে ভোজন করিতে হইবে। তাই তাঁহারা ঠিক করিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে এইরূপ আহার দিবে :—

য়ুরোপীয়কে

রুটি—	আট	ছটাক
মাংস—	চারি	”
মাখনাদি—	দুই	”
আলু—	আধ	”
দুগ্ধ—	চারি	”
ডিম্ব—	দুই	”
পনীর—	এক	”

লবণ ও চা যথা-পরিমাণে

খোট্টাকে

আটা—	৬॥০	ছটাক
চাউল—	৬॥০	”
ঘৃত—	অৰ্দ্ধ	”
ডাইল—	৩	”
তরকারী—	৫	”
লবণ—	সিকি	”

মসলা—যথা-পরিমাণে

আর যাঁহারা মাংস খান, তাঁহাদিগকে মাংস—৪ ছটাক

বাঙ্গালী ছাত্রকে

চাউল—	৬·৪	ছটাক
ডাইল—	১·২৮	”
আলু—	২·৫৬	”
ঘৃত—	·১	”
মাছ—	১·৬	”
মাংস—	·৩২	”
তৈল—	·৬৪	”
তরকারী—	১·৯	”

বাঙ্গালী যুবককে

চাউল—	১৬	আউন্স
ডাইল—	৫	”
মাছ—	৪	”
তরকারী—	৪	”
তৈল ঘৃত—	১	”
লবণ—	অৰ্দ্ধ	”
দুগ্ধ—	১৬	”
	৪৬॥০	আউন্স

তাঁহারা সেইরূপ শাক সম্বন্ধে এই উপদেশ দেন যে, শাকে যত অধিক পরিমাণে Vitamin পাওয়া যায়, আর অন্য কোন দ্রব্যে তত পরিমাণে পাওয়া যায় না, তাহাই খাওয়া উচিত।

তবে শাক সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিলে অনেকটা ভিটামিন্ আমরা বৃথা হারাইয়া ফেলি; সুতরাং শাক কাঁচা অবস্থায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোজন করিবে।

অনেকেই বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, সাহেবরা ডিনারের সঙ্গে শাকাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে Salad শাকই কাঁচা অবস্থায় খাইয়া থাকেন। আলু, নটেশাক সিদ্ধ করিয়া লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া শশার কুচিসহ আহার করেন।

সাহেবেরা আমাদের দেশের নটেশাক ভিন্ন অন্য কোন শাক খান না, কারণ, তাঁহারা অন্যান্য শাকের গুণাবলী জানেন না।

সাহেবেরা কাঁচা শাক ভোজনের জন্য যত কেন উপদেশ দিন না, কবিরাজগণ তাহা অনুমোদন করেন না। কারণ, কাঁচা অবস্থায় উহার সহিত নানাবিধ কীটাদি উদরস্থ হইবার সম্ভাবনা। অতএব শাকাদি সিদ্ধ না করিয়া ভোজন করিলে কাঁচা যতই ভাল করিয়া বাছাই বা ধৌত কর না, কীটবংশ সমূলে নির্ব্বংশ করা অসম্ভব।

এক্ষণে মহাসমস্যার কথা এই যে, শাক যদি ভোজন করিতেই হইল, তবে কাঁচা খাইব, না সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিব? ডাক্তারগণের কথা শুনিব, না কবিরাজগণের কথা শিরোধার্য্য করিব?

হায়, যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রথাকে অসভ্য প্রথা বলিয়া ঘৃণা করেন, ডাক্তারগণের কৃপায় পড়িয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে গবাদির ন্যায় কাঁচা শাক ভোজন করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা আর রহস্যময় প্রহেলিকা কি হইতে পারে?

আবার ডাক্তারগণ ও কবিরাজগণ উভয় দলই একবাক্যে বলিয়া

থাকেন যে, যে দেশে যে যে দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য, পরম করুণাময় পরমেশ্বর সেই দেশে সেই দ্রব্য প্রচুর করিয়া দিয়াছেন।

এ ভারতে তাই আম্রাদি নানাবিধ সুমিষ্ট ফল এবং পূর্ব্বোক্ত ষোড়শবিধ উৎকৃষ্ট শাক প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন। যদি ভগবানের দয়া গ্রহণ করিতে অগ্রাহ্য কর, তাহার প্রতিফল পাইবেই পাইবে, ইহা অপরিহার্য্য।

আর একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া সাহেবেরা বলেন, সত্য বটে, সকল দ্রব্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে ভিটামিন্ (Vitamine) আছে; কিন্তু আমরা প্রত্যেক দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহার জানি না বলিয়া ঐ সকল দ্রব্য হইতে উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন্ লাভ করিতে পাই না। ইহার উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহারা বলেন, দেখ, চাউলে যথেষ্ট পরিমাণে Vitamine পাইতে পার, যদি মাজা চাউল না খাও। অর্থাৎ আমরা যেমন পূর্ব্বে আমাজা চাউল ভক্ষণ করিতাম, সেইরূপ চাউলই যদি খাই, তবে যথেষ্ট পরিমাণে Vitamine পাইতে পারি। এই Vitamine-এর অভাবেই কলিকাতায় একসময়ে Beri-Beri রোগের খুব প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

তাহার পর আলু। আমাদের অনেক গৃহস্থের গৃহে গৃহিণীরা আলুর খোসা ছাড়াইয়া পরে তাহা সিদ্ধ করিতে দেন, এমন কি, আলুর দম প্রস্তুত করিবার সময়ও সেইরূপ প্রথা অবলম্বন করেন। তাহার ফলে আমরা আলুর অনেক পরিমাণে ভিটামিন বৃথা নষ্ট করিয়া ফেলি। সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ এই যে, আলু প্রথমতঃ সিদ্ধ করিয়া পরে উহার ছাল বা খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া পরে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলে অনেকটা ভিটামিন্ পাইতে পারি।

এইরূপ তাঁহারা আমাদিগকে ভিটামিনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আহার্য্য-দ্রব্য প্রস্তুত ও ভোজন করিতে উপদেশ দিতেছেন। তৎপরে তাঁহারা দেখাইলেন যে, ইতিপূর্ব্বে যে পরিমাণে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিক আহার

স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে কত পরিমাণে নাইট্রোজান আর কত পরিমাণে কার্ব্বণ পাওয়া যায়।

খাদ্যদ্রব্য	পরিমাণ	নাইট্রো	কার্ব্বণ
চাউল	৩ ছটাক	২১ গ্রেণ	১'০৫০ গ্রেণ
আটা	৫ „	৭৭ „	১৬৬০ „
ডাইল	১॥০ „	৪১'২ „	৪৬৮ „
মাছ বা মাংস	২॥০ „	৫০'৪ „	২৯০'৮ „
আলু	২ „	৫'৬ „	১৮০'০ „
ঘৃত ও তৈল	২ „	০ „	৩২০'০ „
দুগ্ধ	৮ „	৪৪'৮ „	৪৮০'০ „
	২৪	২৪০'০	৪৪৫৭'০
শাকসব্জী ও অন্যান্য তরকারী	২ „	৬ „	৮০ „
মোট	২৬	২৪৬	৪৫৩৭

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ভোজন করিলেও শাকসব্জী ও অন্যান্য তরকারী আবশ্যক।

তাহার পর আর একটি কথা। মাছ বা মাংস হইতে অম্লজ-লবণ সঞ্চারিত হয়; কিন্তু শাকসব্জী হইতে ক্ষার-লবণ সঞ্চারিত হয়। সুতরাং মাছ ও মাংসের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে শাকসব্জীর ভোজন আবশ্যক।

তাহার পর ডাঁটা নানাপ্রকার।

লাউডগা, পুঁই-ডাঁটা, কুমড়া-ডগা ও ডাঁটা, কচি সজিনার ডাঁটা, ডোঙ্গোর ডাঁটা ও গোড়া; এ সবগুলি অতিশয় মুখরোচক ও উপকারী। কচি লাউডগা ভাতে দিয়া খাইতে অতিশয় মুখরোচক ও পুষ্টিবর্দ্ধক। কচি

সজিনার ডাঁটা মুখরোচক ও বসন্তরোগের ঔষধবিশেষ। সেই কারণে পরম করুণাময় পরমেশ্বর যে সময়ে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব, সেই সময়ে সজিনার ডাঁটা দিয়াছেন। কচি ডাঁটা ত' খুব ভালই, পুষ্ট ডাঁটাও উপকারী। ডাঁটা চিবান দাঁতের পক্ষে খুব উপকারী। প্রত্যেক লোকেরই অল্পবিস্তর পরিমাণে ডাঁটা চিবান উচিত। অনেক সময় শুনা যায়, পুরুষেরা বলেন, ডাঁটা চিবান বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জন্য, উহা একরকম জাবর কাটা বিশেষ; আবার সেই লোকেরাই অনেক বেশী পয়সা দিয়া ভাল ভাল হোটেলে এসপারেগাস্ চিবান। সাহেবেরা এসপারেগাস্ খান বলিয়া ইঁহারা তাঁহাদের অনুকরণ করেন, আর সস্তা নিজ দেশের উপাদেয় সামগ্রী ভগবানের বিশেষ দান, রকম-বেরকমের দেশী ডাঁটা অন্যায়রূপে পরিত্যাগ করেন।

প্রত্যেকের ইহা জানা উচিত, যে স্থানে যে দ্রব্য জন্মায়, সেই স্থানে সেই দ্রব্যেরই ব্যবহার স্বাস্থ্যকর ও উপকারী।

শাকের একটি প্রধান গুণ—ইহা সম্পূর্ণরূপে পেট পরিষ্কার করে। অনেকে পেট পরিষ্কার জন্য দামী বিলাতী ঔষধ ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষা শাক অনেক উপকারী ও পেট সাফ্ রাখে।

হিংচা ও কলমীশাক প্রত্যহ খাইতে পারিলে, অনেক রোগের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

পল্‌তার শুক্তা, মুগ দিয়া পল্‌তার বড়া মুখরোচক ও উপকারী। জ্বরাদির পরে পল্‌তার শুক্তা ও মুগ দিয়া পল্‌তার বড়া টনিকের অপেক্ষা বেশী কাজ করে। ইহা আহার ঔষধ দুই। আমাদের এই অর্থহীন দেশে সকলেরই আহার এরূপভাবে নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য হে, আহারেই ঔষধের কার্য্য করিবে। ঔষধ আলাহিদা ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। শাকের উত্তম নির্ব্বাচন ঔষধের কার্য্য করে। অতএব সকলেই কম-বেশী শাক

ব্যবহার করিবেন, তাহাতে শরীরের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, দেশবাসীর মঙ্গল।

ইতিপূর্ব্বে শাকাদি সম্বন্ধে যে-সকল বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সে সমুদয় কেবল আমাদের শরীরধারণ, শরীর-পোষণ ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে।

কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে খাদ্যের সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবনতিরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ কোন্ কোন্ দ্রব্যের কি কি গুণ বা দোষ, তাহা বিচার না করিয়া যথেচ্ছ আহার করিতে করিতে একদিকে যেমন সুস্থকায়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ লোকও অচিরে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, অন্যদিকে তেমনি নির্ম্মলচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক পুরুষও ক্রমে ক্রমে পাপাসক্ত হইয়া পড়েন। এককথায় খাদ্যের সহিত ধর্ম্মেরও নিত্যসম্বন্ধ আছে।

দুঃখের বিষয়, আজকাল পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী যুবকগণ ইহা স্বীকার করেন না, বরং বলেন, ইহা আমাদের কুসংস্কারমাত্র। তাই ইঁহারা খাদ্যাখাদ্যের বিচার পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছেন।

সেই জন্য আমাদের সাধকপ্রবর কুমারনাথ তাঁহার "সুধাকর" নামক গ্রন্থে দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন—

"সবাই কি গো বুঝতে পারে এ বিষম ধাঁধা।
ভুক্তদ্রব্যের অণুর সঙ্গে ধর্ম্মের অণু বাঁধা॥"

অর্থাৎ যাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—কিরূপে পবিত্রতা অর্জ্জন করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান-ধারণার অধিকারী হইবেন, তাঁহারা কেবল বুঝিতে পারেন—'ভুক্তদ্রব্যের অণুর সঙ্গে ধর্ম্মের অণু বাঁধা'; অন্যের পক্ষে ইহা ধাঁধা মাত্র।

তাই যেদিন ভক্তগণাগ্রগণ্য সুমতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রসহ বনগমনের পূর্ব্বে

যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় লইতে গেলেন, সেই দিন তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে কয়টি উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইহাই অন্যতম—

'ফলমূলাহারী হয়ে করিবে বসতি।
সমাধি সাধিয়া লভিবেক দিব্যগতি ॥'—কাশীদাসী মহাভারত।

শুদ্ধ যে ভারতবাসীগণেরই এই মত, তাহা নহে; কি রোম, কি গ্রীস, সকল দেশেরই ধর্ম্মানুরাগিগণের এই মত—তাই হোরেস্ (Horace) লিখিয়াছেন—

"Give me again, ye Gods, my cave and wood,
With peace, let beans with water be my food."

অর্থাৎ হে ভগবান্, আমি এক্ষণে আর অন্য কিছুই চাহি না, চাই কেবলমাত্র নির্জ্জন বনমধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীর, আর চাই নির্ম্মল জলসহ শিম্বাদি ফলমূলাদি আহার করিয়া সুখে দিনের পর দিনাতিপাত করিব।

দার্শনিক কবি Hesiad বলিয়াছেন—

"Unhappy, from whom still concealed does lie,
Of roots and harbs the wholesome luxury."

অর্থাৎ এ জগতে তিনিই যথার্থ অসুখী—যিনি ফলমূলাদির উপকারিতা এ জীবনে বুঝিতে পারেন নাই।

শুদ্ধ তাহাই নহে, আজকালকার দিনেও পাশ্চাত্য জগতের বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতও ঐরূপ।

Dr. Heartman M. D. বলেন—

"The step to the acquisition of spiritual refinement is the abandonment of animal food."

অর্থাৎ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে মাংসাদি ভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে।

Rev. R. . Porteon বলেন—

"We cannot be spiritual beings and beasts of prey at the same time."

অর্থাৎ মাংসাহার করিব অথচ ধর্ম্মপথের পথিক হইব, এরূপ বাসনা করা বাতুলতামাত্র।

Sir John Sinclair বলেন—

"Vegetable food has a happy influence on the powers of the mind."

শাকসব্জী ভোজনের উপরেই আমাদের মনের উৎকর্ষ বিশেষরূপে নির্ভর করে।

সুবিখ্যাত ইংরেজ কবি মিল্‌টন্‌ বলেন—

"The lyrist may indulge in a free life, but he who would write an epic for the nations must eat beans and drink pure water."

অর্থাৎ যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতা লিখিতে চাও, তাহা হইলে যথেচ্ছ আহার-বিহার করিতে পার, কিন্তু যদি মহাকাব্য লিখিবার বাসনা থাকে, তবে শিম্বাদি ভক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ জল পান করিতে হইবে।

সত্য বটে, য়ুরোপ খণ্ডে ভারতের ন্যায় শাকাদি জন্মে না; সুতরাং উদ্ভিজ্জ আহার অর্থে তাঁহারা বুঝেন কেবল ফলমূলাদি ভোজন; কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় কেবলমাত্র শাক। অতএব শাক সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিতে হইলে ভারতীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের নিকটই শিক্ষা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জগতের নিকট ইহা আশা করা যায় না।

আমাদের গীতাদি গ্রন্থে খাদ্যাদি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত উপদেশ লিখিত আছে। তন্মধ্যে বোধ হয়, দুই চারিটি উদ্ধৃত করা এ স্থলে অসঙ্গত হইবে না।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥"

অর্থাৎ হে মহাবাহো অর্জ্জুন, যদিও প্রকৃতপক্ষে আত্মা অব্যয় ও নির্ব্বিকার, তথাপি এই সত্ত্বরজস্তমোগুণ-মিশ্রিত দেহমধ্যে আবদ্ধ থাকায়, দেহাভিমানী হইয়া সুখ-দুঃখমোহাদি কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া থাকে। তবে—

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥"

* * * * *

অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ বলিয়া অন্যান্য বস্তুকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে; এবং উহা শান্তভাবাপন্ন বলিয়া সুখ উৎপাদন করে এবং প্রকাশক বলিয়া জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও জ্ঞানাভিমানে আবদ্ধ করে।

আর রজোগুণ-বলে সুখলাভের আশায় মনের নানাবিধ কর্ম্মে আসক্ত হয়, কিন্তু সুখ প্রাপ্ত হয় না। কারণ, সুখ কেবল সত্ত্বের ধর্ম্ম।

তমোগুণের ত' কথাই নাই, তদ্দ্বারা মানবকে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত করিয়া রাখে। তাহার পর যে যে গুণের আধিক্য হইল, দেহীর যে যে আহারে রুচি হয়, তৎসম্বন্ধেও লিখিত আছে।

"আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ"

—গীতা ১৪শ অধ্যায়, ৫ শ্লোক।

সমস্ত প্রাণিগণের প্রিয় আহারও গুণভেদে ত্রিবিধ জানিবে। তন্মধ্যে—

"আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥"

—গীতা ১৭শ অধ্যায়, ৮ শ্লোক।

অর্থাৎ—

"উৎসাহ, সামর্থ্য আর আয়ুর্বৃদ্ধিকর
আনন্দ ও প্রীতি জন্মে অন্তরে যাহার।
স্বাস্থ্যপ্রদ, স্নেহযুক্ত সুরসে রসাল
শরীরে সারাংশ যার থাকে দীর্ঘকাল।
দর্শনেই মনোহর ঈদৃশ আহার
ভালবাসে সত্ত্বময় প্রকৃতি যাহার।"

আর—

"অতিকটু কিম্বা অতি অম্ল বা লবণ
অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ মরিচ যেমন।
স্নেহ নাহি যাহে, যাহে অম্লপাক হয়
তামস জনের তাহা প্রিয়, ধনঞ্জয়।" —মধুকরী।

তাহার পর, কোন্ কোন্ খাদ্য সাত্ত্বিক, তাহাও আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে। যথা :—

"হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
কলায়-কঙ্গু নীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকাঃ॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরম্।
লবণে সৈন্ধব-সামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী॥
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী।
তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ পিপ্পলী॥
কদলী লবলী ধাত্রীফলান্যগুড়মৈক্ষবঃ।
অতৈলপক্কং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে॥" ইতি স্মৃতি।

অর্থাৎ হৈমন্তিক শুভ্র অসিদ্ধ ধান্যের আতপ-তণ্ডুল, মুগ, তিল, যব, মটর-কলায়, কাঙন, বেথুয়াশাক, হেলঞ্চশাক, কালশাক, বেথকমূল,

ভিন্ন অন্যান্য মূলক অর্থাৎ ওল, মানকচু, মূলকাদি, সৈন্ধব লবণ, সামুদ্রিক লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃতসার দুগ্ধ, পনস (কাঁটাল), আম্র, হরীতকী, তিন্তিড়ী, জীরা, নারঙ্গলেবু, পিপ্পলী, রম্ভাফল, লোনাফল, আমলকী এবং ঐক্ষব-মধ্যে চিনি, মিছরী ও বাতাসা হবিষ্যান্ন অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সাত্ত্বিক আহার।

তবেই বুঝা গেল, শাক সাত্ত্বিক আহারের অন্তর্ভূত।

অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যভাগবতে আমরা পাঠ করিতে পাই, যেদিন শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার পরম ভক্ত অদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে আসিয়া মিলিত হইলেন এবং গঙ্গাদাস পণ্ডিত যেদিন শচী দেবীকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈত-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, সেই দিন—

প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী।
প্রভুস্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি॥

*　　*　　*　　*　　*

কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানে হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন॥
আই (শচীমাতা) জানে প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিল এতেকে।

*　　*　　*　　*　　*

সবা হৈতে ভাগ্যবন্ত শ্রীশাক ব্যঞ্জন।
পুনঃপুনঃ মহাপ্রভু করেন গ্রহণ॥
শাকেতে দেখিয়া সব প্রভুর আদর।
হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর॥
শাকের মহিমা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥

প্রভু বলে এই যে অচ্যুতা (কচু) নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ॥
পটল বাস্তুক কালশাকের ভোজনে।
জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে॥
সালঞ্চ হেলঞ্চ শাক ভোজন করিলে।
আরোগ্যে থাকয়ে আর কৃষ্ণভক্তি মিলে॥
এইমত শাকের মহিমা সবে কহি।
ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হই॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, চতুর্থ অধ্যায়।

অন্যদিকে আমরা আহ্নিকতত্ত্বে দেখিতে পাই, প্রত্যহ একপ্রকার দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ। তিথিভেদে দ্রব্যবিশেষ ভোজন নিষিদ্ধ। যথা—প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ও দ্বিতীয়ায় বৃহতী (ছোট বেগুন বা ক্ষুদ্র বার্ত্তাকী) ভক্ষণ নিষেধ।

তাহার কারণ এইরূপ লিখিত আছে :—

"কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাদ্ বৃহত্যাং ন স্মরেদ্ধরিম্।"

অর্থাৎ—প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভোজনে অর্থহানি হয়; কারণ, কুষ্মাণ্ডে ক্ষারগুণ প্রধান থাকে—প্রতিপদ (কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষের) তিথিতে শ্লৈষ্মিক ধাতু অপেক্ষাকৃত অধিক লবণরসাশ্রিত হয়। একেই ত' শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ লবণরসাত্মক, তাহার উপর তিথিপ্রভাবে সেই রসের আধিক্য হইলে যদি তাহার উপর ক্ষার অর্থাৎ লবণরসাত্মক রুক্ষ খাদ্য আহার করা যায়, তাহা হইলে ব্রণাদি ক্লেদ-রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড-ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর ব্যাধি হইলে অর্থহানি, বিশেষতঃ উক্তবিধ ব্রণরোগ শীঘ্র আরোগ্য হইতে চায় না। বহু অর্থব্যয় করিয়া তবে ঐ ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হয়।

তদ্রূপ বৃহতী বা ছোট বেগুনের বহুবিধ গুণের মধ্যে পিত্ত-উষ্ণকর ও ক্রূর বায়ুবর্দ্ধক দুইটি গুণ আছে। অপর পক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে পিত্ত অত্যন্ত উষ্ণ হয়, সুতরাং এই তিথিতে বৃহতী ভক্ষণ করিলে (অর্ব্বুদ) চক্ষু-রোগ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া বৃহতী ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ঐরূপ তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থী তিথিতে মূলা ভক্ষণ, পঞ্চমীতে বিল্ব, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলম্বী নিষিদ্ধ।

দশম্যাং ক্রূরপিত্তস্ত অম্লবৃদ্ধির্ভবেত্তদা।
বাতশ্লৈষ্মিক-সন্তাপে কফীয়-জ্বরকারকঃ॥

অর্থাৎ—একে দশমীতে ক্রূরপিত্ত এবং অম্লের ভাগ বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে কলম্বী অম্লপিত্তরোগ, শ্লেষ্মা আর মল বৃদ্ধি করে। সুতরাং দশমীতে অম্লপিত্তরোগকারিণী কলম্বা ভোজন করিলে অম্লপিত্ত রোগ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া দশমী তিথিতে কলম্বীশাক ভোজন নিষেধ।

সেইরূপ দ্বাদশীতে পূতিকা-ভক্ষণ নিষেধ, কারণ—

"বায়ুশ্চ ক্রূরভাবশ্চ দ্বাদশ্যান্ত ভবেত্তথা।"

আর পূর্বেই বলা হইয়াছে—

পোতিকী শীতলা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তনুৎ।
অকণ্ঠ্যা পিচ্ছলা নিদ্রা-শুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ॥

পূতিকা শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকারিণী, বায়ুপিত্তহারিণী, পিচ্ছল, অকণ্ঠ্য, নিদ্রাকারিণী, শুক্রদাত্রী ও রক্তপিত্তজিৎ। ঐ তিথিতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে আয়ুর্বেদমতে যক্ষ্মারোগের বীজোৎপন্ন হইতে পারে।

কিন্তু আজকাল এ নিষেধবাক্য শোনে কে? সুতরাং এ দেশে যে দিন দিন যক্ষ্মারোগের বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

আমরা শাস্ত্রাদি বচন গ্রাহ্য করিব না, অথচ নীরোগ থাকিব, এরূপ আশা করা বাতুলতামাত্র। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য পূর্ব্বোক্ত নিষেধ-বাক্যগুলি মুখস্থ করিয়া পরে আহারাদির যেন আয়োজন করি ; নচেৎ কেবল শাকের দোষ দিলে চলিবে কেন ?

আমাদের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "হিন্দুত্ব" পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"আহারে পলাণ্ডু ব্যবহার করিলে শরীরমধ্যে প্রশান্ত ভাবের কিছু ব্যত্যয় হয়, ইহা আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই কারণে পলাণ্ডু উদ্ভিজ্জ হইলেও শাস্ত্রে ইহা ভোজন নিষিদ্ধ।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার "A Guide to health" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"All religions agree in regarding the human body as an abode of God. Our body has been given to us nothe understanding that we should render devoted service to God with its aid. It is our duty to keep it pure and unstained from within, as well as from without, so as to render it back to the Giver, when the time comes for it, in that state of purity in which we got it. If we fulfil the terms of the contract to God's satisfactions. He will surely reward us and make us heirs to immortality."

অর্থাৎ সকল ধর্ম্মের মত একই। মানবদেহ ভগবানের মন্দির। সুতরাং তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা যে পবিত্র দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই দেহকে যাহাতে আমরা ঠিক সেইরূপ শুদ্ধ ও পবিত্র রাখিতে পারি, তাহারই আমাদিগকে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যাহাতে ইহা কোন প্রকার বাহ্যিক আন্তরিক কারণবশতঃ কলুষিত বা অপবিত্র না হইতে পারে,

তাহারই চেষ্টা করা একমাত্র আমাদের কর্ত্তব্য। অবশেষে যেদিন আমাদেরকে মহাপ্রস্থান করিতে হইবে, সেদিন যেন আমরা তাঁহারই অর্পিত এই দেহকে ঠিক সেইরূপ বিশুদ্ধ ও পবিত্র অবস্থায় প্রত্যর্পণ করিতে পারি। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে উক্ত চুক্তি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, তবেই আমরা তাঁহার নিকট পুরস্কার লাভ করিবার সুপাত্র হইয়া অবশেষে অমরত্বলাভেও সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারিব।

তিনি আরও বলেন—

"True happiness is impossible without true health and true health is impossible without a rigid control of the palate. All the other senses will automatically come under our control when the palate has been brought under control."—Page 147.

বাস্তবিক শরীর সুস্থ না থাকিলে যথার্থ সুখলাভ হয় না এবং শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম রসনাকে সংযত করিতে হইবে। কারণ, রসনা সংযত হইলেই অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ই আপনা আপনি সংযত হইবে। ইহা সুনিশ্চিত।

মহাত্মাজী এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বাক্য দ্বারা অতি স্বল্প কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, নিরামিষ ভোজন ব্যতীত স্বাস্থ্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই এবং উদ্ভিজ্জমধ্যে শাকাদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য।

অন্য দিকে আমাদের সাধকাগ্রগণ্য সুপণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ ভারতী মহাশয় তাঁহার কয়েকটি সারবহুল প্রবন্ধমধ্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"সংসারী হউক, সন্ন্যাসী হউক বা যোগীই হউক, প্রত্যেকেরই আত্মসংযমী হওয়া চাই এবং আত্মসংযমী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আহারাদি-

বিষয়ে সংযত হইতে হইবে। আর যাঁহারা যোগী বা সাধক, তাঁহাদের পক্ষে বায়ু-(ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না) স্থান সংশোধিত করিতে হইবে। অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে উপবাসী হইয়া থাকিতে হইবে, নচেৎ বায়ুস্থান সংশোধিত হইবে না। তদ্ব্যতিরেকে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।"

"উপবাসী থাকিতে হইলে মধ্যে মধ্যে তিক্তাদি দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। অর্থাৎ—

(১) কোমল নিম্বপত্র
(২) হিলেবতা বা হিঞ্চেশাক
(৩) পল্‌তা
(৪) নাল্‌তে বা পাটশাক
(৫) পিড়ীংশাক
(৬) লুণিয়া শাক
(৭) ব্রাহ্মী শাকাদি

ভোজন করিতে হইবে।"

তিনি আরও বলেন, "যাঁহারা যোগাভ্যাসে রত, তাঁহারা উক্ত শাকাদি একাদিক্রমে নানাপ্রকারে সেবন করিয়া থাকেন। কারণ, কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত শাক কয়টি দ্বারাই দেহাভ্যন্তর বায়ু সংশোধিত হয়, নাড়ী পরিষ্কার হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং পরিণামে নানাপ্রকার সুফল সহ মানুষকে দীর্ঘায়ুসম্পন্ন করে।"

আমাদের ভারতী মহাশয় নিজে একজন নিষ্ঠাবান্ যোগী পুরুষ ছিলেন; সুতরাং তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই।

বরং আমরা মহাভারতমধ্যে কুণ্ডাধরের উপাখ্যানে পাঠ করিতে পাই:—শাকমনশনং তত্র সূর্য্যপর্ণী সুবর্চ্চলা।
তিক্তঞ্চ বিরসং শাকং তপসা স্বাদুতাগতম্॥

দৈবতিথিবিশেষেণ ফলমূলাশনো দ্বিজঃ।
ধর্ম্মে চাস্য মহারাজ দৃঢ়া বুদ্ধিরজায়ত॥ —শান্তিপর্ব্ব।

অর্থাৎ—তিনি মধ্যে মধ্যে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যপর্ণী ও সুর্ব্বচলাদি শাক যাহা অতি তিক্তরসপূর্ণ ও বিরস, ভোজন করিতে করিতে সুখানুভব করিতে লাগিলেন এবং কেবলমাত্র ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া দৈব তিথিবিশেষে সেবা করিতে করিতে সত্বর ধর্ম্মে অচলা ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সুতরাং ভারতীর বাক্যের সহিত মহাভারতের বচনমধ্যে ঐক্য স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে।

আবার আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে শরীরাভ্যন্তরে যাবতীয় যন্ত্র ও সেই সমূহের সূক্ষ্মতম মাংসগুলি কেহই জড় নহে। অর্থাৎ তাহারা যে কেবল মস্তিষ্কের প্রভাবে পরিচালিত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়, এরূপ নহে। তাহাদের প্রত্যেকেরই স্বাধীন ক্রিয়া আছে ও স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে। এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, মনোবৃত্তি কেবল জীবের মস্তিষ্কে থাকে, তাহা নহে। ইহা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে। অতএব পশুদের যে কোন অংশের মাংস ভক্ষণ করি না কেন, আমাদের মন পশুবৃত্তি দ্বারা কলুষিত হইবে অর্থাৎ আমরা পশুত্ব প্রাপ্ত হইব। অন্যদিকে শাকাদি-মধ্যে সেরূপ কোন প্রকার দূষণীয় পদার্থের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না—বিশেষতঃ কচি কচি শাকাদি-মধ্যে; তজ্জন্য কচি শাকাদি ভোজনে মানবপ্রকৃতি কোন প্রকার বিকার প্রাপ্ত না হইয়া উৎকর্ষই লাভ করিয়া থাকে।

এতৎসম্বন্ধে ডাক্তার L. Salzer M. D. সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপন করিব।

"The mind of the animal life is by no means exclusively centered in the brain : it is moreover vaguely diffused over the whole organism, so that in consuming

whatever part of the animal body, our mind becomes contaminated by all those properties peculiar to animal life—in other words we become animalized—" Vegetarianism Pure and Simple.—Page 23.

তিনি আরও বলেন—

"The habitual consumption of animal food by man tends to infuse in him a sub-consciousness tainted with animalism—that is to say with all those sub-conscious propensities constituting animal life."—Page 33.

পুনশ্চ তিনি একদিন পাঞ্জাব প্রদেশে একটি প্রকাশ্য সভায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"Give me therefore plants and fruits, vegetables whose juices are pure because unsoiled by any psychic reminicence—whose virgin cells have not been touched by the breath of passion and whose fibres still await the first tremors, that are to quicken into a life that is to be spiritual: and spirituality is the state of man, who, within the limits of his capacity aspires after perfection.

It is this indelible impulse towards progressive perfection that lies at the bottom of all religious movement. Chirst expected his disciples to be perfect.

I need hardly tell you that the spiritually minded man fares, as a rule, badly in this world.

He has no prominence to show, because he is altoge-

ther prominent. He stands head and shoulder above the masses, but such is the irony of times, that he is looked down opon"—Dr. L. Salzer, M. D. s' Vegetarianism.

তিনি আরও বলেন—

"Vegetarianism is by no means, a virtue in itself but it is a means, it is true, a most adequate means to an end.

It helps us to live in a house of our own uncontaminated by materials, that are unobjectionable for the purpose of building up tissues and structures wherein our better and noble self is to dwell."—Ibid Page 15.

অর্থাৎ আমরা যদি সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাই, তবে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, আমাদের আহারের দিকে লক্ষ্য রাখা। যাহাতে আমরা আমাদের দেহকে পবিত্র রাখিয়া ভগবানের আরাধনার উপযুক্ত পাত্র হইতে পারি, ইহাই যেন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়। আর সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে আমাদিগকে নিরামিষাশী হইয়া শাকমূলাদি ভোজন করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে।

সত্য বটে, আজকাল আমাদের মধ্যে অনেকেই পাতে শাক পাড়েন না; কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রতি বৎসর এই ভারত হইতে সহস্র সহস্র টাকার শাক ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইটালী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইতেছে। এ সকল খবর আমরা রাখি না বটে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে প্রকাশ যে, অন্যান্য শাকাদির মধ্যে শুল্‌ফা শাক ও বীজ (তাহার Dil or sowa) গত।

১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে ২, ৮০০ টাকার

১৯২১-২২ " ৫, ২২৪ "

১৯২২-২৩	খৃষ্টাব্দে	১৪,৩৮২	টাকার
১৯২৩-২৪	”	৩,২০০	”
১৯২৪-২৫	”	৩,৫০০	”

ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। আবার উহারই কিয়দংশ নানাবিধ ঔষধের আকার ধারণ করিয়া এই ভারতেই পুনরানীত হইয়াছিল। আর আমরাও হাস্যমুখে ও মুক্তহস্তে সেই সমুদয় ঔষধ অমৃতবোধে বহু মূল্যে ক্রয় করিয়া অনায়াসে আমাদের উদর পূরণ করিয়াছি। ধন্য আমাদের রুচি! ধন্য আমাদের বিদ্যা! ধন্য আমাদের বুদ্ধি!

অন্যদিকে আমরা জগন্মাতা চণ্ডিকা দেবীর সেই অভয় বাণী ভুলিয়া গিয়াছি—

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।

—দেবী-মাহাত্ম্যে নারায়ণীস্তুতির্নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ হে দেবগণ, পুনরায় শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টিবশতঃ পৃথিবী জল-সম্পর্কশূন্য হইলে, মুনিগণ সম্যক্‌রূপে আমাকে স্তব করিবেন এবং আমিও অযোনিসম্ভবারূপে প্রাদুর্ভূতা হইব এবং আমি আত্ম-দেহ-জাত প্রাণ-রক্ষক শাক দ্বারা, পুনরায় বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত সমুদয় জীবগণকে পালন করিব। তৎকালে পৃথিবীতে আমি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হইব।

অতএব এসো ভাই সকল, আমরা সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে বলি, হে মাতঃ শাকম্ভরি, দেখো যেন আমাদের মধ্যে কাহারও কখনও শাকান্নের অভাব না হয়।

পরিশিষ্ট

মানুষ চায় কি ? ধনদৌলত, সুসন্তান, দীর্ঘায়ু ও নীরোগ শরীর। আর চায় আপদ-বিপদ দূরে যাবে, পরকালে ভাল হবে। আমাদের শাস্ত্রকারগণের মতে মানব সদাচারী হইলেই ঐ সমস্ত অনায়াসে লাভ করিতে পারেন।

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥"

অর্থাৎ আচার হইতে আয়ুষ্মতা, অভীষ্টসন্তান, ধন ও অক্ষয় ভাব লাভ হয় এবং দুর্লক্ষণের নাশ হয়।

সত্য বটে আজকাল আমাদের দেশের পুরুষগণ পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা প্রভাবে ক্রমে ক্রমে আচারবিহীন হইতেছেন ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আজ পর্য্যন্ত আমাদের রমণীগণ এখনও পর্য্যন্ত আচারগুলি পরিশুদ্ধরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাই আমরা এখনও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারি। এখনও যে আমাদের গৃহে সুখ-শান্তি আছে তাহা আমাদের রমণীগণেরই কল্যাণে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"আচারবিধি মানবের ভূয়োদর্শনের ফলমাত্র। প্রকৃত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান যাহা বলে বা ভবিষ্যতে বলিবে, প্রকৃত সদাচার হইতে তাহা ভিন্ন নহে ; সুতরাং আমাদের দেশে যে-সকল আচারবিধি আছে, সেগুলি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে !"

শুদ্ধ যে দশবিধ সংস্কার, পূজাদিক্রিয়া বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেই আচারবিধি আছে, তাহা নহে ; আমাদের দেশের রমণীগণ যে-সকল বারব্রত করিয়া থাকেন, সেখানেও ঐ আচারবিধি পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, কুমারী অবস্থায় ছোট ছোট বালিকাগণও যে-সকল ব্রত করিয়া থাকে, সেখানেও ঐ সকল আচারবিধি দৃষ্ট হয়।

সৌভাগ্যক্রমে ঐ সকল আচারবিধির মধ্যেও শাকের প্রাদুর্ভাব কম নহে। কার্ত্তিকমাসে ভূতচতুর্দ্দশী তিথিতে পঞ্জিকাকারগণের মতে—

আচারাৎ চতুর্দ্দশ-শাকভক্ষণম্

এবং আমাদের রমণীগণও ঐ আচার বিশেষরূপে পালন করিয়া আসিতেছেন। তবে দুঃখের বিষয়, ঐ তিথিতে কোন্ কোন্ চৌদ্দশাক রন্ধন করিতে হয়, তাহা এক্ষণে অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। অনেকেই মনে করেন, যে কোন চৌদ্দশাক হইলেই হইল। কিন্তু তাহাতে দোষ বর্ত্তায়। আমাদের শাস্ত্রকারগণের মতে নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশ শাক রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে :—

"ওল, কচু, সরিষা, হিঞ্চে,
নিম, নিসিন্দা, শুল্‌ফা, সাঞ্চে,
বেতো, ভাটি, কেউ-জয়ন্তী শাক,
শুলতে পল্‌তা কর গে পাক।"

এখানে দেখা যাইতেছে যে, দুইটি শাক (অর্থাৎ পুঁই ও কল্‌মী) যাহা আমরা সচরাচর ভোজন করি, তাহাদের নাম উল্লেখ নাই। তৎসম্বন্ধে দুইটি কারণ দেখা যায় ; প্রথম চতুর্দ্দশী তিথিতে শরীরমধ্যে যে-সকল দোষ-সঞ্চার হয় ও ঋতুভেদে যে-সকল বিকারপ্রাপ্ত হয়, উহার জন্যই ঐ দুই শাকের নিষেধবাক্য নিহিত আছে। অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে কোষ্ঠস্থ অগ্নির প্রকোপ হয়, বিশেষতঃ চতুর্দ্দশী তিথিতে। দ্বিতীয় কারণ, রথের পর শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী (অর্থাৎ আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক) পর্য্যন্ত উক্ত দুই শাক ভোজন নিষেধ।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত দুই প্রকার শাকের যে-সকল দোষ-গুণের ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, কি কারণে ঐ তিথিতে বা ঐ কয় মাস উক্ত দুই শাক ভোজন নিষিদ্ধ। সেই

জন্য উহার পুনরুল্লেখ করিলাম না, সংক্ষেপে বলিতে হয় যাহাতে শরীরে কোন প্রকার নূতন ব্যাধির সঞ্চার না হয়, ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। Prevention is better than cure অর্থাৎ ব্যাধি হইলে ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্যলাভ করিব, তদপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া শতগুণে ভাল। তাই ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অন্যদিকে আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে পাঠ করি—

"শাকাম্লং লেখনং চোষ্ণং রুক্ষং বৈ দোষদ্রাবকম্।"

লেখন, উষ্ণ ও রুক্ষ কাহাকে বলে, তাহা অন্য প্রবন্ধে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তাই এ স্থানে তাহার পুনরায় উল্লেখ করা গেল না। তাহার উপর শাকাম্ল ত্রিদোষ দমন করে।

শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মেও দেখা যায় ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে পঞ্জিকায় শাকাষ্টকাশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ পিতৃগণকে তুষ্ট করিবার জন্য অষ্ট প্রকার শাক দ্বারা শ্রাদ্ধকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়।

শাকৈঃ কার্য্যা তৃতীয়াস্যা দেয়ো দ্রব্যগতো বিধিঃ।

অর্থাৎ তিনটি কৃষ্ণাষ্টকা শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। প্রথম পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে পূপাষ্টকা শ্রাদ্ধ, মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ, গৌণ ফাল্গুন ও মুখ্য চান্দ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শাকাষ্টকা শ্রাদ্ধের বিধি আছে। শ্রাদ্ধক্রিয়া দ্বারা যে কেবল পিতৃগণ পরিতুষ্ট হন, তাহা নহে—

"যেন প্রীণাতি পিতরং তেন প্রীতঃ প্রজাপতিঃ।"

সুতরাং দেখা গেল, শাক দ্বারা যে কেবল আমরা উদর পূর্ণ করি, তাহা নহে, পিতৃপুরুষগণ ও স্বয়ং প্রজাপতি শাক দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েন।

যাঁহারা শাককে অভোজ্য বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহাদের দেখা উচিত, শাক শব্দের অর্থ কি—শক্যতে ভোক্তুমিতি শাকঃ (শক্+ঘঞ)। শুদ্ধ তাহাই নহে, হবিষ্যান্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে বেতোশাক, হিঞ্চাশাক, শুষণীশাক,

কালশাক বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। তজ্জন্য ঐ সকল শাক শ্রাদ্ধকার্য্যে দেওয়া বিধি আছে। এতদ্ভিন্ন ব্রতাদি অনুষ্ঠানেও শাকাদির ব্যবস্থা দেখা যায়। বিশেষতঃ কুমারীগণ যে-সকল ব্রত করে, তন্মধ্যে পুণ্যি-পুকুর ও যমপুকুরের ব্রতে কয়েকটি শাকের নাম উল্লিখিত আছে। যথা—যমপুকুরের ব্রতে জল-সেচনের মন্ত্রটি এই—

শুষণী কল্মী ল-ল করে রাজার বেটা পক্ষী মারে
মারণ পক্ষী সুকোর বিল, সোনার কৌটা রূপার খিল।
খিল খুল্‌তে লাগল ছড় আমার বাপভাই হোক লক্ষেশ্বর,
কালো কচু সাদা কচু ল-ল করে রাজার বেটা পক্ষী মারে। ইত্যাদি।
(ল-ল করে অর্থাৎ দুলিতেছে)

অর্থাৎ কুমারী ব্রতিনী হইয়া বলিতেছে—এত প্রকার উপাদেয় শাক রহিয়াছে, তথাপি রাজার বেটা পোড়া পেটের জন্য পক্ষী মারিতেছেন। আমরা কিন্তু শাকান্নভোজন করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে অভিলাষ করি এবং প্রার্থনা করি, আমার বাপভাই লক্ষেশ্বর হউন। পাখী মারিতে গেলে ছড় লাগিবেই লাগিবে।

এখানে বেদের মন্ত্রাদি নাই, আছে প্রাণের সরল ভাব ও সরল ভাষা। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশ হইতে এই বারব্রত উঠিয়া যাইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে নাটক, নভেল ও থিয়েটারের সঙ্গীত বালিকাগণ কণ্ঠস্থ করিতেছে। ইহাই নাকি ক্রমোন্নতির পথ ?

তাহার পর পুণ্যিপুকুরব্রত। এই ব্রত কলিকাতা-সন্নিকটস্থ স্থানে যেরূপ প্রচলিত আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তন্মধ্যে শাকাদির নাম উল্লেখ নাই। গ্রামবিশেষে কিন্তু অন্য প্রকার মন্ত্রাদি প্রচলিত আছে। সে মন্ত্রটি এই—

নমঃ নমঃ শিব মহেশ্বর
তোমার বরে হে ঠাকুর
আমার এই পুণ্যিপুকুর
জলে হোক্, টই-টুম্বুর
মাছ করবে কিল্‌বিল্
আসবে বক আসবে চিল্।
আসবে কত ছেলে মেয়ে
হাসি মুখে যাবে নেয়ে ;
আমার পুকুরের জল নেবে
আমার বাগানের ফুল নেবে
শিবের মাথায় দিয়ে জল
পূজবে শিবের পদতল
বল্‌বে মুখে ববম্ ব্যোম্
অমনি ছুটে পালাবে যম।
শুষ্ণী কচু কল্‌মী শাক
দিনের দিন বাড়তে থাক
পাড়ার ছেলে পাড়ার মেয়ে
যত ইচ্ছা যাক্ না নিয়ে
এ যে আমার পুণ্যিপুকুর
বর দিয়েছে শিবঠাকুর। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর ব্রতের ফল—

এ পূজলে কি হয় ?
নির্ধনার ধন হয়,
সাবিত্রীর মত সতী হয়,

স্বামীর আদরিণী হয়,
স্বামীর কোলে দিয়ে ছেলে,
মরণ হয় তার একগলা গঙ্গাজলে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশেষে ব্রতকথা—

এখানেও সেই শাকের কথা—নিজের জন্য নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর জন্য—এ হেন মনের বাসনা বাঙ্গালী রমণীর নিজস্ব ধন। আর কোন দেশে আছে কি না জানি না। এ সকল ব্রতে গুরুপুরোহিতের আবশ্যক নাই, মাষ্টার-পণ্ডিতকে বেতন দিতে হয় না। মাতা স্বয়ং কন্যাকে শিক্ষা দিতেছেন। পুকুর প্রতিষ্ঠা করছে পাখীপক্ষী মাছ খাবে; পাড়ার লোকে জলে স্নান করবে। যাহার যত ইচ্ছা শাক নিয়ে যাবে। তার পুকুরের পাড়ে শিব প্রতিষ্ঠা করবে, যাহার শিবপূজা ইচ্ছা হবে, সে সেই পুকুরের জল নেবে, বাগান থেকে ফুল নেবে, শিবকে সন্তুষ্ট ক'রে মনের মত বর চাইবে। এখানে দান সামান্য হলেও অমূল্য ও পবিত্র। জল, শাক ও ফুল। মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় ও দেবতাগণের আদরের দ্রব্য।

এ হেন শাকে শুদ্ধ যে রসনার তৃপ্তি হয়, তাহা নহে, নানাবিধ রোগ আরোগ্য হয়, ধর্ম্মে মতি হয়, পিতৃপুরুষগণ পরিতৃপ্ত হন। আর হয় ছোট ছোট মেয়েদের বারব্রত ও গৃহস্থগণের আচাররক্ষা। তাই বলি, যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি শাককে ঘৃণা করুন; কিন্তু আমরা কখনও শাকের আদর করিতে বিরত হইব না।

হরীতকী

(১) হরীতকী-বৃক্ষ

হরীতকী-বৃক্ষ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। অতি নিম্নভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন হাজার ফুট উচ্চ ভূমিতেও হরীতকী-বৃক্ষ জন্মাইয়া থাকে। সচরাচর ইহা ৪০।৫০ ফুট উচ্চ হয়। তবে নর্ম্মদা-তীরে কোন কোনটি ৮০।১০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ দেখা যায়। আবার হিমালয়ের সু-উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে ৩০।৩৫ ফুটের অধিক বড় হয় না। যেন ভূমির উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের উচ্চতার হ্রাস হয়।

ইহার পত্রগুলি গোলাকার ডিম্বের মত, তবে কিঞ্চিৎ লম্বাটে। জোড়া জোড়া পত্র সামনা-সামনি শোভা পাইয়া থাকে। কচি অবস্থায় পাতাগুলি মখমলের মত কোমল থাকে, দেখিলে রেশমী বলিয়া বোধ হয় তবে যতই বড় হইতে থাকে, ততই পাতার উপরিভাগ মসৃণ হইয়া যায়। তখন আবার পাতার উপর ফোঁটা কাটা কাটা দাগ পড়িতে আরম্ভ হয়। ইহার পুষ্পগুলি ক্ষুদ্র ও শ্বেতবর্ণ, প্রায় চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহার ফুল ধরে।

আম্রাদি বৃক্ষের ন্যায় ইহার চির হরিদ্বর্ণ থাকে না। শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পাতাগুলি একে একে খসিয়া পড়িতে থাকে। আর শীতকালে একেবারে পত্রহীন হইয়া যায়। তখন দেখিলে বোধ হয়, বুঝি বা বৃক্ষগুলি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আবার বসন্তের সমাগমে নব নব কিশলয়ে সমাচ্ছাদিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সঞ্চার করে।

হরীতকী-বৃক্ষের কাষ্ঠ বেশ মজবুত। তজ্জন্য ইহার কাষ্ঠে সুন্দর সুন্দর বাক্স প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে ইহার কাষ্ঠে বড় বড় দরজা বা জানালা

প্রস্তুত হয় না, কারণ, এই বৃক্ষের কাষ্ঠে প্রায়ই লম্বা লম্বা চিড় দেখা যায়। কাষ্ঠে রং পাটকিলে, তবে কোথাও বা শ্বেতাভ, কোথাও বা সবুজ আভা-বিশিষ্ট। এই বৃক্ষের ত্বক, পত্র ও ফল কষায়প্রধান রসবিশিষ্ট।

হরীতকী-ফল কষায়প্রধান রস-বিশিষ্ট বটে; কিন্তু গুণে অমৃত সমান। তাই বৈয়াকরণিকগণ হরীতকী শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন—

হরতে প্রসভং ব্যাধীন ভুয়স্তকতিমদ্বপুঃ।
হরীতকী তু সা প্রোক্তো তকতি দীপ্তিবাচিকা॥

ইহা সর্ব্ববিধ রোগ হরণ করে বলিয়া ইহার নাম হরী, এবং দেহে দীপ্তি বৃদ্ধি করে বলিয়া তকতি, এই দুই শব্দ সংযুক্ত করিয়া হরীতকী পদ সম্পন্ন হইয়াছে।

অন্যদিকে মদন পাল নির্ঘণ্টকার বলেন—

হরস্য ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ।
হরেত্তু সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন প্রোক্তা হরীতকী॥

অর্থাৎ ইহা প্রথমতঃ হরভবনেই জন্মলাভ করিয়াছিল, ইহার ফল হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট এবং গুণে ইহা সর্ব্বরোগ হরণ করে, তাই ইহার নাম হরীতকী।

(২) হরীতকী-ফল

আবার আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিতে হরীতকীর প্রশংসার সীমা নাই।

হরীতকী মনুষ্যাণাং মাতেব হিতকারিণী।
কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী॥

অর্থাৎ হরীতকী মানবের পক্ষে মাতার মত হিতকারিণী, তবে মাতা কখনও কখনও কুপিতা হন, কিন্তু উদরস্থ হরীতকী কখনই কুপিত হয় না।

তা বলিয়া সকল সময়ে সকলকে হরীতকী সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পথশ্রান্ত, দুর্ব্বল, রুক্ষ, কৃশ, উপবাসী, পিত্তপ্রধানধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি, গর্ভবতী স্ত্রী ও বিমুক্তরক্ত ব্যক্তির পক্ষে হরীতকী-সেবন নিষিদ্ধ।

অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ রুক্ষঃ কৃশো লঙ্ঘনকর্ষিতশ্চ।
পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী বিমুক্তরক্তস্ত্বভয়াং ন খাদেৎ॥

অন্যদিকে ঋতুভেদে ও অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বৈদ্যকগণ বলিয়া থাকেন, ঐ সকল অনুপানের গুণানুসারে হরীতকীর গুণভেদ হইয়া থাকে।

অনুপানভেদে যথা—লবণ সহ সেবনে কফ, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত, ঘৃতের সহিত সেবনে বাতজ রোগ ও গুড়ের সহিত সেবনে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয়।

লবণেন কফং হন্তি পিত্তং হন্তি সশর্করা।
ঘৃতেন বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বরোগান্ গুড়ান্বিতা॥

ঋতুভেদে অনুপানভেদ, যথা—

বর্ষায় সৈন্ধব-লবণসহ	সেবনীয়	এক তোলা মাত্র
শরতে—চিনিসহ	”	”
হেমন্তে—শুঁঠচূর্ণসহ	”	”
শীতে—পিপুলচূর্ণসহ	”	”
বসন্তে—মধুসহ	”	”
গ্রীষ্মে—গুড়সহ	”	”

বর্ষাদিম্বভয়া প্রাশ্যা রসায়ন-গুণৈষিণা।
সৈন্ধব-শর্করা-শুণ্ঠীকণা-মধু-গুড়ৈঃ ক্রমাৎ॥

সাধারণতঃ হরীতকীর মাত্রা অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত, কিন্তু আবশ্যকমত মাত্রার তারতম্য করা যায়।

নিম্নলিখিত রোগে হরীতকী ব্যবহৃত হয়—

শ্বাসকাস-প্রমেহার্শঃ-কুষ্ঠশোথোদর-ক্রিমীন্।
বৈস্বর্য্য-গ্রহণীরোগ-বিবন্ধ-বিষম-জ্বরান্।
গুল্মাধ্মান-তৃষাচ্ছর্দ্দি-হিক্কাকণ্ডুহৃদাময়ান্।
কামলাং শূল-মানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃৎ তথা।
অশ্মরী-মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রঘাতঞ্চ নাশয়েৎ॥

[বৈস্বর্য্য—স্বরবিকৃতি, বিবন্ধ—মলবদ্ধতা, আধ্মান—পেটফাঁপা]

আবার হরীতকী-বীজের গুণ—

চক্ষুর হিতকর, গুরু, বাতনাশক।
পিত্তঘ্নী পথ্যা মজ্জা তু চক্ষুষ্যা বাতপিত্তহরা গুরুঃ।

দেশেভেদে নামভেদ—

হিন্দী ভাষায়—হরড়, হর, হড়।
দক্ষিণ প্রদেশের হিন্দী—কল্‌রা, হাল্‌ম্রা।
মহারাষ্ট্র ভাষায়—হত্তকী, বালহড়রী।
গুজরাটী ভাষায়—হরতে, হিমজ।
কর্ণাটী ভাষায়—অনিলেয়, প্রাপসে।
তৈলঙ্গী ভাষায়—কর‌কচেট্টু।
উৎকল ভাষায়—হরিড়া, করেড়া।
তামিল ভাষায়—কড়কে।
আসামী ভাষায়—শিলিখা।
সাঁওতাল ভাষায়—রেলী।
নেপালী ভাষায়—হোরা।
পাহাড়ী ভাষায়—হামা।
মগী ভাষায়—কাজো।

বোম্বায়ে—হীরদা

ব্রহ্মদেশে—পাঙ্গা

পারস্যে—হলিলহ।

চীনে—হোলিলে।

সিংহলে—আয়াঙ্ক।

ফারসী ভাষায়—হর্লে লেকলাংজীবী অসফর, হর্লে লেজর্দ্দ।

আরবী ভাষায়—এইলীলজ, কাবলী, অবলীজ,
অসযাব, অহলিজ, অসবদ।

ইংরাজী ভাষায়—Myrobalan (মাইরোবেলান)
বা Black Myrobalan (ব্লাক মাইরোবেলান)

বৈজ্ঞানিক ভাষায়—Terminalia Chebula (টার্মিনোলিয়া কেবুলা)

সংস্কৃত ভাষায়—

হীরতক্যভয়া পথ্যা কায়স্থা পূতনামৃতা ॥
হৈমত্যব্যথা চাপি চেতকী শ্রেয়সী শিবা।
বয়ঃস্থা বিজয়া চাপি জীবন্তী রোহিণীতি চ ॥

পর্য্যায়-শব্দ—হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী, ও রোহিণী।

হরীতকী হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম হরীতকী-তৈল।

তাহার গুণ—শীতং হরীতকীতৈলং কষায়ং মধুরং কটু।
সর্ব্বব্যাধিহরং পথ্যং নানা-ত্বক্-দোষনাশনম্ ॥

ইহা চর্ম্মরোগের বিশেষ উপকারী।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বলেন—

"হরীতকী চ শুভদা গ্রামেষু নগরেষু চ।"

তাই যেদিন বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণদেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার জন্য দ্বারকা নগরী নির্ম্মাণ করিয়া নিজ গুণপণা দেখাইয়াছিলেন, সেই দিন সকলে দেখিলেন—

হরীতকীভির্ধাত্রীভিস্তরুভিঃ পরিতঃ স্মৃতাম্।

দ্বারকার চারিদিক ধাত্রী (আমলকী) ও হরীতকী-বৃক্ষ দ্বারা পরিশোভিত। ইহাতেই নগরের মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল।

পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থে হরীতকী-বৃক্ষোৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

অশ্বিনীকুমারদ্বয় একদিন দক্ষ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে দেব, এ হেন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হরীতকীর উৎপত্তি কিরূপে হইল? তদুত্তরে দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন—

পপাত বিন্দুর্ম্যো দিব্যো শক্রস্য পিবতোঽমৃতম্।
তত দিব্যা সমুৎপন্না সপ্তজাতি-হরীতকী॥

অর্থাৎ একদিন ইন্দ্রদেব স্বর্গে বসিয়া অমৃত পান করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার পাত্র হইতে সপ্তবিন্দু অমৃত ধরাধামে পতিত হয়। সেই সপ্তবিন্দু হইতে সপ্তবিধ হরীতকী-বৃক্ষের উৎপত্তি।

অভয়া চেতকী পথ্যা পূতনা চ হরীতকী।
জয়া হৈমবতী চৈব প্রোক্তা সপ্ত ইমাঃ শিবাঃ॥

অর্থাৎ অভয়া, চেতকী (বা কেতকী), পথ্যা, পূতনা, হরীতকী, জয়া ও হৈমবতী।

কিন্তু ভাবপ্রকাশমতে সপ্তবিধ হরীতকী এই—

বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চামৃতাভয়া।
জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্তজাতয়ঃ॥

অর্থাৎ বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী, এই সপ্তবিধ হরীতকী এবং পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ হরীতকী সম্বন্ধে সুবিস্তৃত ব্যবস্থা-পত্র দেওয়া আছে।

সপ্তবিধ হরীতকীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

১। "অভয়া" ত্রিগুণা জ্ঞেয়া সূক্ষ্মবর্ণা গুরুস্তথা।
ত্রিরেখা বর্ত্তুলা রুক্ষা কফহৃদ্রোগহা স্মৃতা॥

২। "কেতকী" পূর্ব্বদেশে স্যাৎ বস্তিব্যাধিবিনাশিনী।
দশাঙ্গুলৈর্দশরেখা চ দেবনামপি দুর্লভা॥

৩। "পথ্যা" মাগধদেশে স্যাৎ বস্তিব্যাধিবিনাশিনী।
পঞ্চাঙ্গুলা চতুরেখা কীর্ত্তিতাচ রসায়নী।

৪। "পূতনা" সপ্তকোণান্তা সিংহলদ্বীপজা মতা।
আয়ুষ্যা সা হরা শুভ্রা নামতশ্চ ষড়ঙ্গুলা॥

৫। "হরীতকী" বনোদ্ভূতা সর্ব্বোদরবিনাশিনী।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী-মেহবাতপিত্তকফাপহা॥

৬। "জয়া" সিন্ধুদ্ভবা জ্ঞেয়া গুল্মপ্লীহাবিনাশিনী।
রক্তাতিসার-পিত্তঘ্নী দীপনী কফহৃৎপরা॥

৭। ক্ষুদ্রা হৈমব"তী" প্রোক্তা বালব্যাধিবিনাশিনী।
নেত্ররোগে প্রশস্তা চ সর্ব্বাময়বিনাশিনী॥

১। অভয়া-জাতীয় হরীতকী ত্রিগুণবিশিষ্ট, আকৃতিতে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ওজনে ভারী, ত্রিরেখাবিশিষ্ট, গোলাকার। ইহা রুক্ষ এবং কফ ও হৃদ্‌রোগ দূর করে।

২। কেতকী জাতীয় হরীতকী পূর্ব্বদেশে জন্মে এবং সর্ব্বপ্রকার মূত্রস্থলীরোগ দূর করে, আকৃতিতে দশাঙ্গুলিপরিমিত ও দশটি রেখাবিশিষ্ট এবং ইহা দুর্লভ, এমন কি, দেবতারাও পান না।

৩। পথ্যা-জাতীয় হরীতকী মগধদেশে জন্মে, ইহাতে বস্তিব্যাধি বিনাশ করে, ইহার আকৃতি পঞ্চাঙ্গুলি ও ইহাতে চারিটি রেখা আছে, ইহা দীর্ঘজীবনপ্রদ।

৪। পূতনা হরীতকী সপ্তকোণবিশিষ্ট, সিংহলদ্বীপজাত; ইহাও আয়ুর্বৃদ্ধি করে, দেখিতে শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট ছয় আঙ্গুল পরিমিত।

৫। সাধারণতঃ আমরা যাহা ছোট হরীতকী বলিয়া জানি, তাহা বনমধ্যে জন্মায়, সর্ব্বপ্রকার উদরের পীড়া দূর করে; ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী, মেহ, বাত, পিত্ত ও কফ নাশ করে।

৬। জয়া হরীতকী সিন্ধুসমুদ্ভূত, ইহাতে গুল্মরোগ ও প্লীহা রোগ আরোগ্য হয়। রক্তাসার ও পিত্তজ রোগসমূহ দূর করে, কফ নাশ করে ও ইহা দীপনী (অর্থাৎ ইহাতে আম বা অপক্ব রসের পরিপাক না হইলেও অগ্নির উদ্রেক করে)।

৭। হৈমবতী হরীতকী আকৃতিতে ক্ষুদ্র, ইহা সর্ব্বপ্রকার বালব্যাধি ও নেত্ররোগে প্রশস্ত এবং ইহা সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি দূর করে।

ভাবপ্রকাশের মতে—সপ্তবিধ হরীতকী এই—

> বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চামৃতাভয়া।
> জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্তজাতয়ঃ॥

আকৃতি:—বিজয়ার আকৃতি অলাবু (লাউ) সদৃশ গোলাকার; রোহিণী সম্পূর্ণ গোল। পূতনার আকৃতি সূক্ষ্ম, কিন্তু বৃহৎ বীজযুক্ত; অমৃতা মাংসল (অর্থাৎ শাসসংযুক্ত) ও ক্ষুদ্রবীজবিশিষ্ট; অভয়া পাঁচটি রেখাবিশিষ্ট; জীবন্তী স্বর্ণবর্ণ এবং চেতকী তিনটি রেখাসংযুক্ত।

> অলাবুবৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা।
> পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃতা॥
> পঞ্চরেখাঽভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী।
> ত্রিরেখা চেতকী জ্ঞেয়া সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ॥

এবং উক্ত সপ্ত প্রকার হরীতকীর গুণ এই প্রকার—

"বিজয়া" সর্ব্বরোগেষু "রোহিণী" ব্রণরোধিণী।
প্রলেপে "পূতনা" যোজ্যা "শোধনার্থেঽমৃতা" হিতা॥
অক্ষিরোগেঽভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ।
চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রযোজয়েৎ॥

অর্থাৎ "বিজয়া" সর্ব্বরোগে উপকারী, "রোহিণী" ব্রণপরোধিনী (ক্ষত পূরিয়া উঠে) প্রলেপে "পূতনা", "অমৃতা" ভেদাদি সংশোধনকার্য্যে প্রশস্ত। "অভয়া" নেত্ররোগে প্রযুজ্য, "জীবন্তী" সর্ব্বরোগবিনাশক, এবং "চেতকী" হরীতকী চূর্ণার্থে ব্যবহার্য্য।

সুতরাং হরীতকী ব্যবহার করিতে হইলে উক্ত সমুদয় গুণ বিবেচনা করিয়া তবেঁ রোগবিশেষে প্রয়োগ করিবে।

কিন্তু হায়, আজকাল না গন্ধবণিকগণ হরীতকী চেনেন—না বৈদ্যগণ উক্ত গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া হরীতকী রোগবিশেষে প্রয়োগ করেন। সুতরাং রোগী উপকার পাইবে কিরূপে? বৈদ্যশাস্ত্রে লেখা আছে, অমুক ব্যাধিতে অমুক হরীতকী প্রয়োগ করিবে, সুতরাং যাহা হাতের নিকট পাওয়া যায়, তাহাই ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন, ফলও তদ্রূপ পান। দোষ হয় বৈদ্যশাস্ত্রের। জানি না, কতদিন আমাদের গন্ধবণিকগণ উক্ত সপ্তপ্রকার হরীতকী জানিয়া শুনিয়া তবে বিক্রয় করিবেন। যেদিন গন্ধবণিকগণ ও বৈদ্যগণ সেইরূপ করিবেন, সেই দিন হইতে আবার লোকে বৈদ্যশাস্ত্র বিশ্বাস করিবে, ইহা সুনিশ্চিত।

চেতকী আবার দুই প্রকার—

চেতকী দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্বেতা কৃষ্ণা চ বর্ণতঃ।
ষড়ঙ্গুলায়তা শুক্লা কৃষ্ণা ত্বেকাঙ্গুলা স্মৃতা॥

অর্থাৎ—শুক্লা চেতকী ছয় অঙ্গুলি-পরিমিত এবং কৃষ্ণ চেতকী এক অঙ্গুলি-পরিমিত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে লিখিত আছে, উক্ত সাত প্রকার হরীতকী চিনিবার আর এক উপায় আছে।

কাচিদাস্বাদমাত্রেণ কাচিৎ গন্ধেন ভেদয়েৎ।
কাচিৎ স্পর্শেন দৃষ্টান্যা চতুর্দ্ধা ভেদয়েচ্ছিবা॥

অর্থাৎ—হরীতকী চিনিবার চারটি উপায়—চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা।

(১) কতকগুলির আস্বাদ গ্রহণ করিয়া
(২) কতকগুলি গন্ধ দ্বারা
(৩) কতকগুলি স্পর্শ করিয়া
(৪) অন্যগুলি কেবল দেখিয়া চিনিতে পারা যায়।

উক্ত সপ্তবিধ হরীতকীর মধ্যে বিজয়া নাম্নী হরীতকী শ্রেষ্ঠ, কারণ, ইহা সুখসেব্য, সুলভ্য ও সর্ব্বরোগে হিতকর।

সপ্তানামপি জাতীনাং প্রধানা বিজয়া স্মৃতা।
সুখপ্রয়োগা সুলভা সর্ব্বরোগেষু শস্যতে॥

আর চেতকী হরীতকী অতিশয় ভেদকারক, এমন কি, কথিত আছে যে, এই বৃক্ষের ছায়ায় মনুষ্যাদি যে কোন প্রাণী গমন করে, অমনি তাহার ভেদ হইতে থাকে। আবার ঐ হরীতকী-ফল যতক্ষণ মানুষের হাতে থাকে, ততক্ষণ তাহার ভেদ হইতে থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ ও ঔষধি-দ্বেষী ব্যক্তিগণের সুখবিবেচনার্থ এই চেতকী হরীতকী অতিশয় প্রশস্ত।

সেবন-নিষেধ, বৈদ্যশাস্ত্রে আছে—

অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ রুক্ষঃ কৃশো লঙ্ঘনকর্ষিতশ্চ।
পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী বিমুক্তরক্তস্ত্বভয়াং ন খাদেৎ॥

অর্থাৎ পথশ্রান্ত, দুর্ব্বল, রুক্ষ, কৃশ, উপবাস দ্বারা ক্ষীণদেহ, পিত্তপ্রধান-ধাতু, গর্ভবতী স্ত্রী ও বিমুক্তরক্ত ব্যক্তি (যাহাদের রক্ত মোক্ষণ করা হইয়াছে), ইহাদিগের হরীতকী-সেবন নিষিদ্ধ।

প্রশস্ত হরীতকী—সকল হরীতকীমধ্যে যে হরীতকী নূতন, স্নিগ্ধ, কঠিন, গোলাকার, গুরু এবং যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত ও অত্যন্ত গুণকারক।

নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুর্ব্বী ক্ষিপ্তা চ যাম্ভসি।
নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা চ কথিতাতিগুণপ্রদা॥

আবার সেবন-ভেদে ইহার গুণভেদ হইয়া থাকে।

চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়েত্যগ্নিং (চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়)।

পেষিতামলশোধিনী (পেষণ করিয়া সেবন করিলে মল শোধিত হয়)।

স্বিন্না সংগ্রাহিণী পথ্যা (সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ করে)।

ভৃষ্টা প্রোক্তা ত্রিদোষঘ্নুৎ, (ভাজিয়া খাইলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়)।

অপর দিকে—আহারের সহিত সেবনে বল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়; বায়ু, পিত্ত, কফ নাশ করে, ও মূত্র, পুরীষ, ক্লেদসমূহ বিনির্গত হয়। আর আহারান্তে হরীতকী-সেবনে বায়ু, পিত্ত, কফ ও অন্নপানজনিত পীড়াসমূহ নিবারিত হয়।

উন্মীলিনী বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়ানাং নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাম্।
বিস্রংসিনী মূত্রশকৃন্মলানাং হরীতকী স্যাৎ সহ ভোজনেন।

অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্তকফোদ্ভবান্।
হরীতকী হরত্যাশু ভুক্তস্যোপরিযোজিতা।
চেতকীপাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ।
ভিদ্যন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।

চেতকী চ ধৃতা হস্তে যাবৎ তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ।
তাবৎ ভিদ্যতে বেগৈর্বা প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ।
তৃষ্ণার্ত্ত-সুকুমারাণাং কৃশানাং ভেষজদ্বিষাম্।
চেতকী পরমা শস্তা হিতা সুখবিরেচনী॥

হরীতকীর গুণ—

কষায়াম্লা চ কটুকা তিক্তা মধুরসান্বিতা।
ইতি পঞ্চরসা পথ্যা লবণেন বিবর্জ্জিতা॥

অর্থাৎ ইহাতে কষায়, অম্ল, কটু, তিক্ত ও মধুর এই পঞ্চবিধ রস আছে, কেবল লবণ-রস নাই।

আর হরীতকীর মজ্জায় মধুররস, স্নায়ুতে অম্ল-রস, বৃন্তে তিক্ত-রস, ত্বকে কটুরস ও অস্থিতে (আঁটিতে) কষায়-রস বিদ্যমান আছে।

পথ্যায়া মজ্জনি স্বাদুঃ স্নায়াবাম্লো ব্যবস্থিতঃ।
বৃন্তে তিক্তস্ত্বচি কটুরস্থি তু তুবরো রসঃ॥

এবং তজ্জন্য ইহার উপকারিতা—

অম্লভাবাদ্ধরেদ্বাতং পিত্তঃ মধুরতিক্তকাৎ।
কফং রুক্ষকষায়ত্বাৎ ত্রিদোষঘ্না ততোঽভয়া॥

অর্থাৎ ইহাতে অম্লরস থাকায় বাতরোগে উপকারী, মধুর ও তিক্ত-রস থাকায় পিত্ত-দোষে উপকারী, রুক্ষ কষায় বলিয়া কফে উপকারী। এইরূপে ইহা বাত, পিত্ত ও কফ ত্রিদোষের বিশেষ উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে—

ভাবপ্রকাশ—

১। গুড়ের সহিত হরীতকী সেবনে অর্শ, অম্ল, অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধে উপকারী।

২। ঘৃত এবং গুড়ের সহিত হরীতকী সেবনে পিত্তশূল আরোগ্য হয়।

৩। তিলতৈল কিম্বা ঘৃত কিম্বা মধু সহ হরীতকীচূর্ণ লেহনে রুগ্‌দাহ সন্নিপাতে বিশেষ উপকার হয়।

৪। অধিক মাত্রায় জায়ফল ভক্ষণ জন্য যদি মত্ততা জন্মায়, তাহা হইলে হরীতকী সেবন করিবে।

সুশ্রুত—

১। হিক্কা হইলে—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকীচূর্ণ পান করিতে দিবে।

২। গুল্মরোগে—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিতে দিবে।

৩। শ্লীপদে—গো কিম্বা ছাগমূত্র সহ হরীতকী পান করিলে শ্লীপদ (বা গোদ) আরোগ্য হয়।

৪। বাতরক্তে—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবনে সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

৫। অন্তর্বলি অর্শে—এক সপ্তাহকাল প্রতিদিন প্রাতে গুড়ের সহিত সেবনে অর্শরোগ আরোগ্য হয়।

চরক—

১। উদররোগে—হরীতকী বিশেষ উপকারী; কিন্তু ইহা সেবনের বিশেষ বিধি আছে; বৈদ্য ব্যতিরেকে অন্য লোকের ইহা প্রয়োগ বিধেয় নহে।

২। উষ্ণ জলের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবনে পক্কাতিসার প্রশমিত হয়।

৩। হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া এবং গোমূত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে কফজ পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়।

৪। সর্দ্দিজনিত বমনের উদ্রেক হইলে—মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ লেহন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

চক্রদত্ত—

১। গব্যঘৃতে হরীতকী ভিজাইয়া পেষণপূর্ব্বক চক্ষুর বহির্দ্দেশে প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

২। গুড়ের সহিত হরীতকী সেবনে শোথ আরোগ্য হয়।

৩। ৩টি বা ৫টি হরীতকী ভোজন করিয়া পরে গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে উগ্র বাতরক্তও আরোগ্য হয়।

বঙ্গসেন—

১। আঙ্গুল-হাড়ায়—লৌহপাত্রে হরিদ্রার রসে হরীতকী পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

২। শূলযুক্ত অতিসারে—মধুর সহিত হরীতকী সেবন করিবে।

হারীত—

বাসকের রসমিশ্রিত হরীতকীচূর্ণ ৫।৭ বার ভাপনা দিয়া মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে সুকঠিন রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়।

বাণভট্ট—

১। অশ্মরী (পাথুরী) রোগে—গোদুগ্ধে হরীতকীর অস্থি (আঁটি) সিদ্ধ করিয়া পরে উক্ত আঁটি বাদ দিয়া পান করিলে পাথুরী রোগ আরোগ্য হয়।

২। কণ্ঠরোগ—মধুসহ হরীতকীক্বাথ পান করিলে সকল প্রকার কণ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

৩। গব্যঘৃত উত্তপ্ত করিয়া লইবে এবং হরীতকীচূর্ণ সেবন করিয়া তৎপরে উক্ত উত্তপ্ত ঘৃতসেবনে দেহের বলবৃদ্ধি হয়।

পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে

হরীতকী দ্বিবিধ ;—অপক্ক ও পরিপক্ক।

১। অপক্ক—কষায় ও মৃদুরেচক। ইহাকে জঙ্গী হরীতকী বলে।

২। পরিপক্ক—রেচক (ইহা ঈষৎ হলুদবর্ণবিশিষ্ট)। পূর্ব্বে কেবল রঞ্জনের জন্য ভারত হইতে হরীতকী রপ্তানী হইত; এক্ষণে ঔষধার্থেও পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রেরিত ও ব্যবহৃত হইতেছে।

সন্ন্যাসি-দত্ত মুষ্টিযোগ—

বাতজ্বরে—ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী—প্রত্যেকটি তুল্যপরিমাণে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। তৎপরে আধসের-পরিমিত জলে সিদ্ধ করিবে। জ্বাল যেন মৃদুমন্দ হয়, ঘুঁটের জ্বালই উৎকৃষ্ট। যখন অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া লইবে এবং ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে দুই তোলা আদার রস উহাতে মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। তিন দিনমধ্যে বাতজ্বর বিনষ্ট হইবে।

কফজ্বরে—হরীতকী, চিরতা, পল্‌তা, গুলঞ্চ ও বাসকপাতা সমভাবে লইয়া—মোট দুই তোলা ওজন পরিমিত লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ পান করিলে শ্লৈষ্মিক জ্বর বিদূরিত হয়। কিম্বা হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, কলসা, ইন্দ্রযব ও কটকী পূর্ব্ব-পরিমিত লইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিমত ক্বাথ পান করিলেও কফজ্বর নষ্ট হয়।

বিষম বা সান্নিপাতিক জ্বরে—হরীতকী, পিপুল, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, হরানভা, মরিচ, চিরতা, গুলঞ্চ, বাসক, নিম্বত্বক, পল্‌তা ও কটকী সমভাগে দুই তোলা-পরিমিত লইবে। পরে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ পান করিলে বিষমজ্বর দূর হয়।

বাতপিত্ত-জ্বরে—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রাস্না, বাসকের ছাল, শিমূলের ছাল (কচি হইলে ভাল হয়), সোঁদালের আটা সমভাগে দুই তোলা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কাথ করিয়া সেবনে বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়। অথবা—হরীতকী, কটকী, মুথা, পিপুলমূল ও সোঁদাল ফল পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে লইয়া কাথ সেবনেও বাতশ্লেষ্মজ্বর আরোগ্য হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর—হরীতকী, নিমত্বক, বেড়েলা, যষ্টিমধু, আমলকী, পল্‌তা, নিমছাল পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কাথ প্রস্তুতকরতঃ সেবনে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

প্লীহাসংযুক্ত বিষমজ্বরে—আড়াই তোলা পুরাতন গুড়ের সহিত আধ পোয়া ত্রিফলার (হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী) কাথ সেবনে প্লীহসংযুক্ত বিষমজ্বর বিনাশ পায়।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির কাথ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ পিপুলের গুঁড়া ও যবক্ষারের গুঁড়া মিশাইয়া সেবন করিলে প্লীহার্জ্বরে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

হরীতকী, রয়নাগাছের ছাল ও স্বল্প পঞ্চমূল (শালপাণি, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারি ও গোক্ষুর ইত্যাদিকে স্বল্প পঞ্চমূল বলে)।

অথবা বহেড়া, নিমক, হরীতকী, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ ও আমলকী পথক পৃথক চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। পরে সমস্ত চূর্ণগুলি একত্র মিশাইয়া লইবে। প্রত্যেক চূর্ণের ওজন সমান হওয়া চাই।

বয়ঃক্রম্ অনুসারে দুই রতি হইতে অর্দ্ধতোলা মাত্রা পর্য্যন্ত সেবনে প্লীহাসংযুক্ত বিষমজ্বরে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পুরাতন জ্বরে—হরীতকী, আমলকী, পল্‌তা, নিমত্বক্, বহেড়া, সোঁদাল ও দ্রাক্ষা সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া

আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উহাতে চারি আনা মাত্র শর্করা মিশাইয়া সেবনে পুরাতন জ্বর নিশ্চয় বিনষ্ট হয়।

পুরাতন জ্বরের সহিত মন্দাগ্নি, অজীর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে নিম্নলিখিত পাচন বিশেষ উপকারী—

দশমূল, বামনহাটী, হরীতকী, পিপুল, কুড়, গুলঞ্চ, মুথা ও ক্ষেতপাপড়া পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে লইয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পাচনের ক্বাথ করিয়া সেবনে ঐ সকল উপসর্গ দূর হয় এবং জ্বরও বিনষ্ট হয়।

বিষমজ্বরে—হরীতকী, নিমপাতা, ঘৃত, গুগ্‌গুল, যব, শ্বেতসরিষা, বচ ও কুড় এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষম জ্বর ও পুরাতন জ্বর বিনাশ পায়।

আমাতিসারে—হরীতকী, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব ও আকনাদি সমভাগে লইয়া তাহার পাচনের ক্বাথ সেবনে আমাতিসার আরোগ্য হয়।

অজীর্ণে—হরীতকী ও পিপ্পলী সমভাগে মোট দুই আনা লইয়া উহার পাচন করিয়া কিঞ্চিৎ (অর্থাৎ আধ তোলা আন্দাজ) সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া সেবন করিতে হয়। অথবা হরীতকী, পিপ্পলী, বিট্ লবণ ও রক্তচিতার মূল সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পরে সেই চূর্ণের দুই আনা পরিমিত লইয়া গরম জলের সহিত সেবনে সকল প্রকার অজীর্ণ বিদূরিত হয়।

ক্রিমিরোগে—নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে ঘোলের সহিত মর্দ্দন করিবে। উহা সেবনে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

যথা—হরীতকী, সৈন্ধব, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ ও কমলাগুড়ি।

অম্লশূলরোগে—স্বর্ণমক্ষিকা, লৌহ ও হরীতকী এই তিনটি দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অম্লশূল রোগে বিশেষ উপকার হয়।

অশ্মরী ও বহুমূত্র রোগে—হরীতকী, মুথা, লোধ ও বটফল এই চারিটি বস্তু সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া তাহার পাচন করিয়া ক্বাথ সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

দন্তরোগে—হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পল্‌তা, নিমত্বক্‌ সমভাগে লইয়া জলে সিদ্ধ করিবে এবং সেই জল দ্বারা কুলকুচা করিলে সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ আরোগ্য হয়। দন্তশূল—হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুথা ও কুড় এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া উহা দ্বারা দন্ত ঘর্ষণে দন্তশূল আরোগ্য হয়।

আগুনে পোড়ার প্রতিকার—হরীতকী, জীরা, ধনিয়া ও ধুপ এই কয়টি দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত পাক করিবে। পরে উহা আগুনে পোড়া স্থানে দিলে জ্বালা যন্ত্রণা সমস্ত দূর হয়।

এই সব ব্যতীত হরীতকীর সুন্দর মোরব্বা প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে লিখিত হইল। পচা ও মিশ্রিত ভেজাল ঘৃতে প্রস্তুত মিষ্টান্ন না খাইয়া যদি আমরা প্রত্যহ একটি বা দুইটি করিয়া হরীতকীর মোরব্বা খাই, তাহা হইলে ইহাতে আহার ও ঔষধ দুইই হয়। বীরভূম জেলায় সিউড়ীতে এই মোরব্বা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। আশা করি, ক্রমশঃ কলিকাতাতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইবে।

বস্ত্ররঞ্জন—হরীতকী জলে ভিজাইয়া রাখিলে বা গরম জলে সিদ্ধ করিলে একপ্রকার হরিদ্রাভ রং বাহির হয়, অনেকে সেই জলে বস্ত্র ভিজাইয়া বস্ত্র রঞ্জিত করে; কিন্তু সে রং অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

তবে হরীতকীসহ ফুলকুড়িপাতা ও কিছু ফট্‌কিরি মিশাইয়া জলে ভিজাইয়া রাখিলে যে ক্বাথ হয়, তাহা স্থায়ী ও উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ-বিশিষ্ট হয়।

লিখিবার কালি প্রস্তুত—

হরীতকী, বহেড়া ও টোড়া একত্র করিয়া তাহাতে হীরাকস দিলে উত্তম কালো কালি প্রস্তুত হয়।

আবার উক্ত কালিতে নীলবড়ি মিশাইলে উত্তম ব্লু-ব্ল্যাক কালি হয়।
জুতা-ব্রুস করিবার কালি—

কুসুমফুল, আল্, মঞ্জিং, হল্‌দি, তৈল মিশাইয়া যে আটা হয়, তাহাতে হরীতকী, হীরাকস ও লোহমাটি মিশাইয়া জুতা-ব্রুস জন্য উত্তম কালি প্রস্তুত হয় এবং ইহাতে ঘোড়ার সাজও বেশ রঞ্জিত করা যায়।

তসর, কোরা, এণ্ডী প্রভৃতি বস্ত্র ও পশম রং করিবার জন্য হরীতকী-ছাল ও বাবলা ঝুঁটি মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়।

রপ্তানী।

এতদ্ভিন্ন ভারত হইতে য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে হরীতকী বহুল পরিমাণে বৎসর বৎসর রপ্তানী হয়। ঐ সকল দেশে ঔষধার্থে বড় একটা ব্যবহার হয় না, কেবল রং করিবার জন্য ও চর্ম্ম প্রস্তুত করিবার জন্যই এদেশ হইতে লইয়া যায়। তাহাদের মতে হরীতকী ফলে ২০ হইতে ৫০ ভাগ Tannin আছে, উহার জন্য ইহাতে যেরূপ সুন্দররূপে উৎকৃষ্ট চর্ম্ম প্রস্তুত করা যায়, সেরূপ অন্য কোন দ্রব্যে হয় না। সেই জন্যই ইহার এত আদর। C. W. E. Cotton I. C. S. Collector of Customos Calcutta লিখিত Handbook of Commercial Information for India নামক গ্রন্থে প্রকাশ যে, ইংলণ্ডের জন্য পাঁচ প্রকার হরীতকী অধিক পরিমাণে রপ্তানী হয়।

১। বিম্‌লী—ইহা বিমলীপট্টম্ (মাদ্রাজ) হইতে রপ্তানী হয়
২। রাজপুরী — বোম্বাই হইতে
৩। বেন্‌গুরলাস্ — "
৪। জব্বলপুরী — মধ্যপ্রদেশ হইতে
৫। মাদ্রাজী — মাদ্রাজ হইতে রপ্তানী হয়।

উক্ত পাঁচ প্রকার বঙ্গদেশ, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতেও রপ্তানী হয় বটে, কিন্তু বিলাতে তাহাদের তত আদর নাই।

লণ্ডন বাজারে মাদ্রাজী (১নং) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, আর তাহার নীচেই B1 ও J2 মার্কা অর্থাৎ বিমলী ও জব্বলপুরী বলিয়া রপ্তানীই বেশী হয়।

আর কলিকাতা হইতে যাহা রপ্তানী হয়, তাহার মূল্য অনেক কম, আবার কলিকাতা হইতে যাহা রপ্তানী হয়, তাহার অধিকাংশ ভাগই আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাজাত। খাস বাঙ্গালা হইতে খুব কম হরীতকী রপ্তানী হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, য়ুরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে হরীতকীর ঔষধ বলিয়া কোন আদর নাই; সেখানে কেবল চর্ম্ম পরিষ্কার ও রং করিবার জন্যই হরীতকী ব্যবহার হইয়া থাকে। ঐ সকল কর্ম্মে যে যে হরীতকী জাতীয় দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাহার গুণের তারতম্যানুসারে দামেরও ভেদাভেদ হইয়া থাকে এবং নামও পৃথক্ পৃথক্ দিয়া থাকে। এই তিন নামে হরীতকী য়ুরোপে রপ্তানী হয়।

(1) Terminalia Chebula (হরীতকী)

(2) Terminalia Belirica (বহেড়া)

(3) Phyllanthus Emblica (আমলকী)

তাহাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হরীতকী লম্বাটে এবং কোণবিশিষ্ট এবং সেগুলি প্রায়ই মাংসল হইয়া থাকে। আর যেগুলি গোলাকার ও স্পঞ্জের মত নরম, সেগুলি রঞ্জনাদি-কর্ম্মে তেমন উপকারী নহে। আবার এখান হইতে যত প্রকার হরীতকী রপ্তানী হয়, তাহার গুণভেদে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশোৎপন্ন বলিয়া পাঁচটি বিভিন্ন নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

আদ্রত হরীতকী রপ্তানী করিলে জাহাজের ভাড়া অধিক লাগে, তজ্জন্য আজকাল অনেকে হরীতকীসার প্রস্তুত করিয়া স্বল্পব্যয়ে বিলাতে রপ্তানী করিতেছেন।

১৮১৮।১৯ খৃষ্টাব্দে এক কলিকাতা হইতে ১৯০০ টন হরীতকীসার রপ্তানী করিয়া ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা মূল্য পাইয়াছিল।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, ভারত হইতে কত পরিমাণে হরীতকী রপ্তানী হইয়া থাকে।

খৃষ্টাব্দ	টন	পাউণ্ড
১৯১৩-১৪	৬১,৮১৯	৩৭৯,৬২৬
১৪-১৫	৫৮,২১৩	৩৫০,৪৫০
১৫-১৬	৬৯,৬৩৩	৪৭০,১৫৭
১৬-১৭	৫৪,৬৮১	৪১৮,৮৯৫
১৭-১৮	৪০,৭৭৮	৩১৫,৩০৩
১৮-১৯	৪১,১৯৫	৩২৮, ৯৩৬

কলিকাতা হইতে প্রায়ই ডিসেম্বর হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত হরীতকী রপ্তানী হইয়া থাকে।

১৯১৩।১৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে ৩২,৬৫২ টন, বঙ্গদেশ হইতে ২৩,৫০০ টন এবং মাদ্রাজ হইতে ৫,৬৬৭ টন রপ্তানী হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বেঙ্গবলা ও রত্নগিরি প্রদেশ হইতে ও করাচী হইতে রপ্তানী হইতেছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে পরিমাণে হরীতকী রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার তালিকা।

খৃষ্টাব্দ	টন	টাকা
১৯১৯।২০	১০,৬১,০৩০	৫৬,৪৪,৮০০৲
১৯২০।২১	৩,৪০,০৬৩	১৬,৯৯,৯৭০৲

খৃষ্টাব্দ	টন	টাকা
১৯২১।২২	৬,৫১,৯১১	৩১,৯১,৪৮৩৲
১৯২২।২৩	৭,৬,৬১২	৪১,৬৮,৯৮২৲

কিন্তু ক্রমশঃ বিলাতেও হরীতকী ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায়, ঐ সকল কারণে হরীতকীর রপ্তানী দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

এই সকল কারণে হরীতকীর আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বণিকগণ হরীতকীর ব্যবসায়ে ক্রমেই প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতেছেন। আমাদের মধ্যে কিন্তু কয়জনই বা আজকাল হরীতকী ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন জানি না। আশা করি, আমাদের যুবকগণ হরীতকী ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া দিন দিন দেশের ও দশের উপকার করিতে বিরত থাকিবেন না।

হরীতকী-মোরব্বা প্রস্তুত প্রণালী

কাঁচা হরীতকীগুলিকে ভাল করিয়া নির্ম্মল জলে ধৌত করিবে। ধৌত করিবার পর লৌহ বা অন্য ধাতু বা কাষ্ঠনির্ম্মিত শলাকার দ্বারা হরীতকীগুলিকে একে একে ভাল করিয়া বিদ্ধ করিবে। পর পর পাঁচবার গরম জলে সিদ্ধ করিয়া উক্ত জল ফেলিয়া দিবে, ক্রমান্বয়ে এইরূপ পাঁচবার সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিলে হরীতকীর কস অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া যাইবে। তাহার পর চিনির প্রস্তুত রসে এই হরীতকীগুলি পাক করিয়া লইবে। তাহার পর কিছুদিন চিনির পাকরসে রাখিয়া দিলে সুন্দর হরীতকীর মোরব্বা প্রস্তুত হয়। ইহা ভক্ষণে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, এবং ইহাতে কোনরূপ অপকারের সম্ভাবনা নাই।

আলু

আলু নানাবিধ; কিন্তু আজকাল আলু বলিলে আমরা সাধারণতঃ গোল আলুই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু ইংরাজদিগের এ দেশে আগমনের পূর্ব্বে ভারতে গোল আলু আদৌ ছিল না। কারণ, ইহা দক্ষিণ-আমেরিকা-জাত কন্দ মাত্র। পেরু ও ভার্জিনিয়া প্রভৃতি প্রদেশে ইহা স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধা রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে; তাঁহার প্রিয়পাত্র সার ওয়ালটার র্যালেই প্রথমে ইহা ইংলণ্ডে লইয়া আসেন, ক্রমে ইহা অন্যান্য দেশে নীত হয়। ইংরাজদের এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভারতে আনীত হয়।

যাহা হউক, এক্ষণে ভারতে এই গোল আলু প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং নৈনিতাল প্রভৃতি স্থানের গোল আলুর এক্ষণে বাজারে খুব আদর;

আমাদের এই বঙ্গদেশেও গোল আলু প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার আবাদে বিলক্ষণ লাভ হয়। হুগলী জেলায় যে আলুর আবাদ হয় তাহাকে আমরা দেশী আলু বলিয়া থাকি। দেশী আলু যে সময় নূতন বাজারে নীত হয়, তখন ইহা নৈনিতাল আলু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট ও সুস্বাদ বলিয়া সকলেই আদর করেন; নৈনিতাল আলু কিন্তু অধিক দিন থাকে এবং অল্প তাপে গলিয়া যায়। দেশী আলু পুরাতন হইলে তেমন গলে না এবং ইহার আস্বাদ তেমন থাকে না। বৈদ্যবাটীর হাটে দেশী আলুর আমদানী যথেষ্ট হয় এবং ইহার ব্যবসায়ে লাভও বিলক্ষণ হয়।

আধুনিক বৈদ্যকগ্রন্থে এই আলুর গুণ-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

"আলুকং শীতলং সর্ব্ব-বিষ্টম্ভি মধুরং গুরু।
সৃষ্টমূলমলং রুক্ষং দুর্জ্জরং রক্তপিত্তনুৎ।
কফানিলকরং বলং বৃষ্যং স্তন্যবিবর্দ্ধনম্॥"

অর্থাৎ আলু শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভি, মধুর-রস, গুরু, মলমূত্র-নিঃসারক, রুক্ষ, দুষ্পাচ্য, রক্তপিত্তনাশক, কফানিলবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

এ হেন নানা গুণধর দ্রব্যে আদর হইবে না কেন? আয়ার্লণ্ড দেশেও ইহার বিলক্ষণ আদর হইয়াছে।

তাই সুগায়ক ও সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য প্যারীমোহন কবিরত্ন আলুর গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে বলিয়াছেন—

(ঝিঁঝিট তেলেনা)

আলুর সমান জিনিস কিছু নাই
জগৎসংসারে ভেবে দেখ ভাই,
সুমিষ্ট, বিধির সৃষ্ট, বালাই লয়ে ম'রে যাই।
আলুর নাইকো ছোবড়া আঁটি আঁস, ছাড়ালে সকলি শাঁস,
শীত বর্ষা বারো মাস পাওয়া যায়—ঝালে কি ঝোলে অম্বলে,
যাতে দেবে তাতে মেলে, দেবামাত্র গ'লে যায়।
মাত্র কিছু তার, তার কি কব তার,
এমন আলু যে না ভালবাসে,
তার ভালবাসার মুখে ছাই।
গোল গোল কি সুঠাম যেন সাদা শালগ্রাম,
রাশনাম বিলাতী আলু বলে,
তরকারী-দলে, যত আছে ভূমণ্ডলে
আলুর নীচে সকল শা—ই দোলে।

দেহে বাড়ে বল, বাহে হয় সরল
রক্ত সাফ এক হপ্তা খেলে বিনাশে কফপিত্তবায়।
ভেজে খেলে যায় জ্বর কাসি
বর্ণে হয় শশী দোষী।
বারো মাস টাট্‌কা থাকে, ভাই রে!
মাগমরা পুরুষের পক্ষে
এমন জিনিস ত্রৈলোক্যে
ভেবে দেখ আর কিছু নাই রে।
খেয়ে ভাতে-ভাত করে কুঁপোকাৎ
প্যারী হেসে বলে, আলু যেন বিদেশে তোমায় পাই

ভাষাভেদে আলুর ভিন্ন নাম

সংস্কৃত ভাষায়—আলুকং

বাঙ্গালায়—আলু

বোম্বায়ে—বাতাকা

হিন্দীতে—আলু

ফার্সী—জেবজমিনী আলু

আরবী—তোফ্ ফাহুল আরদ

তামিলী—ওয়া রাই কি লাঙ্গু

তৈলঙ্গী—উটালে গুড্ডা

ইংরাজী—Potato

ল্যাটিন নাম—*Sulanum Tuberosun*

গোল আলু সর্ব্বত্রই সুপরিচিত, কিন্তু বোধ হয়, অনেকে অবগত নহেন যে, ইহার ফুল ও ফল উভয়ই হয়; সেগুলি কিন্তু অখাদ্য। ইহার কন্দ বা মূলই ভক্ষ্য।

এতৎসম্বন্ধে এইরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে। সর্ব্বপ্রথম সার ওয়ালটেয়র র‍্যালে যখন ইংলণ্ডে গোল আলু আনয়ন করেন, তখন একদিন কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজনের ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য, নিমন্ত্রিত বন্ধুগণকে এই আলুর তরকারি খাওয়াইয়া সকলকে মোহিত করিবেন।

র‍্যালে সাহেবের আদেশমত গোল আলু সিদ্ধ, গোল আলুর চপ, গোল আলুর তরকারি প্রস্তুত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতি আলু উত্তোলন করিয়া বাবুর্চ্চির ঘরে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে ব্যক্তি জানিত না যে, আলুর মূল খাদ্য, ফল অখাদ্য। সুতরাং সেই ব্যক্তি ঐ জ্ঞানের অভাবে মূল সংগ্রহ না করিয়া ফলগুলি রন্ধনের ব্যবস্থা করিল।

আহারের সময় টেবিলে বসিয়া র‍্যালে সাহেবের মুখে হাস্য ও গুণব্যাখ্যা ধরে না, এমন সময় বাবুর্চ্চি সাহেব আলুসিদ্ধ আনয়ন করিল। সকলেই আগ্রহের সহিত তাহার সদ্ব্যবহারে মনঃসংযোগ করিল, কিন্তু মুখে দিয়া সকলেই অবাক্, থু থু করিয়া সকলেই ফেলিয়া দিল। র‍্যালে সাহেব স্বয়ংও উহা গলাধঃকরণ করিতে না পারিয়া রন্ধনকারীর উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন।

রন্ধনকারী অবাক্, ভাবিল, বুঝি বা তাহার রন্ধনের দোষ।

তাহার পর আলুর চপ আসিল, সেগুলিও অভক্ষ্য বলিয়া কেহই খাইতে সম্মত হইল না।

অতঃপর র‍্যালে সাহেব এতৎসম্বন্ধে সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার ভৃত্যের দোষেই এরূপ হইয়াছে; মূলের পরিবর্ত্তে ফলের তরকারি রন্ধন হইয়াছে।

যাহা হউক, তৎপরদিন র‍্যালে সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ইহার মূল উত্তোলন করিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পূর্ব্বরাত্রের নিমন্ত্রিত বন্ধুগণকে পুনরায় আহ্বান করিয়া এই আলুর অপূর্ব্ব আস্বাদনে পরম পরিতোষ প্রদান করিতে সমর্থ হন।

তদবধি আর কেহ আলুর ফল গ্রহণ করেন না, সকলেই মূলকন্দই ব্যবহার করিয়া থাকে। এমন কি, অবোধ বালকেও গোল আলু বলিলে ইহার মূলকে বুঝিয়া থাকে।

হাকিমী মতে—ইহার সোরমা চক্ষুর জ্যোতিঃ সতেজ করে।

মুষ্টিযোগ—

অগ্নিদগ্ধ স্থানে আলু বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিরারিত হয় এবং ক্ষত আরোগ্য হয়।

ডাক্তারী মতে—শুষ্ক অবস্থায় ইহাতে

শ্বেতসার	৬৪	অংশ
শর্করা ও গঁদ	১৫	"
প্রোটিন	৯	"
তৈলাক্ত দ্রব্য	১	"
সূত্র	১১	"
	১০০	

ইহার মূল পুষ্টিকারক; পত্রে মাদকতা গুণ আছে, দাহ ও বহুমূত্র রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা হইতে সার প্রস্তুত করিয়া শূল ও বেদনাদিতে প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

মাত্রা ১।৮ হইতে ২।৮ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

সোলেনীয়া নামক একপ্রকার উপ-ক্ষার আলুর বীর্য্য।

১। গোল আলুর চাষ

আলুর জমিতে যতই চাষ দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। তজ্জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে, যখন ভাদুই ফসলগুলি ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া লওয়া হয়, তখন হইতেই জমি প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রথমে জমিতে উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটিকে ধূলির মত করিয়া লইতে হয়, তাহার পর সার দিয়া জমিতে আলুর চাষের উপযুক্ত করিয়া লইতে হয়।

সারের মধ্যে অস্থিচূর্ণই আলুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। বিঘা প্রতি ৩।৪ মণ অস্থিচূর্ণ দিলে ভাল হয় এবং বীজ রোপণের অন্ততঃ ৩।৪ মাস পূর্ব্বেই অস্থিচূর্ণ দিয়া উত্তমরূপে মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। কারণ, ঐ সার মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইতে না পারিলে সার দেওয়া বৃথা হয়। এমন কি, কেহ কেহ বলেন, অস্থিচূর্ণ দিতে হইলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মধ্যেই দেওয়া উচিত। কারণ, অস্থিচূর্ণ পচিয়া সার হইতে কিছু সময় লয়।

আর যাঁহারা গোময়-সার বা খইল-সার ব্যবহার করেন, তাঁহাদের উচিত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ঐ সার দেওয়া।

কেবল সার দিলেই হইল না—যাহাতে সার মাটির সহিত সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত হয় এবং বীজ-বপনের পূর্ব্বে যাহাতে মাটির সহিত সার মিশিয়া গিয়া পচিয়া যায়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

কেহ কেহ বীজ-বপনের সঙ্গে সঙ্গে অথবা বীজ-বপনের ১৫।১৬ দিন মাত্র পূর্ব্বে মাটিতে অস্থিচূর্ণ দেয়, উহাতে ফসলের কোন উপকারই হয় না। কারণ, অস্থিচূর্ণ পচিয়া সারত্ব পাইবার পূর্ব্বেই আলুর ফসল শেষ হইয়া যায়। যে উদ্দেশ্যে সার দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কোন ফলই পাইল না।

খইল বা গোময়-সার দিতে হইলেও বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া উচিত নহে, কারণ, সার পচিবার সঙ্গে সঙ্গে বীজও উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং বীজ পচিয়া যায়। এমন কি, অনেক সময় পোকা লাগিয়া সমুদয় ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে।

নূতন পলিপড়া হাল্‌কা মৃত্তিকাই ইহার চাষ জন্য প্রশস্ত এবং ভাদ্র মাস হইতে জমিতে চাষ দিতে হয়।

দোআঁস মৃত্তিকাতে ইহার আবাদ করিতে হইলে বিঘা প্রতি ৬।৭ মণ খইল সার দিতে হয়। সাধারণতঃ খইল ও গোময়ের সার দেওয়া হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে পচা পাতা, চুণ, বালি, অস্থিচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া দিলে আরও ভাল হয়।

ক্ষেত্রে অন্যূন ৭।৮ বার চাষ দিতে হয়। লাঙল দ্বারা কর্ষণ করিয়া ভূমিকে যত অধিক গভীর করিয়া খনন করিবে, ততই ভাল। ৩।৪ বার চাষের পর খইল-সার দিতে হয়। ঘাস, মুথা বাছিয়া লইয়া, ঢেলা ভাঙ্গিয়া, মৃত্তিকা চূর্ণবৎ করিয়া, মই টানিয়া ক্ষেত্র উত্তমরূপ পাটি (সমতল) করিয়া লইয়া তবে বীজ রোপণ করা উচিত। তজ্জন্য কার্ত্তিক মাসেও জমিতে আর একবার লাঙ্গল ও মই দিলে আরও ভাল হয়।

প্রথমতঃ, হস্ত দ্বারা লাঙ্গল টানিয়া দুই ফুট অন্তর অর্দ্ধ ফুট পরিমাণে গভীর জোল করিয়া লইবে। তাহাতে এক এক ফুট অন্তর এক একটি বীজ রোপণ করিবে এবং তাহার উপর চূর্ণমৃত্তিকা দ্বারা চাপা দিবে।

ইহাতে বড় বীজ প্রতি বিঘায় ১/০ মণ, ছোট বীজ ৩/০ মণ লাগিবে। এই সময় অতি সাবধানতার সহিত কার্য্য করিতে হয়, যেন বীজের অঙ্কুর ভগ্ন না হয়।

অন্ধকার ঘরে আলু রাখিয়া তাহাতে চট বা কম্বল চাপা দিলে শীঘ্র অঙ্কুর বাহির হয়।

অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া ৪ ইঞ্চি উচ্চ হইলে ১ ইঞ্চি চূর্ণমৃত্তিকা দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। এইরূপে মৃত্তিকা দ্বারা উহাকে পূর্ণ করিয়া ক্ষেত্রের উপর উচ্চ কান্দি বাঁধিতে হইবে। তাহার পর মাঝে মাঝে ক্ষেত্র নিড়ান করা কর্ত্তব্য।

বীজ রোপণের সময় হইতে অর্দ্ধ ফুট চারা হওয়া পর্য্যন্ত, যদি ক্ষেত্রে বেশী রস থাকে, তবে সময় সময় খনন করিয়া রস কমাইবার উপায় করিয়া দিতে হয়। অন্যদিকে নীরব-মৃত্তিকায় জলসেচন আবশ্যক। যাহাতে সমস্ত ক্ষেত্রটি আর্দ্র থাকে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ১০ দিন অন্তর পুনরায় জল দিবে।

ক্ষেত্রে জলীয়-ভাগের অল্পতা করিয়া দিলে সার-নষ্টকারী কীট জন্মিতে পারে না। গাছের গোড়ায় কাঠের ছাই দিলেও তাহাতে কীট নষ্ট হইবে।

আলুর বীজ বড় বড় হইলে তাহা কাটিয়া পুঁতিতে পারা যায়। কিন্তু ইহাতে একটু পুঁতিবার তারতম্য আছে। আলুগুলি চোকসমেত ২।৩।৪ খণ্ড করিয়া কাটিয়া কাটিয়া, ছাই মাখাইয়া ঘরের মধ্যে ২।১ দিন রাখিয়া পরে যথাবিধি রোপণ করিলে ভাল হয়, কারণ, তাহাতে আলু পচিবার সম্ভাবনা থাকে না।

বর্ষা থাকিতে বীজ রোপণের জন্য তাড়াতাড়ি না করিয়া বর্ষা উত্তীর্ণ হইতে দেওয়া ভাল। কার্ত্তিক মাস পড়িলে বর্ষা প্রায় শেষ হইয়া যায়। তখনই আমাদের এই বঙ্গদেশের মাটিতে আলু রোপণ করা প্রশস্ত। কারণ, আমাদের দেশের মাটি একটু রসা ; রস কমিয়া আসিলে বীজ পচিবার আশঙ্কা থাকে না।

পৌষ মাস হইতেই আলু উঠাইতে আরম্ভ করে, কিন্তু যাবৎ গাছ না মরিয়া যায়, তাবৎ আলুকে ক্ষেত্রে থাকিতে দিলে ভাল হয়। কারণ, তখন আলু অধিক পুষ্ট হয় এবং উহার জলীয় অংশ কমিয়া গিয়া অধিক সারবান

হয়। তাই ক্ষেত্রের সমুদয় গাছ মরিয়া গেলে তবে যত্নের সহিত আলু উঠাইয়া লইতে হয়।

আমাদের দেশে পৌষ মাসের প্রথমে একবার আলু তুলিয়া লয়। তখন বাঁশের বা লৌহশলাকা দ্বারা আস্তে আস্তে মাটি খুঁড়িয়া বড় বড় আলু বাহির করিয়া লয়।

তাহার পর ঐ গাছগুলি কিঞ্চিৎ হেলাইয়া অবশিষ্ট আলুগুলিতে মৃত্তিকা চাপা দেয় এবং তাহার ৩।৪ দিন পরে ঐ সকল গাছের গোড়ায় অল্প পরিমাণে জল সেচন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আলু পাওয়া যায়। মাঘ-ফাল্গুন মাসে আলুর সমস্ত গাছ শুকাইয়া যায়। সেই সময়ে সমস্ত আলু তুলিয়া লইতে হয়। এই সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন আলুতে বৃষ্টির জল না লাগে, কারণ, এই সময় বৃষ্টির জলে আলুতে একপ্রকার দাগ ধরে এবং শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ঐ আলু বেশী দিন থাকে না।

সমস্ত আলু তুলিয়া লইয়া তন্মধ্য হইতে মাঝারি মাঝারি আলু বাছিয়া লইয়া বীজের জন্য রাখিতে হয়। অবশিষ্ট আলুগুলি কিছু রৌদ্র লাগাইয়া রাখিলে প্রায় ১ বৎসর ভাল থাকে। উহা ধৌত করিলে শীঘ্র নষ্ট হয়।

একবিঘা জমিতে প্রায় ১০০ মণ পর্য্যন্ত আলু উৎপন্ন হইতে পারে। তবে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা, চাষ ও সারের তারতম্যানুসারে ফসল নির্ভর করে। ন্যূনপক্ষে একবিঘা জমিতে ৮০/০ মণ আলু পাওয়া যায়। এই সময়ে বাজারে ১।০ সিকা করিয়া মণ বিক্রীত হয়।

বিঘা প্রতি ৪০৲ টাকা আন্দাজ খরচ পড়িলে প্রায় ৬০৲ টাকা লাভ পাওয়া যায়।

Journal of the Royal Horticultural Society নামক পত্রে লিখিত আছে—নিম্নলিখিত মিকশ্চার প্রস্তুত করিয়া আলুগাছে পিকচারী

করিলে পোকা নষ্ট হয়। একপক্ষান্তরে ঐ মিক্‌শ্চার ঝাঁজরা দ্বারা সেচন করিলে আলু আকারেও বৃদ্ধি পায় এবং ফসলও অধিক ফলে।

প্রতি বিঘায় ১২০ গ্যালন মিক্‌শ্চার আবশ্যক। ইহাকে Bordeaux Mixture বলে।

তুঁত Sulphate of Copper 1 lb (অৰ্দ্ধ সের)
তাজা চুণ Fresh Slaked Lime 1 lb
Syrup 1 lb
জল Water 5 Gallons

ইহাতে আরও লিখিত আছে যে, ঐরূপ মিক্‌শ্চার ব্যবহারে আলুগাছগুলি অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে ; সুতরাং আলুর আকার বাড়ে ও আলু পুষ্ট হয়।

M. Perret বলেন—

তুঁতে	দশ সের
গুড়	ঐ
নূতন চুণ	ঐ
জল	৩০ গ্যালন

তাঁহার মতে প্রথমতঃ (১০) দশ সের জলে দশ সের চূণ এবং অন্য দশ সের জলে দশ সের গুড় উত্তমরূপে মিশাইবে এবং অন্য দশ সের জলে দশ সের তুঁতে মিশাইবে।

তাহার পর সকলগুলি একত্র করিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে।

ঐ জল গাছে দিলে শুদ্ধ যে পোকা লাগে না, তাহা নহে, ইহাতে আলু পুষ্ট হয়।

এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, তুঁতে, চূণ ও গুড় আলুগাছের পক্ষে পরম উপকারী।

কাহারও কাহারও মতে কেরোসিন তৈল, খোল ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া গাছে দিলে পোকা নষ্ট হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে তাহাতে গাছ নষ্ট হইয়া যায়।

তবে সরিষার খোল, জল, লবণ ও রন্ধনশালার ঝুল দিলে অনেক সময়ে পোকা নষ্ট হয়।

Indian Agriculturist নামক সাময়িক পত্রে লিখিত আছে—

আলুর বীজ রোপণ করিবার পূর্ব্বে বীজগুলিকে

Sulphate of Ammonia	6 lbs
Nitrate of Potash	6 lbs
Water	25 gallons

একত্র মিশ্রিত করিয়া তন্মধ্যে একদিন ভিজাইয়া রাখিলে গাছে পোকা লাগে না। এমন কি, বীজের মধ্যে যদি পোকা থাকে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়।

আলুর ক্ষেত্রে অধিক সারের প্রয়োজন। এমন কি, যত সার দিবে, তত ফসল পাইবে। তাই দোআঁস মাটিতে প্রতি বিঘায়—

(১) ১০০ হইতে ২০০ মণ—গোময়-সার

(২) ৮ মণ—রেড়ির খইল অথবা ৩।৪ মণ সরিষার খইল।

আবার মাটি এঁটেল হইলে ২৫।৩০ মণ ছাই দিলে ভাল হয়।

আলু অধিক দিন রাখিবার উপায়

১। বালির মধ্যে পুঁতিয়া অথবা ঘরের মধ্যে বালি বিছাইয়া, তাহার উপর আলু রাখিয়া, আবার বালি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিবে।

২। আলুকে ১২।১৪ ঘণ্টা কাল নিম্নলিখিত জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তুলিয়া লইয়া সযত্নে গৃহ-মধ্যে রাখিবে।

জল	৯৮ ভাগ
Sulphuric Acid	২ ভাগ
	১০০

কিন্তু বীজের জন্য যে আলু রাখিবে, তাহা এই জলে ভিজাইবে না; কারণ, তাহা হইলে বীজ অঙ্কুরিত হইবে না।

৩। মোম গলাইয়া আলুর উপর ছড়াইয়া দিলে আলু অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

মাটির গুণে, সারের গুণে ও পাটের তারতম্যতা অনুসারে ফসল ভাল-মন্দ হয়। সচরাচর প্রতি বিঘায় ৫০।৬০ মণ উৎপন্ন হয়, তবে কোথাও কোথাও ২০০।৩০০ মণ পর্য্যন্ত আলু উৎপন্ন হয়, এরূপ শুনা গিয়াছে।

২। শ্বেত পিণ্ডালু বা চুবড়ি আলু

ইহার সংস্কৃত নাম—

শ্বেতঃ পিণ্ডীতকঃ পিণ্ডকন্দো রোমশকন্দকঃ।
কন্দগ্রন্থিশ্চ পিণ্ডালুঃ পিচ্ছলঃ স্বাদুকন্দকঃ॥

ইহাকে পিণ্ডীতক, পিণ্ডকন্দ, রোমশকন্দ, কন্দগ্রন্থি, পিণ্ডালু, পিচ্ছল ও স্বাদুকন্দকও বলে।

হিন্দীতে—রতালু, পিণ্ডালু কাঁদু, শকরকন্দী।

মহারাষ্ট্রে—রতাল্লে, গোড়েঁরতাল্লে।

গুজরাটে—রতালু, শ্বেতালু।

কর্ণাটে—কেপিন হেণ্ডল, বিনয়হেণ্ডল।

তৈলঙ্গে—চির গেডু

তামিলে—যাবংস্কোল্লং

উৎকলে—ঘরা আলু

ফারসীতে—জরবাদ লাহোরী

ইংরাজীতে—Sweet Potato, Yam

ল্যাটিনে—*Batatas Esculatus*

ইহার গুণ—পিণ্ডালুর্মধুরঃ শীতো মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরাপহা।
দাহশোষপ্রমেহঘ্নো বৃষ্যঃ সন্তর্পণো গুরুঃ॥

পিণ্ডালু—মধুররস, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, সন্তর্পণ ও গুরু। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, শোষ, প্রমেহনাশক। ইহার শিকড় বিষাক্ত, তজ্জন্য ইহার শিকড় খাওয়া নিষিদ্ধ। ইহার গঠন নিয়মিত নহে। কোনটি লম্বা কোনটি গোল, কোনটি আঁকাবাঁকা ইত্যাদি নানা আকারের হইয়া থাকে।

উহার উপরিভাগে মেটে রঙ্গের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবৎ দাগ থাকে, ঐ সকল স্থানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় লাগিয়া থাকে।

জমি ভাল এবং উপযুক্ত পাট হইলে এক একটি চুবড়ি আলু /৪ সের /৫ সের অপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। ইহার চাষের জন্য জমি উচ্চ ও মাটি দোআঁস হওয়া চাই। মাটি একহাত হইতে দেড় হাত গভীর করিয়া কোদলাইয়া পরে লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। চৈত্র মাসের মধ্যে ঐ সকল করিয়া বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রে এক একটি আলু পুঁতিয়া দিতে হয়।

ইহার লতা বৃহৎ হয়। এই জন্য বড় গাছের উপর ঐ লতা উঠাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়; আর না হয় যদি, মাচা বাঁধিতে হয়, তবে মাচা যেন মজবুত হয়।

কিন্তু সচরাচর আমাদের দেশে কেহই ইহার জন্য চাষ করে না, অথবা মাচাও বাঁধিয়া দেয় না ; এমন কি, কেহ ইহার বিশেষ যত্ন করে না বলিলেই চলে। পতিত স্থানে আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে। এমন কি, এই আলু প্রায় বাজারে বিক্রয় জন্য আনীতও হয় না।

তবে সম্প্রতি এই আলু বাটিয়া ছানার পরিবর্ত্তে মিষ্টান্নাদির জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় এই আলু কিছু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ইহার সম্যক্ চাষ করিলে যে লাভজনক হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩। আলুকী বা রাঙ্গা আলু

রাঙ্গা বা লাল আলুর সংস্কৃত নাম—আলুকী। হিন্দীতে ইহাকে বারুই বলে। ইংরাজী—Sweet potato।

ইহার গুণ—আলুকী বলকৃৎ স্নিগ্ধা গুর্ব্বী হৃৎকফনাশিনী।
বিষ্টম্ভকারিণী তৈলে ললিতাতিরুচিপ্রদা॥

লাল আলু বলকর, স্নিগ্ধ, গুরু, হৃদয়গত কফনাশক ও বিষ্টম্ভী। ইহা তৈলে ভাজিলে অত্যন্ত রুচিকর হয়।

এই আলুর আকার লম্বা, মধ্যস্থল মোটা এবং দুই পার্শ্ব ক্রমশ সরু হয়। তবে সময়ে সময়ে গোলাকার রাঙ্গা আলুও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রং লাল, সেই জন্য ইহাকে রাঙ্গা বা লাল আলু বলে। ইহা অতিশয় সুমিষ্ট, সেই জন্য ইংরাজীতে ইহাকে sweet potato বলে। ইহা সিদ্ধ করিলে মোমের মত কোমল হইয়া যায়। ইহার ঘ্রাণও প্রীতিপ্রদ।

ইহার গাছ লতানে। গোল আলুর জন্য যেরূপ হাল্‌কা মাটির আবশ্যক, ইহার জন্যও সেইরূপ মাটি হইলে ভাল হয়। তবে গোল আলুর জন্য মাটির যত পাট করিতে হয়, ইহার জন্য তত পাটের আবশ্যক নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই ইহার বীজ-বপন করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই ক্ষেত্রের মাটি উত্তমরূপে কোপাইয়া তাহার পর লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। তাহার পর বিঘা প্রতি ৮।১০ গাড়ী শুষ্ক গোময়-সার ঐ মাটির সহিত দিতে হয়। তাহার পর বৃষ্টি হইলেই বীজ রোপণ করা উচিত।

ইহার জন্য ছোট আলু বা পুরাতন গাছের ডাল বা লতা কাটিয়া পুঁতিয়া দিলে চলে। তবে আলু পুঁতিয়া গাছ জন্মাইতে হইলে বৈশাখ মাসের মধ্যে রোপণ করিলে ভাল হয়।

তাহার পর দুই তিন দিন অন্তর জল সেচন করিতে হয়। প্রতিদিন জল দিলে আলু পচিয়া যায়। অন্যদিকে ডাল পুঁতিয়া গাছ করিতে হইলে প্রতিদিন জলসেচন আবশ্যক।

প্রত্যেক গাছটি ২।৩ হাত অন্তর পুঁতিলে ভাল হয়। লতাগুলি ৩।৪ অঙ্গুলি মাটির মধ্যে পুঁতিয়া দিতে হয়। ২।৩ ফুট লম্বা লতা পুতিলেই চলে। তবে লতাগুলিকে পূর্ব্বদিকে হেলাইয়া পুঁতিলে ভাল হয়, তাহাতে গাছ শীঘ্র মাটিতে লাগিয়া যায়, এবং শীঘ্র শিকড় বাহির হয়।

লতাগুলি একটু বড় হইলে যাহাতে আগাছার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

কার্ত্তিক মাস হইতেই আলু তুলিয়া লইতে পারা যায়; তবে অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাস পর্য্যন্ত মাটিতে থাকিলে আলু পুষ্ট হয় এবং উহার জলীয় ভাগ কমিয়া যায়।

ইহা কাঁচাও খাইতে মন্দ নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য ও স্নিগ্ধকর, তবে কিছু গুরুপাক। সিদ্ধ করিয়া খাইলে সহজে হজম হয়।

শাঁক আলু

ইহা কাঁচা খাওয়াই ব্যবস্থা। এই জন্য অনেকে ইহাকে ফলের মধ্যে গণ্য করেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহা ফল নহে, লতার মূলে অন্যান্য আলুর মত জন্মিয়া থাকে। ইহার ছাল বা আবরণ শাদা এবং ভিতরের শাঁস বেশ শুভ্র। ইহার আকার অনেকটা শাঁকের মত, সেই জন্য ইহাকে শাঁক আলু বলে।

ইহার ডাক্তারী নাম—Pachyrrhizus Angulatus.

সচরাচর এদেশের ইংরাজেরা ইহাকে sweet potato বলিয়া থাকে।

বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রে মাদা করিয়া ইহার বীজ রোপণ করিতে হয়। প্রথমতঃ, ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কোপাইয়া ও ঢেলা ভাঙ্গিয়া লইয়া পরে মাদা করিলে ভাল হয়।

২।৩ হাত অন্তর এক একটি গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে গোময়-সারাদি দিয়া গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া তাহাতে একদিন জল সেচন করিয়া, পরদিন বীজ রোপণ করিতে হয়।

দোআঁস মাটিতে ইহা ভাল জন্মায় এবং মাটি যত আল্‌গা থাকে, ততই আলু বড় হয়। বীজ রোপণ করিয়া প্রত্যহ জল সেচন করিতে হয়, তবে চারা বাহির হইলে আবশ্যকমত জল সেচন করিবে এবং মধ্যে মধ্যে নিড়ান দিয়া মাটি আল্‌গা করিয়া দিতে হয় এবং বর্ষার জল পাইলে জলসেচনের আবশ্যকতা নাই।

শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে লতাগুলি শুকাইতে আরম্ভ হয়। তখন হইতে ইহা তুলিয়া লইতে পারা যায়। আবশ্যকমত তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট রাখিয়া দিলে পরবৎসর আর চাষের আবশ্যক হয় না, উহার মূল

হইতে আলু বড় হইয়া থাকে। তবে দুই বৎসরের অধিককাল রাখিলে উহা ছিবড়াযুক্ত হয় এবং আস্বাদও তেমন থাকে না। এই জন্য প্রতি বৎসর সমস্ত তুলিয়া লইয়া উহার মূল পুঁতিয়া চাষ করিলে ভাল হয়।

ইহা আকারে বেশ বড় হয়। কখন কখন ১০।১৫ সের পর্য্যন্ত ওজনে হয়। ইহা বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। খাইতে সুস্বাদু এবং পেটের হিতকর, তবে অধিক খাওয়া ভাল নয়।

আজকাল ডাক্তারেরা বলেন, ইহার রসে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং দেহে বল হয়। তজ্জন্য সাহেবেরাও ইহা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা কিন্তু ক্রমেই ইহার চাষ পরিত্যাগ করিতেছি। তাই বাজারে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি বা পাওয়া যায়, দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে।

আম্র

আম্রের মত সুস্বাদু ও উপাদেয় ফল এ জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তাই কবিগণ একবাক্যে বলিয়াছেন—

"দেবেষু ইন্দ্রঃ ফলেষু আম্রঃ"

অন্যদিকে দেখা যায় যে, আম্রের মত বহুরূপী ফলও আর নাই। কি বর্ণে, কি স্বাদে, কি সুগন্ধে, কি আকৃতিতে, প্রত্যেকটিই যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেগুলি ক্ষুদ্র, সেগুলি আমড়া অপেক্ষা বড় নহে; আবার যেগুলি সুবৃহৎ, তাহার ওজন ৫।৬ সের পর্য্যন্তও হয়। কোনটি লাল সিন্দূরের মত, কোনটি গোলাপের মত, কোনটি হরিত, কোনটি পীত, কোনটি বা নানাবর্ণে সুরঞ্জিত। স্বাদে কোনটি অমৃতোপম, কোনটি বা এত টক্ যে, মুখে করা যায় না, কোন কোনটি বা সৌরভে মন-প্রাণ আকুল করিয়া তুলে। এই জন্য দেখা যায়, এই ভারতে শত সহস্র জাতীয় আম্র জন্মে। তাই বোধ হয়, কোন কবি ব্যঙ্গ করিয়া আম্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"সবেমাত্র তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম।
কত কোটি তব নাম কে বলিবে হে আম?"

আবার শাস্ত্রকারগণের মতে—

"রসালবৃক্ষঃ পূর্ব্বস্মিন্ নৃণাং সম্পদ্প্রদস্তথা"

তাই ভাগবতকারের মতে যেদিন শ্রীকৃষ্ণদেবের আমন্ত্রণে দেবতাগণ দ্বারকাবতী নগরীতে আগমন করেন, তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন—

দদৃশুর্দ্বারিকাং রম্যামতীব সুমনোহরাম্
প্রফুল্লপুষ্পৈঃ পরমৈঃ সর্ব্বত্র সুরভীকৃতাম্।
তরুভির্নারিকেলানাং শোভিতাং শতকোটিভিঃ
চতুর্গুণৈর্গুবাকানাং যুক্তামাম্রমহীরুহৈঃ॥

অর্থাৎ তাঁহারা দেখিলেন, চারিদিকেই আম্রবৃক্ষের ছড়াছড়ি।

আবার যেদিন শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিবাহ করিয়া অতি সমারোহে অযোধ্যা-নগরীতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, অযোধ্যা নগরীর রাজপথ—

"সুবর্ণের পূর্ণকুম্ভে দিয়া আম্রসার"

সুসজ্জিত হইয়াছে।

আবার যেদিন শ্রীচৈতন্যদেব সাঙ্গোপাঙ্গসহ কাজীর দর্প চূর্ণ করিবার মানসে সংকীর্ত্তনের মহারোলে শ্রীনবদ্বীপকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করিয়াছিলেন সেই দিন নবদ্বীপবাসিগণ মহানন্দে নগরটিকে

"কদলীর বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে
পূর্ণঘট, ধান্য, দূর্ব্বা, দীপ, আম্রসারে"

সুসজ্জিত করিয়া সংকীর্ত্তনের আদর এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতি অচলা ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আবার ফাহীয়ন প্রমুখ চীনপরিব্রাজকগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং মনের আনন্দে বহু বর্ষকাল আম্রবারিকাকুঞ্জে দিনযাপন করিয়াছিলেন।

সুতরাং হিন্দুর নিকট আম্র কেবল রসনার তৃপ্তিকর নহে, ইহা সুখসম্পদ্ ও শান্তিপ্রদ।

এহেন আম্রবৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে Pharmacographia নামক গ্রন্থে এইরূপ এক অদ্ভুত গল্প লিখিত আছে।

সূর্য্যতনয়া সূর্যবাই পরমাসুন্দরী ছিলেন, এমন কি, তাঁহার সৌন্দর্য্যের জন্য অনেকানেক সুন্দরী ঈর্ষাপরায়ণা হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তখন সূর্য্যবাই পিতার নিকট অনুযোগ করেন; তাহার ফলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে একটি সুবর্ণ-পদ্মরূপে পরিণত করিয়া নিবিড় বনমধ্যে লুকাইয়া রাখেন।

দৈবচক্রে কোন এক রাজপুত্র বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ সুবর্ণ-পদ্ম দেখিয়া এত বিমোহিত হন যে, রাজপুত্র ঐ পদ্মটি লইয়া আপন সরোবরে অতি সমাদরে স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি রাজপুত্র আপন বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ঐ সরোবরতীরেই দিবস-যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাজপুত্রের এরূপ আচরণে বিরক্ত হইয়া দাসীগণ কর্ত্তৃক ঐ পদ্মটি অগ্নিদগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজপুত্র ঐ সুবর্ণ-পদ্মের অভাবে এত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যে, ঐ ভস্মরাশি লইয়া স্বহস্তে ঐ উদ্যানের মধ্যে সযত্নে প্রোথিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে একটি সুবর্ণের বেড়া দিয়া রাখেন!

কালক্রমে ঐ ভস্মরাশি হইতে এক অপূর্ব্ব বৃক্ষের উৎপত্তি হয় এবং যখন ঐ বৃক্ষ মুকুলিত হইল, সেই মুকুলের সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। অবশেষে ঐ বৃক্ষে যে প্রথম ফল সুপক্ক হয়, তাহার সৌরভে রাজোদ্যান স্বর্গীয় রূপে পরিণত হইল। ঐ ফলটি একদিন সহসা ভূমে পড়িয়া যায়, অমনি সে ফলটি হইতে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী আবির্ভূতা হইলেন। রাজপুত্র তাহার রূপে বিমোহিত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

তাহার পর হইতে ঐ বৃক্ষে যে-সকল ফল ফলিল, তাহা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফলরূপে পরিণত হয়। লোকে তাহাকে অম্র বা আম্র আখ্যা প্রদান

করিল—অর্থাৎ সেবার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। (অম+র=অম্—অর্থে সেবা)।

এই অদ্ভুত গল্পটি গ্রন্থকার কোথা হইতে প্রাপ্ত হন, তাহা লিখেন নাই। সুতরাং আমরাও এই গল্প সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিলাম মাত্র।

ফলে, গ্রন্থকারের মতে নারীকুলমধ্যে রাজকুলবধূ যেমন পরমা সুন্দরী বলিয়া কবিমাত্রেই বর্ণনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যে এই আম্রফল রাজার বা রাজপুত্রের সেবার উপযুক্ত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকারের মতে তদবধি সর্ব্বোৎকৃষ্ট আম্রের অপর নাম হইয়াছে—রাজাম্র বা সহকার।

"অসৌ সহকারোঽতিসৌরভঃ।"

বৈদ্যকগ্রন্থেও আমরা দেখিতে পাই—

রাজাম্রাঃ কোমলাঃ সর্ব্বে কট্বম্লাঃ পিত্তদাহদাঃ।
সুপক্কাঃ স্বাদুমধুরাঃ পুষ্টিবীর্য্যবলপ্রদাঃ॥

বিশেষতঃ, রাজাম্রবৃক্ষের পত্রকে দগ্ধ করিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা সমুদয় অতি সত্বর বিদূরিত হয় এবং কোনরূপ ফোস্কা হয় না। ডাক্তারী গ্রন্থেও লিখিত আছে—কাঁচা আম 'স্কার্ভি'রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।—(K. N. Khory—Part II)

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারের মতে কালক্রমে সেই আম্রবৃক্ষই জল, বায়ু ও মৃত্তিকাভেদে নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সহস্রাধিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং এই ভারত হইতে নানা স্থানে নীত হইয়া নানা প্রকার নাম ও গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

দেশভেদে আম্রের নামভেদ

সংস্কৃতে—আম্র, চূত, সহকার। বাঙ্গালায়—আম্র, আম, আঁব। হিন্দীতে—আম। মহারাষ্ট্রে—আম্বাফল। কর্ণাটে—মাবিনফল। তৈলঙ্গে—মাবিড়ি। গুজরাটে—আংবো। আসামে—আম। ফার্সিতে—আম্বা। আরবীতে—অম্বজ। সান্তালি ভাষায়—ফাগাতা—পচা। গাওরা—মড়িয়াম, আম। ইংরাজীতে—Mango. Latin ভাষায়—Mangifera Indica.

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই ভারতে নানা রঙ্গের আম্র দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে

এই বঙ্গদেশে

অনুপম, অমৃতভোগ, আতাই, আমীর-পছন্দ, আসমানতারা, জনার্দ্দন, অঙ্গবাহার, ইমামবক্স ইলাইদোনা, ইলাইত-পছন্দ, উমদা খস্, ঋচবাগ, কালীপাহাড়, কাকাতুয়া, কাৎশুনিয়া, কালুয়া, কাকটিয়া, করঞ্চ, কর্কবিয়া, কালমেঘ, কুৎরকখাস্, কাঞ্চনখাস্, কার্ত্তিক, খাজা গুলবন্দ, গুর্জ্জিত, গোলাপজামন, গোলাপখাস্, গোবিস, গোমর্দ্দন, গোলাবী, গঙ্গাপ্রসাদ চাপবী, চরকখাস, চুসনি, চম্প, চিনিচম্পা, টিয়রকাটা, টেটোমুখি, তরমুজ, তারা-পছন্দ, তোতামুখী, তন্দখাস্, তরু-পছন্দ, দাদ্‌মানুস্ু, দাউদভোগ, দয়ালসিং, নবাব-পছন্দ, নয়নীহাল, পিয়ারাফুলি, পথবলিয়া, পিমিগ্রখাস্, পাটনা, পাপয়া, ফার্দ্দস-পছন্দ, বেগম-পছন্দ, বাতাবী, বাতাসা বারমেসে, বাদসা-পছন্দ, কানু-পছন্দ, বিমলী, বেল, ভবানী চউরস, ভাইয়া, ভাতুয়া মুন্সিওলা, মতিয়া, মর্ত্তবান, মিয়া-পছন্দ, মজলিস, মোসাহেব, মোলামজান, মোহনভোগ, মিতি, মালিক-পছন্দ, মদকুপিয়া, মধু, মধুবিলাস, মাদ্রাজী, মেলো, মণিয়াখাস, মৌলনাবী, মির্জ্জা-পছন্দ, মহারাজা-পছন্দ, মিথুরা, মিঠা, মদনমোহন, রাণী-পছন্দ, রহিম-পছন্দ, রাহুপোটি, রাঢ়ী, রামরতনখাস,

রতনকেয়া, রামগতিখাস, লালদর্ষ্টা, লেরুয়া, লেঙড়া, শ্রীদহন, শ্রাবণীয়', শিয়াদর, শক্ত, খসিয়া, সিপিয়া, সাগা, সাদেক-পছন্দ, সিঁদুরিয়া, সজ্জী, সপ্তালু, সোয়ারবোম্বাই, সুলতান-পছন্দ, সাহতত, সরায়া, হীরালাল, হোসেনবক্স, হৌজে-কারে, হালুয়', ডুলডুল।

মহীশূরী আম

আমিনা, বাদামী, চিতুর, চিতাবাই, গোলকোরি, জিনিমাত, কারিবাই, মজ্জীবাই, পিচকাই, নিমাইগোরা, কোস্তা, দিজোয়া, ফার্ণাদিয়া, ফ্রেড্রিলো, তিমেরেতা।

মাদ্রাজী আম

চিতোঁর, দিল-পছন্দ, ইয়াদ, গোরা, হাথুদ, মালগোব, আফিস-পছন্দ, ওয়াদা, মাভুপিটর, পুটু, রেপাসবেরি, ওয়ালজ-পছন্দ।

বোম্বাই আম

অলফন্সো (দুই রকম), আমিরগোলা, কাওয়াসজিপিটল, হিমসাগর, লাঙ্গবটল, মাস্ত গোয়ান, পিয়ারি, সালেম-পছন্দ।

অন্যান্যবিধ

মোহনভোগ, নাকরা-দাসী, ফুলিয়া, পোল্লা রাজভোগ, রংবাহার, সফেদা শরৎভোগ, সোনা, সিন্দুরিয়া, সীতাভোগ, সজ্জী, তেফিরিঙ্গী, তিসিফুল।

দ্বারভাঙ্গা আম

সজে, সফেদা, চাপরা, নাজির-পছন্দ, কিষণভোগ, দর্মা, লেডুয়া, খবুজা, মহারাজ-পছন্দ, সাপছন্দ ইত্যাদি।

এইরূপ আরও যে কত শত জাতীয় নাম এই ভারতের নানা স্থানে আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা কোথাও পাওয়া যায় না। যাহা হউক, বহু চেষ্টা করিয়া যতগুলি নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত করা গেল।

তাহার পর উক্ত সুমিষ্ট ফলগুলির গুণও নানা প্রকার। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে উহার সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মোটামুটি কয়েকটি বিষয় উদ্ধৃত করা গেল।

শুদ্ধ যে আম্রফলের গুণ নানাবিধ, তাহা নহে। ইহার পুষ্প (অর্থাৎ বোল), পত্র, বীজ ও ত্বক্ সকলগুলিই নানা গুণবিশিষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

তাই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন। ইহা—

"বল, বর্ণ, রক্ত, মাংস, শুক্র বৃদ্ধি করে
কিছু শ্লেষ্মাকর, কিন্তু বায়ু পিত্ত হরে।
কচি আম ঝোল খেলে দেহ ঠাণ্ডা হয়
সিদ্ধ আম, স্নিগ্ধগুণে মেদ করে ক্ষয়।
কেশীচূর্ণ উপকারী বমি অতিসারে
বোঁটার আটার তেলে চুলকণা সারে।
পাতার রসেতে নাশে রক্ত আমাশয়—
ছাল বেটে লেপ দিলে ব্যথা ভাল হয়।"

আবার সুশ্রুতমতে—

হৃদ্যং বর্ণকরং রুচ্যং রক্তমাংসবলপ্রদম্।
কষায়াম্লরসং স্বাদু বাতঘ্নং বৃংহণং গুরু।
পিত্তাবিরোধি সম্পক্কমাম্রং শুক্রবিবর্দ্ধনম্॥

এবং রাজনির্ঘণ্টুমতে—

বালং পিত্তানিলকফকরং তদবদ্ধাস্থিতাদৃক্,
পক্কং দোষত্রিতয়শমনং স্বাদুপুষ্টিং গুরুঞ্চ।
ধত্তে ধাতুপ্রচয়মধিকং তর্পণং কান্তিকারী,
খ্যাতং তৃষ্ণাশ্রম-শ্রমকৃতৌ চূতজাতং ফলং স্যাৎ॥

অন্যান্য বৈদ্যকগণের মতে আম্রের গুণাবলী

আমের পুষ্পকে—বোল বা বৌল বলে। তাহার গুণ—

"আম্রপুষ্পমতীসার-কফপিত্তপ্রমেহনুৎ।
অসৃগ্‌দুষ্টিহরং শীতং রুচিকৃদ্‌ গ্রাহি বাতজম্‌॥"

অর্থাৎ ইহা অতিসার, কফ, পিত্ত, প্রমেহ ও রক্তদোষনাশক, শীত-বীর্য্য, রুচিকারক, ধারক এবং বায়ুবর্দ্ধক।

কচি আমের গুণ—

"আম্রং বালং কষায়াম্লং রুচ্যং মারুতপিত্তকৃৎ।"

অর্থাৎ কচি আম—কষায়, অম্লরস, রুচিকারক এবং বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক।
কাঁচা আমের গুণ—

"তরুণস্তু তদত্যম্লং রুক্ষং দোষত্রয়াস্রকৃৎ।"

অর্থাৎ কাঁচা আম অত্যন্ত অম্লরসবিশিষ্ট, (তবে একজাতীয় কাঁচা-মিঠা আম আছে, তাহাতে অম্লরস নাই বলিলেও চলে) রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্তদূষক। এই নিমিত্ত বৈদ্যকগণের মতে কাঁচা আম্র অভক্ষ্য। কিন্তু অল্প সরিষা ফোড়ন দিয়া কাঁচা আমের ঝোল অতি উপাদেয়, স্নিগ্ধ ও রুচিকারক তাই আমরা ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "সংসার" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াও "কাঁচা আমের ঝোল" ভুলিতে না পারিয়া গায়কের মুখে ইহার শত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, কাঁচা আমকে তিল-তৈল ও কালকেসুন্দের রসে, লৌহপাত্রমধ্যে রাখিয়া, ৪।৫ মাসকাল মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলে যে তৈল উৎপন্ন হয়, তাহা অল্প মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে **পাকা চুল কালো হয়,** এমন কি, হেয়ার-ডাইকেও পরাস্ত করে। কারণ, হেয়ার-ডাইয়ের গুণ অল্পকালস্থায়ী, আর এই তৈলের গুণ অদ্ভুত ও চিরস্থায়ী।

হকিমীমতে

কাঁচা আম ভক্ষণ করিলে পাথরীরোগ আরোগ্য হয়। তবে গর্ভিণী স্ত্রীলোকের পক্ষে কাঁচা আম অভক্ষ্য, কারণ, ইহাতে অনেক সময়ে গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

কাঁচা আমের রূপান্তর

কাঁচা আম হইতে নানাপ্রকার উপাদেয় আহার্য্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে আমাদের দেশে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির বহুল প্রচার আছে।

(১) আমচুর—কাঁচা আম খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তনপূর্ব্বক ইহাতে লঙ্কা, পাঁচ-ফোড়ন, হলুদ প্রভৃতি দিয়া মাখিয়া অল্পকাল রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। পরে ইহাতে ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়। মাস দুই পরে যে আমচুর প্রস্তুত হয়, তাহাতে নানা গুণ দেখা যায়।

আম্রমামং ত্বচা হীনমাতপেঽতিবিশোষিতম্
অম্লং স্বাদুকষায়ং স্যাদ্ভেদনং কফবাতজিৎ।"

অর্থাৎ ইহা অম্লমধুর, কষায়রস, ভেদক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

(২) আমশী—কাঁচা আম খণ্ড খণ্ড করিয়া পরিস্কৃত জলে ধৌত করিয়া লইবে। পরে উহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লবণ ও হলুদ মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়।

ইহার গুণ আমচুরের মত।

দাইলে আমশী দিয়া রন্ধন করিলে ইহার স্বাদ অতি রুচিকর হয়। কেহ কেহ টক রন্ধন করিবার সময় তেঁতুলের পরিবর্ত্তে আমশী ব্যবহার করে।

মহারাষ্ট্রীয়েরা অতিশয় আমশীভক্ত, ইহাকে উহারা আঁবোলী বলে। তাহাদের অধিকাংশ ব্যঞ্জনে আঁবোলী ব্যবহৃত হয়। এমন কি, ইহা তাহাদের দৈনিক আহার্য্যমধ্যে গণ্য। আবার তৎসঙ্গে লঙ্কার ভাগ এত

অধিক মাত্রায় থাকে যে, আমাদের পক্ষে তেমন সুভক্ষ্য বলিয়া বোধ করি না। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে "আম্র-পেশী" বলে।

(৩) আমছেঁচা—কাঁচা আমকে ছেঁচিয়া উহাতে লবণ ও হলুদ মাখিয়া তৎপরে পাঁচ-ফোড়ন দিয়া ভাজিয়া লইতে হয়; এবং ইক্ষুগুড়ে ভিজাইয়া রাখিলে অতি উত্তম আমছেঁচা প্রস্তুত হয়।

(৪) আমের মোরব্বা—কাঁচা আমের ছাল ও কোশী বাদ দিয়া প্রত্যেকটি চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া অল্পসময়ের জন্য চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে ঐগুলি একখণ্ড পরিষ্কৃত কাপড়ের উপর রাখিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া, গরম গরম চিনির রসে ফেলিয়া দিয়া, অল্প অল্প উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইহা যেমন রুচিকর, তেমনি অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারী।

আমের মোরব্বাগুলিকে কাচের বড় জারের মধ্যে রাখিয়া দিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। তবে মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিলে ভাল হয়।

(৫) আম্রলেহ বা আমের চাট্নী—ইহা নানাপ্রকারের প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে হিন্দুস্থানীরা "রায়তে" বলে। আমরা যাহাকে রায়তা বলি, তাহা নহে। তাহারা সর্ব্বপ্রথম কাঁচা আম ভাজিয়া লয়, পরে উহাতে লবণ, চিনি, মরিচ ও ভাজা হিং মিশাইয়া লয়। ইহা অতি সুস্বাদু ও রুচিকর। আমরা লুচি বা রুটির সহিত যেমন নানাপ্রকার তরকারি ব্যবহার করি, হিন্দুস্থানীরা কেবলমাত্র এই চাট্নীসহকারে সমুদয় রুটি বা লুচি আনন্দসহকারে ভোজন করিয়া থাকে। অন্য কোন ব্যঞ্জনের আবশ্যক বোধ করে না।

(৬) আমতেল—কাঁচা আমের কোশীগুলি ফেলিয়া দিয়া উহার মধ্যে লঙ্কা, পাঁচ-ফোড়ন এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে হিং পূরিয়া, তদুপরি হলুদ ও লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে অল্প অল্প শুকাইয়া লইতে হয়। পরে উৎকৃষ্ট সরিষার তৈলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে অল্পদিন পরে উত্তম আমতেল প্রস্তুত হয়।

ইহার গুণ—ঈষৎ তিক্ত, মধুররস, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক এবং বায়ু ও কফের শান্তিকর, রুক্ষ ও সুগন্ধবিশিষ্ট।

(৭) আমের খোসা—কেহ কেহ কাঁচা আমের খোসাগুলিকে ফেলিয়া না দিয়া উপরি-উক্ত উপায়ে উহার উৎকৃষ্ট চাট্‌নী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। প্রথমে খোসাগুলি পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া, উহার সহিত সিদ্ধ ছোলা মিশাইয়া, কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলুদ, লঙ্কা ও লবণ মিশাইয়া, কিছুদিন উৎকৃষ্ট সর্ষপ-তৈলে ভিজাইয়া রাখেন।

ইহার গুণ—আম্রলেহের মত।

(৮) কাসুন্দী—"খোসা ছাড়াইয়া আম ঢেঁকিতে কুটিয়া
সরিষা হরিদ্রা আর নুন মাখাইয়া।
নূতন হাঁড়িতে করি যত্নেতে রাখিবে
মাঝে মাঝে সরাখানি খুলে রৌদ্রে দিবে।

(৯) আম-আচার—বাঙ্গালী বলে—
আমাম্রফলং পিষ্টং রাজিকা-লবণান্বিতম্।
ভৃষ্টহিঙ্গুযুতং পূতং ঘোলিতং জালিরুচ্যতে॥
জালির্হরতি জিহ্বায়াঃ কুণ্ঠত্বং কণ্ঠশোধিনী।
মন্দং মন্দস্তু পীতা সা রোচিনী বহ্নিবোধনী॥

ইহাতে জিহ্বার কুণ্ঠত্ব নাশ করে ও কণ্ঠশোধন করে।

সুপক্ক আম্রের গুণাবলী

পক্ক-আম্র—দুই প্রকার—

(১) গাছপাকা (২) কৃত্রিম পক্ক

চরক বলেন—"পক্কমাম্রং জয়েদ্বায়ুং মাংসশুক্রবলপ্রদম্"

অর্থাৎ সুপক্ক আম্র বায়ু দমন করে, বল, শুক্র ও মাংস বৃদ্ধি করে।

কিন্তু তিনি গাছপাকা ও কৃত্রিম পাকা আমের কোন প্রভেদ দেখান নাই।

কিন্তু ভাবপ্রকাশে আছে—

"তদেব বৃক্ষসম্পক্বং গুরুবাতহরং পরম্।
মধুরাম্লরসং কিঞ্চিদ্ভবেৎ পিত্তপ্রকোপনম্॥"

অর্থাৎ গাছপাকা আম গুরুপাক, বায়ুনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তকর এবং মধুরাম্লরসবিশিষ্ট।

আবার কৃত্রিম পাকা আমের সম্বন্ধে বলেন—

"আম্রং কৃত্রিমপক্কঞ্চ তদ্ভবেৎ পিত্তনাশনম্।
রসস্যাম্লস্য হীনত্বান্মাধুর্য্যাচ্চ বিশেষতঃ॥"

অর্থাৎ আম্র পাড়িয়া কৃত্রিম উপায়ে পাকাইলে তাহাতে অম্লরস থাকে না এবং সুমিষ্ট হয়, তজ্জন্য ইহা ভোজন করিলে যেমন সুমিষ্ট হয়, তেমনি উপকারী হয়, বিশেষতঃ ইহাতে পিত্ত নাশ করে।

এবং পর্য্যুষিত আম্র অর্থাৎ সুপক্ক আম্র বাসী হইলে আরও ভাল ও উপকারী হয়।

উষিতং তৎপরং রুচ্যং বল্যং বীর্য্যকরং লঘু।
শীতলং শীঘ্রপাকি স্যাদ্বাতপিত্তহরং সরম্॥

অর্থাৎ ইহা রুচিকারক, বলপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধক, লঘু, শীতবীর্য্য, শীঘ্রপাকী, বাতপিত্তনাশক ও সারক।

এবং সুপক্ক আম্রের রস নিংড়াইয়া খাইলে আরো অধিক উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু কিঞ্চিৎ কফবর্দ্ধক।

তদ্রসো গালিতো বল্যো গুরুর্বাতহরঃ সরঃ।
অহৃদ্যস্তর্পণোঽতীব বৃংহণঃ কফবর্দ্ধনঃ।

ইহা বলকারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, সারক, অহৃদ্য তৃপ্তিজনক অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং কফবর্দ্ধক।

আম্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিলে যে গুণ প্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে লিখিত আছে—

তস্য খণ্ডং গুরুপরং রোচনং চিরপাকি চ।
মধুরং বৃংহণং বল্যং শীতলং বাতনাশনম্॥

ইহা গুরু, রুচিকর, চিরপাকী (বিলম্বে পাক হয়), মধুররস, শরীরের উপচয়কারক, বলকর, শীতবীর্য্য ও বায়ুনাশক হয়।

দুগ্ধে আম্রের রস সংযুক্ত করিয়া ভোজন করিলে যে যে গুণ লাভ করা যায়, যথা—

বৃষ্যং বর্ণকরং স্বাদু দুগ্ধাম্রং গুরু শীতলম্।
বাতপিত্তহরং রুচ্যং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্॥

ইহা শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদ, মধুররস, গুরু, শীতবীর্য্য, বায়ুপিত্তনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক এবং বলবর্দ্ধক।

ইতঃপূর্ব্বে পাকা আমের যে-সকল গুণ বলা হইল, তাহা সুমিষ্ট—সুপক্ক আম্র সম্বন্ধে। কিন্তু টক্ আম-ভোজনে বিষম অপকার হয়।

আবার ক্ষুদ্রাম্র সম্বন্ধে ধন্বন্তরির নিঘণ্টুতে আছে—

কোশাম্রোঽম্লঃ কটুঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণশ্চানলাপহঃ।
কফপিত্তকরো রুচ্যঃ কুষ্ঠঘ্নো রক্তশোধনঃ॥

ইহা অম্ল হইলেও বীর্য্যবৃদ্ধিকর, বায়ু নাশ করে, তবে কিঞ্চিৎ কফ ও পিত্তকর, রুচিকারক, কুষ্ঠ আরোগ্যকর এবং রক্ত শোধন করে।

আজকাল অনেকেই বড় বড় আম না হইলে খাইতে চান না। কিন্তু দেখা গেল যে, আম্র ক্ষুদ্র ও টকরসবিশিষ্ট হইলেও ইহাতে বিশেষ গুণ আছে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়, রক্তদোষ নষ্ট করে। সুতরাং ধন্বন্তরি-নিঘণ্টুর মতে আম্র ক্ষুদ্র বলিয়া পরিহার করিবে না।

আম্রপানা

সুপক্ক আমের রসে দধি, চিনি ও কুঙ্কুম (জাফরাণ) মিশ্রিত করিয়া যে সরবৎ প্রস্তুত হয়, তাহা সেবনে তৃষ্ণাশান্তি নিবারণ হয় এবং বায়ুপিত্ত নাশ করে, আহারে রুচি করে এবং দেহের বল বৃদ্ধি করে।

বৈদ্যকগ্রন্থে "আম্রফলপানকম্" সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"আম্রমামজলে স্বিন্নং মর্দ্দিতং দৃঢ়পাণিনা।
সিতাশীতাম্বুসংযুক্তং কর্পূরমরিচান্বিতম্॥

প্রপানকমিদং শ্রেষ্ঠং ভীমসেনেন নির্ম্মিতম্।
সদ্যোরুচিকরং বল্যং শীঘ্রমিন্দ্রিয়তর্পণম্॥"

অর্থাৎ কাঁচা আম জলে সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে চটকাইয়া শীতল জলে গুলিতে হইবে, পরে তাহাতে চিনি, কর্পূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইলে যে পানা প্রস্তুত হয়, তাহা সদ্য খাইলে বলবর্দ্ধক এবং রুচিকর ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর হইয়া থাকে।

আমে এত গুণ আছে সত্য, তা বলিয়া অধিক মাত্রায় ভোজনে বিশেষ অপকারও হয়। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্। অমৃতও বোধ হয় অধিক মাত্রায় সেবনে অপকারের সম্ভাবনা আছে।

তাই বৈদ্যকগণ বলেন—

মন্দানলত্বং বিষমজ্বরঞ্চ রক্তাময়ং বদ্ধগুদোদরঞ্চ।
আম্রাতিযোগো নয়নাময়ং বা করোতি তস্মাদতি তানি নাদ্যাৎ॥

অর্থাৎ অধিক পরিমাণে আম্র ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তাময়ষ্টি, বদ্ধোদর ও চক্ষুরোগ উৎপাদন করে। অতএব আম্র অধিক মাত্রায় কখনও খাইবে না।

তৎপরেই কিন্তু ভাবপ্রকাশে আছে—

এতদম্লাম্রবিষয়ং মধুরাম্রপরং ন তু।
মধুরস্য পরং নেত্রহিতত্বাদ্যা গুণাঃ যতঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বে যে নিষেধবাক্য বলা হইয়াছে, তাহা কেবল টক্ (অর্থাৎ অম্লরসযুক্ত) আম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে জানিবে। কারণ, মধুররসসংযুক্ত আম্রে চক্ষুর হিতকারিত্বাদি গুণ আছে।

তবে যদি আম্র অধিক মাত্রায় খান, তবে অজীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। তখন উপায় কি, তাহারও ব্যবস্থা করা আছে।

শুণ্ঠ্যম্ভসোঽনুপানং স্যাদাম্রাণামতিভক্ষণে।
জীরকং বা প্রযোক্তব্যং সহ সৌবর্চ্চলেন চ॥

অর্থাৎ অজীর্ণ হইলে শুন্ঠির ক্বাথ পান করিবেন অথবা জীরার সহিত লবণ সেবন করিবেন।

আমসত্ত্ব

কবিরাজগণের মতে আমসত্ত্বেও অনেক গুণ আছে। সুতরাং নিম্নলিখিত উপায়ে আমসত্ত্ব প্রস্তুত করিবে।

পক্কস্য সহকারস্য পটে বিস্তারিতো রসঃ।
ঘর্ম্মশুষ্কো মুহূর্দত্ত আম্রাবর্ত্ত ইতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ সুপক্ক সুমিষ্ট আমের রস বস্ত্রখণ্ডে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইয়া কোন পটে পাতলা করিয়া লেপন করিবে এবং রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। উহা শুষ্ক হইলে পুনরায় ঐরূপে লেপন করিবে এবং রৌদ্রে শুকাইবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ লেপনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহাকেই আম্রাবর্ত্ত বা আমসত্ত্ব বলে।

আমসত্ত্বের গুণাবলী

আম্রাবর্ত্তস্তৃষাছর্দ্দি-বাতপিত্তহরঃ সরঃ।

রুচ্যঃ সূর্য্যাংশুভিঃ পাকাল্লঘুশ্চ স হি কীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ আমসত্ত্ব তৃষ্ণা, বমি, বায়ু, পিত্ত নাশ করে এবং ইহা সারক ও রুচিকর। রৌদ্রে পাক হওয়ায় ইহা লঘু হইয়া থাকে।

আজকাল মাদ্রাজী আমসত্ত্বের আদর কলিকাতায় বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহা সুমিষ্ট আম্রে প্রস্তুত হয় না, কেবল অধিক মাত্রায় চিনি দিয়া কৃত্রিম উপায়ে সুমিষ্ট করিয়া লয়, তাহার জন্য মাদ্রাজী আমসত্ত্বে পেট গরম করে।

আম্রবীজম্

আম্রবীজং কষায়ং স্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনম্।

ঈষদম্লঞ্চ মধুরং তথা হৃদয়দাহনুৎ॥

ইহা ঈষৎ অম্লসংযুক্ত, কষায়মধুররসবিশিষ্ট এবং ইহাতে বমি, অতিসার, হৃদয়ের দাহ নাশ করে। তবে অধিক মাত্রায় সেবন করিবে না।

মাত্রা—৵০ দুই আনা মাত্র।

ইহাকে হিন্দীভাষায় কোবলিয়া বলে।

নবপল্লবম্

আম্রস্য পল্লবং রুচ্যং কফপিত্তবিনাশনম্।

অর্থাৎ কচি কচি আম্রের পল্লব রুচিকর এবং কফ ও পিত্তনাশক।

আম্রবৃক্ষের ছাল

নেবা হইলে—আম্রবৃক্ষের ছালে কিঞ্চিন্মাত্র চূণ লাগাইয়া প্রতিদিন ২।৩ বার করিয়া উভয় হস্তে মর্দ্দন করিলে অতি সত্বর নেবারোগ আরোগ্য হয়। প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বেই ২।৩ বার ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

তবে প্রাতে উঠিয়া স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া অতি শুদ্ধাচারে পূর্ব্বোক্ত বিধি পালন করা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে পেট ও শরীর ঠাণ্ডা থাকে, তাহার ব্যবস্থা করাও বিশেষ কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি আমার পরিচিত কোন এক ব্যক্তির নেবা হইয়াছিল। তিনি অনেক ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন উপকার পান নাই। অবশেষে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে এক সপ্তাহমধ্যে আরোগ্যলাভ করেন।

ঔষধের ব্যবস্থা

(১) পশ্চিম প্রদেশে যখন "লু" চলে—সেই সময় কাঁচা আম পোড়াইয়া তাহার ক্বাথ গাত্রে লেপন করিয়া তদ্দেশবাসিগণ গাত্রজ্বালা নিবারণ করে এবং মধ্যে মধ্যে অল্পপরিমাণে উহা সেবনও করে। তাঁহারা বলেন, রৌদ্রলাগা বা লু-লাগার ইহাই একমাত্র মহৌষধ।

(২) আমগাছে একপ্রকার সাদা সাদা চটা হয়, তাহাকে লোকে "কান-চটকা" বলে। সরিষার তৈলের সহিত উহা ভাজিয়া ছেলেদের "কান-চটায়" দিলে অবিলম্বে আরোগ্য হয়।

(৩) রক্তাতিসারে—আম্রত্বক্ বিশেষ উপকারী। আমের ছাল ছাগী-দুগ্ধে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তাতিসারের রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(৪) প্লীহায়—সুমিষ্ট সুপক্ক আমের রস মধুর সহিত প্লীহারোগীকে পান করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

"অতিসারে—

আম্রার্জ্জুনত্বচঃ পীতাঃ ক্ষীরেণ মধ্বাঢ্যাঃ পৃথক্ শোণিতনাশনাঃ।

প্লীহারোগে—প্লীহব্যুপরমো যোগঃ পক্কাম্ররসোঽথবা সমধুঃ।

ইতি চক্রদত্তঃ

(৫) চরকের মতে—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে আমের কুশির (আঁটির শাঁস) রসের নস্য লইবে এবং পিত্তজ বমনে আম ও জামের পাতার ক্বাথ শীতল করিয়া মধুসহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(৬) ভাবপ্রকাশ মতে—"আমামাম্রফলং মৎস্যে"

অর্থাৎ মৎস্যভক্ষণে অজীর্ণ হইলে—কাঁচা আমে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মাংসভক্ষণের অজীর্ণে আম্রের অস্থি অর্থাৎ আঁটির শাঁস সেবন করিলে আরোগ্য হয়।

"তদ্বীজং পিশিতে হিতম্"।

(৭) বঙ্গসেনে আছে—আমের কচি কচি পাতা এবং কাঁচা কয়েতবেলের শাঁস সমান মাত্রায় লইয়া একত্র পেষণ করিবে, পরে তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে পক্কাতিসার আরোগ্য হয়।

নবচূতস্য পর্ণানি কপিত্থফলমেব চ।
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন পক্কাতিসারশান্তয়ে॥"

এবং বালকের মুখপাকে অর্থাৎ মুখবিবরে ক্ষত হইলে সারবান্ আম্রকাষ্ঠচূর্ণ ও গৈরিক এবং রসাঞ্জন সমান ওজনে লইয়া মিশ্রিত করিয়া মধুসহ লেপন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

মুখপাকে তু বালানাং আম্রসারময়ো রজঃ।
গৈরিকং ক্ষৌদ্রসংযুক্তং ভেষজং সরসাঞ্জনম্॥

এবং শোথরোগে আম্রমূলত্বক্ উপকারী।

ইহাতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে—

আম্রমূলত্বক্ ও পুনর্নবাপত্র প্রত্যেকটি সওয়া-ছয় সের করিয়া লইবে এবং বেশ করিয়া কুটিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের (অর্থাৎ সিকি) অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। ঐ ক্বাথ সহ ৪ সের

মূর্চ্ছিত ঘৃত পাক করিবে। পরে ঐ ঘৃত সেবন করিলে শোথরোগে বিশেষ উপকার হইবে।

R. N. Khory's Materia Medica of India নামক গ্রন্থে আছে—

The bark is astringent anthelmintic and used in nasal catarrh and for lumbrici. As an astringent it is given in diarrhoea, also to check haemorrhages from the nose, stomatch, intestines, uterus and lungs. It also checks profuse mucopurulent discharges as leucorrhoea, gonorrhoea etc.

আম্রত্বক্ কষায় বলিয়া ইহা অতিসার এবং নাসিকা, পাকস্থলী, অন্ত্র, গর্ভাশয় ও ফুসফুস্ হইতে রক্তস্রাব কিম্বা প্রদর ও প্রমেহের শ্লেষ্মস্রাব বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত করা যায়।

তিনি আরও বলেন—The ashes of the leaves are applied to burns and scalds. Tender leaves dried and made into a powder are used in diabetes.

শরীরের দগ্ধস্থানে—আম্রপত্র ভস্ম করিয়া প্রলেপ দেওয়া হয় এব কচি কচি আম্রপত্র শুষ্ক করিয়া চূর্ণকরতঃ ডায়েবিটিস্‌রোগে ব্যবহার করা হয়।

ডাক্তারী মতে—আম্রফলে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জল, অবশিষ্টের অর্দ্ধভাগ অম্লজানযুক্ত পদার্থ, ৬।৭ ভাগ চিনি এবং অবশিষ্ট লবণ ক্ষার অম্লময় পদার্থ, তাঁহাদের মতে ইহা বিশেষ পুষ্টিকর না হইলেও অল্পপরিমাণে ভোজন করিলে শরীরের হিতকর। তবে "In the morning it is gold in the evening silver and at night it is lead."

প্রভাতে স্বফলং দত্তে মধ্যাহ্নে চ ফলপ্রদম্।
নিশায়াং বিষবৎ জ্ঞেয়ং গুণমেতৎ ফলস্য চ॥

আমের চাষ

ভারতের সর্ব্বত্রই আমগাছ জন্মিয়া থাকে। তবে সচরাচর জল, হাওয়া ও মৃত্তিকার তারতম্যতা হেতু প্রত্যেক প্রদেশের আম্রই কি আকার, কি স্বাদ ও কি বর্ণ এবং কি সৌগন্ধ, প্রত্যেক বিষয়েই বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তবে এক স্থানের আম্রবৃক্ষের চারা বা কলম অন্য কোন প্রদেশে লইয়া রোপণ করিলে প্রায়ই পূর্ব্বোক্ত প্রদেশের গুণাদি প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ মৃত্তিকায় যথোপযুক্ত সারাদি প্রদান করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। তথাপি যে প্রদেশের যে বিশেষত্ব আছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা সহজ নহে।

তাই আমরা দেখিতে পাই যে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আম্রগুলির যেরূপ সুস্বাদ ও সুগন্ধ সহজে পাওয়া যায়, তাহা এই বঙ্গদেশে দুর্লভ। তাহার প্রধান কারণ মৃত্তিকা ও বৃষ্টির জল। বঙ্গদেশের মাটি অধিকাংশ স্থানে এঁটেল মাটি, তাহার উপর বৃষ্টিও অধিক পরিমাণে হওয়ায় মৃত্তিকা সেরূপ শুকাইতে পারে না; সততই সেঁতাল থাকে। আর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মাটি দোআঁশলা এবং বৃষ্টিও অধিক নাই; সুতরাং মৃত্তিকা প্রায়ই শুষ্কাবস্থায় থাকে। বৃক্ষের গোড়ায় জল বসিতে পায় না।

তবে বঙ্গদেশের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় নানাবিধ উৎকৃষ্ট জাতীয় আম জন্মে। তাহার প্রধান কারণ, একসময়ে মুর্শিদাবাদই মুসলমান বাদশাগণের রাজধানী ছিল। সেই সময়ে নবাবগণ অনেক অর্থব্যয় করিয়া নানা প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় আমের চারা ও কলম আনাইয়া বহু ব্যয় করিয়া, যথোপযুক্ত মৃত্তিকায় চাষ করাইয়া গিয়াছিলেন। তাহার ফলে মুর্শিদাবাদে এখনও পর্য্যন্ত সুন্দর সুন্দর আম পাওয়া যায়। ঐ সকল আমগুলির নামও মুসলমানী যথা—বাদশা-পছন্দ, বেগম-পছন্দ, কুৎরকখান, ইমামবক্স ইত্যাদি।

তাহার উপর এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে কোয়াসা, ঝড় ও শিলাবৃষ্টি প্রভৃতির যেমন উৎপাত, তেমন আর কোথাও নাই। আম্রবৃক্ষ মুকুলিত হইতে-না-হইতেই এমন বিষম কোয়াসা ও শিলাবৃষ্টি হয় যে, প্রায়ই আমের মুকুলগুলি নষ্ট হইয়া যায়। আবার যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও ঝড়ে অপক্কাবস্থায় ঝরিয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন এ দেশে হাওয়া সদাই জলো থাকায় নানা প্রকার কীটের উৎপাত হয়। বিশেষতঃ, ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে তেমন উৎকৃষ্ট জাতীয় আম জন্মে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যদিকে দ্বারবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি স্থানে দেখুন, কি সুন্দর সুন্দর উৎকৃষ্ট জাতীয় আমের ছড়াছড়ি। ফলেও প্রচুর পরিমাণে। এমন কি, ফলের প্রাচুর্য্যবশতঃ সময়ে সময়ে বৃক্ষের পাতা পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না।

বোম্বাই, গোয়ালিয়ার প্রভৃতি প্রদেশের মৃত্তিকা ও জলহাওয়া আম্র-বৃক্ষের অনুকূল, সুতরাং সেখানকার আমও উৎকৃষ্ট।

অন্যদিকে এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে যে কেবল পোকায় গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা নহে। ফল পাকিতে-না-পাকিতে ফলের মধ্যে আপনা-আপনি এমন পোকা জন্মায় যে, ফলের সমস্ত শাঁসটুকু নষ্ট করিয়া ফেলে; সুতরাং সেই সমুদয় ফল অভক্ষ্য হইয়া উঠে।

আমার পরম আত্মীয় স্বর্গীয় রায় শশিভূষণ দত্তবাহাদুর যখন চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তখন রঙ্গমতী নগরের নূতন নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছিল। রায়বাহাদুর মনে করিলেন যে, ঐ সকল রাজপথের দুই ধারে অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ না করিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র ও কাঁঠালবৃক্ষ রোপণ করিলে— একদিকে যেমন পথের শোভা বৃদ্ধি করিবে—অন্যদিকে তদ্দেশ-বাসিগণ অনায়াসে উত্তম উত্তম আম-কাঁঠাল খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতে

পারিবে। এই আশায় বুক বাঁধিয়া বোম্বাই, দ্বারবঙ্গ, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে অতি উত্তম উত্তম আমবৃক্ষের কলম বহু অর্থব্যয় করিয়া ও বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মনের আনন্দে ৪।৫ সহস্র আম ও কাঁঠাল-বৃক্ষের চারাগুলি রাজপথের দুই ধারে রোপণ করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে গাছগুলি বড় হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু হায়! যখন আম ফলিল, তখন দেখা গেল, আমগুলির মধ্যে এমন বড় বড় পোকা যে, কোন ফলই মুখে করিবার জো নাই। এমন কি, কোন কোন ফলে একটু শাঁস পর্য্যন্ত পাওয়াও দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তখন তিনি 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, প্রথম বৎসর এইরূপ হইয়াছে বটে ; যাহাতে আগামী বৎসরে এইরূপ পোকা না ধরে, তজ্জন্য নানা স্থান হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এমন কি, সুদক্ষ সুদক্ষ মালীগণকে আনাইয়া পোকা নাশ করিবার যথেষ্ট চেষ্টাও করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, একটি আমও খাইয়া মনঃকষ্ট দূর করিতে পারিলেন না।

তবে কাঁঠালগাছগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কাঁঠাল ফলিতে লাগিল ; সকলগুলিই খাজা, একটিও "নেও" ফল হয় নাই। আমাদের দেশের যাঁহারা "নেও" কাঁঠাল খাইতে ভালবাসেন, তাঁহাদের দুঃখের সীমা রহিল না। কিন্তু চট্টগ্রামবাসীরা "নেও" কাঁঠাল খায় না, সুতরাং তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

ঐরূপ পোকা ধরিবার একমাত্র কারণ বিষম কোয়াসা যে সময় আমের মুকুল ধরে, সেই সময় প্রত্যহ এরূপ ঘন কোয়াসা হয় যে, একহাত দূরের দ্রব্য দেখা যায় না। আবার মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। হয়ত ১০।১২ দিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতে থাকে। আর ঝড়ের ত' কথাই নাই। কাজেই আমগাছগুলি এক্ষণে কেবলমাত্র কাঁচা আম প্রদান করিয়া স্থানীয় লোককে সন্তুষ্ট রাখিয়াছে মাত্র। সুপক্ক সুস্বাদু আম পাওয়া আকাশ-কুসুমবৎ।

তবে ইংরেজরাজকে সকলই ভয় করে, বোধ হয়, তজ্জন্যই Dy. Commissioner-এর খাসবাগানে যে কয়টি আমগাছ আছে, তাহাতে যে ফল পাকে, তাহাতে পোকা নাই বলিলেও চলে। প্রকৃতিদেবী তাহাদের সেবার জন্য বোধ হয় এইরূপ দয়া দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেই বৃক্ষগুলিও আমাদের রায় শশিভূষণ দত্তবাহাদুরের দ্বারা রোপিত হইয়াছিল। তিনিও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, ঐরূপ কোয়াসা, বৃষ্টি ও ঝড় সত্ত্বেও বৃক্ষসকল কি জন্য ঐরূপ সুন্দর সুন্দর উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছে। তাই বলিতে হয়, ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র।

সুদূর চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া আমাদের পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঙ্গালার কথা বলা যাউক।

যাহারা কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী, তাঁহারা বলেন, বাগানের যে অংশটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং যেখানে জলনিকাশ সহজেই হয় অথবা যেখানে জলনিকাশের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে, সেই সেই স্থানে আম্রবৃক্ষ রোপণ করা কর্ত্তব্য এবং যেখানে আমগাছ রোপণ করিবে, তাহার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগটি বেশ খোলা রাখা উচিত। অর্থাৎ যাহাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যালোক পায় ও যখন দক্ষিণে বাতাস বহিতে থাকে, তখন যেন দক্ষিণে বাতাস আমগাছের চারাগুলিতে উন্মুক্তভাবে লাগিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ কোন প্রকারে যেন আওতা না পায়। ঐরূপ রৌদ্র ও বাতাসের উপরই আম্রফলের উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে।

অনেকে বলেন, আমাদের কলিকাতার সন্নিকটে ভাগীরথীর উভয় তীরে অতিপূর্ব্বে অর্থাৎ ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে আম ফলিত, তাহার সিকিও এখন পাওয়া যায় না। সে কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে। কারণ, হুগলী হইতে আরম্ভ করিয়া মেটেবুরুজ

পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় পার্শ্বেই এতগুলি পাটের কল হইয়াছে যে, তাহার ধূমে বাগানের কোন গাছই সম্যক্ ফল প্রদান করে না। আর আম্রবৃক্ষের ত' কথাই নাই। আম্রগাছ অতি সুখী গাছ। তাহারা কলের ঐরূপ বিষাক্ত ধূম সহ্য করিতে পারে না। তাই বৌলগুলি সহজে নষ্ট হইয়া যায়; আর যাহা ফলরূপে পরিণত হয়, তাহার আস্বাদও বিকৃত হইয়া যায়। কারণ, ঐ ধূমে Sulphuric Acid যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এবং Sulphuric Acid আম-বৌলের পরম শত্রু। ঘন কোয়াসায় ঐরূপ Sulphuric Acid থাকে বটে, তবে তত পরিমাণে নহে। তথাপি কোয়াসায় বৌল নষ্ট হইয়া যায়। তবে ইহাও সত্য যে, অল্পপরিমাণে কোয়াসা না হইলে গাছে আদৌ বৌল ধরে না।

ইহার প্রমাণস্বরূপ দেখিতে পাইবেন, যেখানে ঐরূপ ধূমের উৎপাত নাই, সেখানে এখনও পর্য্যন্ত বড় অল্পপরিমাণে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আম পাওয়া যায়। 'আমরা অনেক সময়ে গঙ্গার ধারে অধিক অর্থব্যয়ে বাগানাদি ক্রয় করিয়া থাকি, কিন্তু আম পাই না। যদিও ভাগ্যক্রমে দুই-চারিটি ফল ধরে, তাহাও আবার চটকলের কুলী-মজুরগণের অত্যাচারে ফল পাকিবার পূর্ব্বেই সহসা অন্তর্হিত হয়। কাজেই Municipal Market হইতে আম ক্রয় করিয়া তবে বাবুরা বাগানের ফেরত বাটীতে আসিবার সময় কষ্টলব্ধ হাস্য হাসিতে হাসিতে বাটীতে প্রবেশ করিতে পান।

আবার অনেকের বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখা যায় যে, আমগাছগুলি এত ঘন ঘন বসান হইয়াছে, যে একের ডাল অন্যের ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কোন গাছটাই না পায় খোলা বাতাস, না পায় তেমন সূর্য্যের আলোক। ইহাও ফল না ফলিবার অন্যতম কারণ। যদি ফল চান তবে দুইটি গাছের মধ্যে অন্ততঃ যেন ৪০ ফুট জমি ফাঁক থাকে এবং পূর্ব্বদিকে যেন আওতা না পায়।

চারা রোপণ

আম্রবৃক্ষের চারা রোপণ করিবার অন্ততঃ একবৎসর পূর্ব্ব হইতে মাটির চাষ করিতে হয়। অর্থাৎ যে স্থানে চারা রোপণ করা মনস্থ করিবেন, সেই স্থানে ৪০ ফুট অন্তর এক একটি বৃহৎ গর্ত্ত খুঁড়িতে হইবে। প্রত্যেক গর্ত্তে উপযুক্ত পরিমাণে সার দিতে হইবে। শুষ্ক গোময় ও খইল আমগাছের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। ঐরূপ সার দিয়া মাটি ভরাট করিয়া অন্ততঃ একবৎসরকাল ফেলিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর চারা রোপণ করিয়া আবশ্যকমত জলসেচন করিতে হইবে। চারাগুলি যখন বড় হইবে, তখন মাঝে মাঝে যথোপযুক্ত পরিমাণে হাড়ের গুঁড়া দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে গাছপাতার সার দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। মনে থাকে যেন, হাড়েব গুঁড়া যত সূক্ষ্ম হয়, ততই ভাল, আর গাছপাতার সার কাঁচা থাকিতে দিলে পোকা ধরিবে। বিশেষতঃ, যে স্থানে কীটাদির উৎপাত আছে, সেই সকল স্থানে মাঝে মাঝে খাঁড়ি লবণ বিশেষ উপকারী। কারণ, উহা দ্বারা কীটাদি অতি সত্বর নষ্ট হইয়া যায় এবং গাছ বড় হইলে অন্যান্য সারের সহিত অর্দ্ধপরিমাণ পর্য্যন্ত লবণ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম বৎসর বৃক্ষে যে-সকল বোল ধরিবে বা আম দেখা দিবে, তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। বিশেষতঃ, কলমের গাছে। প্রথম বৎসর ফল পাকিতে দিলে গাছের তেজ কমিয়া যায় এবং তাহার পর আর ভাল ফল দেয় না।

সারাদি

অনেকেই ভাবেন যে, বাগান যতই পরিষ্কার রাখা যায়, ততই ভাল। এই অজুহাতে তাঁহারা বহু অর্থব্যয় করিয়া বাগানের সমুদয় শুষ্ক পত্রাদি ঝাড়ু দিয়া বাগানের সীমার বাহিরে কোন স্থানে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা

করেন। কিন্তু সেটি তাঁহাদের মস্ত ভুল। কারণ শুষ্ক পত্রাদির মত উৎকৃষ্ট সার পাওয়া দুর্লভ। ঐ সকল শুষ্ক পত্রাদি ফেলিয়া না দিয়া বাগানের মধ্যে কোন এক স্থানে একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া কিছুদিনের জন্য পুঁতিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। তবে ঐ সার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহা উত্তমরূপে শুকাইয়া লওয়া অতীব কর্ত্তব্য। নচেৎ কাঁচা সার দিলে কীটাদির উদ্ভব হইবেই হইবে অর্থাৎ দিতে বিপরীত হইবে। সারে কীট থাকিলে ফলেও কীট দেখা দিবে।

কলাগাছের পেটোগুলি আগুনে পুড়াইয়া যে সার হয়, তাহাও অতি উৎকৃষ্ট। সেই জন্য প্রত্যেকেরই উচিত—কলাগাছগুলি কাটিলেই তাহা ফেলিয়া না দিয়া বাগানের কোন এক স্থানে উহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া যে ছাই পাইবেন, তাহা অতি যত্নসহকারে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দিবেন এবং ঐ সার প্রত্যেক বৃক্ষের গোড়ায় দিয়া দিবেন। তাহার পর সময়মত জলসিঞ্চন করিবেন। ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কারণ, ঐ ছাইমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে Potash এবং Phosphorus থাকে। উহা আম্রবৃক্ষের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

একদিকে যেমন সার না দিলে বৃক্ষের ফলোৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পায় না, অন্যদিকে তেমন অধিক মাত্রায় সার দিলে বৃক্ষ ঝলসিয়া যায়। তজ্জন্য প্রত্যেকেরই ঐ দিকে নজর রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। তবে কত পরিমাণে সার দিতে হইবে, তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। কারণ, সকল স্থানের মৃত্তিকা সমান নহে।

চূণও আমগাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। কিন্তু চূণ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে জানা উচিত, কতটুকু পরিমাণে চূণ দিতে হইবে। কারণ, চূণের মাত্রা অধিক হইলে অথবা চূণ অধিক ঝাঁজাল হইলে গাছ ঝলসিয়া যায়। এ বিষয়ে মালীগণের উপর ভার দিলে চলিবে না।

বেলে মাটির পক্ষে ছাই বিশেষ অপকারী। কারণ, একেই ত' বেলে মাটিতে অধিক পরিমাণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, তাহার উপর ছাই দিলে ঐ সকল ছিদ্র বড় হইয়া যায় এবং মাটিতে ফাটল ধরে। তবে এঁটেল মাটির পক্ষে ছাই বিশেষ উপকারী। কারণ, এঁটেল মাটি সর্ব্বদাই জমাট বাঁধিয়া থাকে। ছাই দিলে ঐরূপ জমাট বাঁধিতে পায় না। তজ্জন্য জল অনায়াসে ঐ ছিদ্র দিয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে।

এদিকে যেমন উপযুক্ত পরিমাণে সার না পাইলে বৃক্ষে সুফল জন্মে না, অন্যদিকে তেমনি সময়োপযোগী জল না পাইলে বৃক্ষে তেমন তেজাল হয় না। তাই বর্ষাকালে গাছগুলি যেমন তেজাল হইয়া উঠে, অন্য সময়ে তেমন হয় না। এই জল যে সময়ে দিবার আবশ্যক, সে সময়ে যথোচিত জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বিশেষতঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি তেমন বৃষ্টি না হয়, তবে আমগাছে মাঝে মাঝে জলসিঞ্চন করা বিশেষ আবশ্যক। কারণ, তখন গাছে ফল ধরিয়াছে, জলাভাবে ফলগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। অন্যদিকে ইহাও জানা উচিত যে, আমগাছে বৌল ধরিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ ২।২॥০ মাস পূর্ব্বে বিশেষরূপ জলসিঞ্চন প্রয়োজনীয়।

শরৎকালেও মাঝে মাঝে জল দিতে হয়, কিন্তু শীতের প্রারম্ভে আর জলসিঞ্চন করিতে নাই। কারণ, ঐ সময়ে বৃক্ষগুলি আপন রসেই আপনি সরস হইয়া থাকে; বাহির হইতে জল পাইবার আবশ্যক নাই। শীতের পর মাঘ-ফাল্গুন মাসে যখন বৃক্ষগুলি মুকুলিত হইতে থাকে, ঠিক সেই সময়ে জলসিঞ্চনের আবশ্যক নাই। কিন্তু মুকুল বাহির হইবার পর মাঝে মাঝে জো বুঝিয়া স্বল্পাধিক জলসিঞ্চন প্রয়োজনীয়। কারণ, জল না পাইলে বৌল ঝরিয়া পড়ে। তবে সে সময়ে যদি বৃষ্টির জল পায়, তাহা হইলে আর জলসিঞ্চন করা উচিত নহে।

ছোট ছোট চারাগাছগুলিতে মাঝে মাঝে সকল ঋতুতেই জলসিঞ্চন আবশ্যক, কেবল বর্ষাকালে নহে। অনেক সময়ে বাগানের মালীগণ অল্পমাত্রায় জলসিঞ্চন করিয়াই বসিয়া থাকে, গোড়ার মাটি ভিজা দেখাইয়া মালিকগণকে প্রতারিত করে। তাহার ফলে চারাগাছগুলি তেমন তেজালো হয় না। তজ্জন্য অধিকারিগণের ঐ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ চারাগাছগুলি যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে জল পায়, তজ্জন্য মালিকগণকে স্বচক্ষে দেখিতে হইবে। নচেৎ চারাগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। তেজালো না হইলে শীঘ্র ফল দিবে না। এমন কি, সময়ে সময়ে চারাগাছগুলি এই জন্যই শুকাইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছোট ছোট চারাগাছ বৌল হইলে তাহা প্রথম ২।১ বৎসর কাটিয়া নষ্ট করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে গাছগুলি অচিরে বুড়াইয়া যায়, অধিক দিন ভাল ফল দেয় না।

অনেকে ভাবেন যে, কেবল বৃক্ষের তলদেশে জলসিঞ্চন করিলেই যথেষ্ট, বাস্তবিক তাহা নহে। কেন না, আমগাছের শিকড়গুলি বৃক্ষের তলদেশ হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তজ্জন্য যাহাতে প্রত্যেক চারাগাছের গুঁড়ির চারিদিকে অন্ততঃ ৮।১০ হাত পর্য্যন্ত মাটি সরস থাকে, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

কীটাদি

আমগাছের পাতা একেবারে ঝরিয়া পড়ে না, কিন্তু গাছ বড় হইলে অনেকানেক ডালপালা শুকাইয়া আসে। এই জন্য উদ্যান-পালকের উচিত এদিকেও দৃষ্টি রাখা, নচেৎ শুষ্ক ডালগুলিতে অধিকাংশ সময়ে পোকা ধরে এবং ঐ সকল পোকা ক্রমে অন্যান্য ডালপালায় ছড়াইয়া পড়ে। তাহাতে গাছগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য শুষ্ক ডালপালাগুলিকে ছেদন করিয়া ফেলা উচিত।

আমগাছে নানা প্রকারে কীটের উৎপাত দেখা যায়। তন্মধ্যে শ্বেত পিপীলিকার (রুইপোকা) উৎপাত অধিক। অনেকে মনে করেন, গাছ বুড়া হইলেই ঐরূপ পিপীলিকার উৎপাত হয়, তাহা সত্য নহে। অনেক সময়ে দেখিতে পাইবেন যে, চারাগাছেও ঐরূপ পিপীলিকার উৎপাত হইয়াছে এমন কি, গাছগুলিকে একেবারে অকালে নষ্ট করিয়া ফেলে। ঐ সকল পিপীলিকারা গাছের উপরকার ডালের তেমন ক্ষতি করিতে পারে না, কিন্তু গাছের গুঁড়িতে ঐরূপ পিপীলিকা ধরিলে আর রক্ষা নাই। এই জন্য ঐরূপ পিপীলিকার উৎপাত হইতে বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

গুঁড়িতে ঐরূপ পিপীলিকা দেখা দিলে গাছের গোড়ায় চারিদিক খুঁড়িয়া মাটিগুলি সরাইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। তাহার পর গরম জলে অল্পপরিমাণে কার্ব্বলিক সাবানের জল মিশাইয়া গাছের গুঁড়িটি বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। কেবল একদিনমাত্র ঐরূপ ধুইয়া দিলে চলিবে না; উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন ঐরূপ গরম জলে ধুইয়া ফেলিয়া, পরে গাছের গোড়ায় নূতন মাটি দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, যতদূর সম্ভব পিপীলিকাগুলিকে আগুন দ্বারা পুড়াইয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে। মশাল জ্বালাইয়া পিপীলিকা দগ্ধ করা উৎকৃষ্ট উপায়।

ডাক্তার ওয়াট (Dr. Watt) সাহেব বলেন, কিছু পরিমাণে হিং, হিঙ্গুল ও রেড়ীর খইল একত্র মিশাইয়া তাহাতে স্বল্পপরিমাণে (*Rasin of Gardenia Gummifera*) রেজিন মিশাইয়া লইতে হইবে। তৎপরে ঐগুলি বেশ করিয়া গুঁড়া করিবে এবং ১৫।১৬ বার পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ঐগুলি যখন পচিয়া ভেপসাইয়া উঠিবে, তখন উহাতে পুনরায় জল দিয়া বেশ করিয়া গুলিয়া ফেলিবে। যখন দেখিবে, বেশ পাতলা হইয়াছে, তখন উহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে গেরীমাটি মিশাইয়া লাল রং করিয়া লইবে।

ঐরূপ জলে গাছের গোড়াগুলি উত্তম করিয়া সিক্ত করিয়া দিবে। গোড়া হইতে অন্ততঃ ২।৩ হাত উচ্চ পর্য্যন্ত উহা লাগাইয়া দিবে এবং যাহাতে ঐ জল গাছের ছালের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপভাবে লেপন করা কর্ত্তব্য।

তিনি আরও বলেন, লাল রং করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কোন্ কোন্ গাছে ঐরূপ লেপন করা হইয়াছে, তাহা রং দেখিয়াই সহজে বুঝা যাইবে।

তাহার পরও মাঝে মাঝে ঐ পিপীলিকাগুলি যাহাতে একেবারে নির্ব্বংশ হয়, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, নচেৎ পূর্ব্বশ্রম সব নষ্ট হইয়া যাইবে।

মধুপুর অঞ্চলে আমগাছের গোড়ায় প্রায় রুই লাগিয়া থাকে, সেই জন্য গাছের গোড়ায় আলকাতরা মাখাইয়া দেয়। কিন্তু অনেক সময়ে তাহাতেও রুই-এর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। কারণ, আলকাতরা শুকাইয়া গেলে রুইপোকাগুলি আস্তে আস্তে ঐ গাছের গোড়ায় বাসা করিতে থাকে এবং অবশেষে গাছগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। সেই জন্য Dr. Watt সাহেব বলেন, তাঁহার নির্দ্দেশিত প্রলেপ মাঝে মাঝে দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন শ্বেত পিপীলিকার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই।

তিরহুট অঞ্চলে "গরহর" নামক একপ্রকার কীটের উৎপাত কিছু বেশী। তজ্জন্য অনেক ছোট ছোট গাছ অকালে শুকাইয়া যায়। ঐ সকল পোকা নষ্ট করিবার একমাত্র উপায়,—কার্ব্বলিক সাবানের জলে পিচকারী করিয়া বৃক্ষের গুঁড়ি বা ডালগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া পোকাগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলা।

এতদ্ভিন্ন আরও নানা প্রকার কীট আছে, তাহাদের উৎপাতে উৎকৃষ্ট ফলবান বৃক্ষগুলি অকালে শুকাইয়া যায় অথবা সুপক্ক ফলকে একেবারে

ভুয়া করিয়া ফেলে। তন্মধ্যে লাই, শোয়াপাকা, কাছিমপোকা সচরাচর দেখা যায়।

ইহাদিগকে নষ্ট করা বড় সহজ কথা নহে। কেহ কেহ বলেন, অগ্নিসংস্কারই ইহার একমাত্র প্রতিকার; অর্থাৎ মশাল জ্বালাইয়া ঐ সকল পোকা দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু ঐ মশাল অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে, নচেৎ সময়ে সময়ে পোকা নষ্ট করিতে গিয়া গাছ নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ গাছ ঝলসিয়া যায়।

বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন মুষ্টিযোগ

(১) আমের পচাপাতা, আমের আঁটির শাঁস ও নীল, এই তিনটি দ্রব্য সমভাবে বাটিয়া পেটের উপর পুরু করিয়া প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যকৃতের উপশম হয়।

(২) কচি আমপাতা, কচি জামপাতা, কয়েত বেল, কার্পাসফল ও আদা, এই কয়টির রস মধু-মিশ্রিত করিয়া কর্ণকুহরে দিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয়।

জম্ব্‌াম্রপত্রং তরুণং সমাংশং
কপিত্থ-কার্পাসফলঞ্চ সাদ্রম্।
কৃত্বা রসং তং মধুনা বিমিশ্রং
স্রাবাপহং তং প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ॥

(৩) আম, জাম, মৌল ও বট, ইহাদের পত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে দিলে পূতিকর্ণ প্রশমিত হয়।

আম্রজম্বু-প্রবালানি মধুকস্য বটস্য চ।
এভিস্তু সাধিতং তৈলং পূতিকর্ণগদং হরেৎ॥

(৪) আম্রগাছের ত্বক্ জল বা কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক নাভিমূলে দিলে পেটবেদনা প্রভৃতি উপসর্গ সহ অতিসার আরোগ্য হয়।

(৫) আমের আঁটির শাঁস ও বেলশুঁঠ, দুইটি দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধকরতঃ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ চিনির সহিত সেবন করিলেও অতিসার শীঘ্র আরোগ্য হয়।

(৬) জালি আমপাতা ১২টা, ইক্ষু-চিনির সরবতে (আন্দাজ একছটাক) উত্তমরূপে পেষণ করিয়া সেই সরবত সেবন মাত্র বমন প্রশমিত হয়।

(৭) আম্রকোশী, মুথা, সৈন্ধব, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ' মোচরস, পলা, আকনাদি, আতইচ এবং বারাএণ্ডা সমানাংশে লইয়া চূর্ন করিবে, পরে ২।৩ রতি মাত্রায় মধু ও চালুনীর জলের সহিত সেবনে আমরক্ত প্রশমিত হয়।

লেবু (নেবু)

লেবু নানা জাতীয়; তন্মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি জাতীয় লেবু ব্যবহার করিয়া থাকি।

(১) পাতিলেবু।

(২) কাগজীলেবু।

(৩) গোঁড়ালেবু।

(৪) টাবালেবু।

(৫) কমলালেবু।

(৬) সরবতীলেবু।

পাতি ও কাগজীলেবু—উভয়বিধ লেবুকেই—

হিন্দুস্থানীতে—নীবু, কাগজী নীবু

মহারাষ্ট্রে—কেথুইড লিম্বু

গুজরাটে—কাগদী লিম্বু, মীঠা লিম্বু

কর্ণাটে—কচিলে

তৈলিঙ্গে—নিম্মপড়ু

আসামে—নেমু টেঙ্গা

ফার্সিতে—লিমু-নেশিরি

আরবীতে—লিমুন হামিজ

ইংরাজীতে—Lemon

ডাক্তারী নাম—Citrus Medica

সংস্কৃতে—নিম্বুঃ স্ত্রী নিম্বুকং ক্লীবে নিম্বুকমপি কীর্ত্তিতম্।

ইহাদের গুণ একবিধ—

নিম্বুকলম্লং বাতঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু।

ইহা—অম্লরস, বায়ুনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু।

নিম্বুকং ক্রিমিসমূহহরং তীব্রমম্লমুদাগ্রহাপহম্
বাতপিত্তকফশূলিনে হিতং কষ্ট-নষ্ট রুচিং রোচনং পরম্।
ত্রিদোষবহ্নিক্ষয়বাতরোগ-নিপীড়িতানাং বিষবিকারিণাং
গলগ্রহে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি॥

গোঁড়ালেবু

গোঁড়ালেবুকে সংস্কৃতভাষাতে জম্বীর বলে। ইহার অন্যান্য নাম জন্ত, দন্তশঠ, জম্বীর, জম্ভল।

হিন্দীতে—নীবু, জম্বীরী নাবু
মহারাষ্ট্রে—সাখর লিম্বু
কর্ণাটে—কচিলে, কনিলে
তৈলঙ্গে—জংভিবং, নিম্মপড়ু
গুজরাটে—দোড়িঙ্গালিংবু
ফার্সিতে—লিমুনেশিরি লিমুনেতুসা
আরবীতে—লিমু নেহাজিম
ইংরাজীতে—Lemons
ল্যাটিন—Lemonum acidem
ডাক্তারী—Citrus Medica

ইহার গুণ—জম্বীরমুষ্ণং বাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুৎ
শূলকাস-কফোৎক্লেশচ্ছর্দ্দিতৃষ্ণামদোষজিৎ।

আস্যবৈরস্যহৃৎপীড়া-বহ্নিমান্দ্যক্রিমীন্ হরেৎ
স্বল্পজম্বীরিকা তদ্বৎ তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিনিবারিণী ॥

ইহা—উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও অম্লরস।

ইহার প্রয়োগ—বায়ু, কফ বিবন্ধ, শূলব্যথা, কফ, বমনবেগ, বমি, পিপাসা, আমদোষ, মুখের বিরসতা, হৃৎপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমিনাশক।

কেহ কেহ অম্লশূলরোগে গোড়া বা পাতিলেবু বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া বিপরীত ফল পাইয়া থাকেন। তাহার কারণ—"সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং" —বেশী কিছুই ভাল নহে।

ইহাতে হাত-পা-জ্বালা, ঘূর্ণা, চক্ষুতে জোনাকির মত দেখা, এই সকল লক্ষণ দেখা দেয়। সুতরাং কেহ যেন এই দ্রব্য অধিক মাত্রায় ব্যবহার না করেন।

টাবালেবু

টাবালেবুকে সংস্কৃত ভাষায় মাতুলুঙ্গ, বীজপুর, রুচক ও ফলপূরক বলে।

হিন্দীতে—বীজোরা নীবূ
মহারাষ্ট্রে—মহালুঙ্গ
গুজরাটে—বীজোক লিংবু
কর্ণাটে—মাধব লা
তৈলঙ্গে—দবাকায়া, মাধোফাল, পুচেটু
উৎকলে—কলংবা
ফার্সিতে—তুরংজ
আরবী—উতরংজ
ইংরাজী—Citrus
ডাক্তারী নাম—The Citran

ইহার গুণাবলী—বীজপূরফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু।
কফপিত্তহরং কণ্ঠজিহ্বাহৃদয়শোধনম্।
শ্বাসকাসারুচিহরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্॥

ইহা—অম্লমধুররস, অগ্নিদীপক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী এবং কণ্ঠ, জিহ্বা ও হৃদয়শোধনকারক।

প্রয়োগ—ইহা রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি ও পিপাসানাশক।

কমলালেবু

কমলালেবুকে সংস্কৃত ভাষায় মিষ্টনিম্বু বলে।

ইহার গুণ—

মিষ্টনিম্বুফলং স্বাদু গুরু মারুতপিত্তনুৎ।
গররোগবিষধ্বংসি কফোৎক্লেশি চ রক্তহৃৎ।
শোষারুচিতৃষাচ্ছর্দ্দিহরং বল্যঞ্চ বৃংহণম্॥

ইহা—মধুররস, গুরু, কফোৎক্লেশী, বলকারক ও পুষ্টিজনক।

প্রয়োগ—ইহা বায়ু, পিত্ত, গরদোষ, বিষ, রক্তদোষ, শোষ, অরুচি, পিপাসা, বমিনাশক।

কমলালেবুর জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ। নিম্ন-বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের সকল স্থানেই কমলার চাষ হইতে পারে। এই কলিকাতার ১০০ ক্রোশের মধ্যে কমলা জন্মে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পার্ব্বত্য প্রদেশেই এই ফল সুন্দরভাবে জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কমলা সুপক্ক হয়।

কলিকাতায় প্রধানতঃ দুই জাতীয় কমলার আমদানী দেখা যায়।

১। শ্রীহট্ট। ২। নাগপুর। এই দুই প্রদেশ হইতে আনীত হয়। তবে শ্রীহট্টের কমলাই উৎকৃষ্ট। ঐ সকল কমলার আবরণ বা খোলা

পাতলা এবং শাঁসও যথেষ্ট হয়। বিশেষতঃ সুপক্ক হইলে ইহা বড়ই মুখপ্রিয় হয়, তাহার বর্ণ অপেক্ষাকৃত কিছু লাল্‌চে।

আর নাগপুর হইতে যে-সকল কমলা আসে, তাহাদের খোলা পুরু, কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভাযুক্ত লাল।

নাগপুরী কমলায় অম্লরস নাই বলিলেও চলে, কিন্তু স্বাদে সিলেটের মত নহে। আর সৌগন্ধের ত' কথাই নাই। গৃহমধ্যে সিলেটের কমলা থাকিলে গৃহ সৌগন্ধে আমোদিত হয়। কিন্তু নাগপুরী কমলায় তাহার লেশমাত্র পাওয়া যায় না।

শ্রীহট্ট হইতে শীতের আরম্ভেই কমলালেবু আসিতে থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না গ্রীষ্মের আগমন হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কলিকাতায় আনীত হয়।

তার নাগপুরী কমলা ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি আসিতে আরম্ভ হয় এবং ৩।৪ মাস যথেষ্ট পরিমাণে কলিকাতায় পাওয়া যায়।

কমলালেবু গাছ

কমলালেবুর গাছ কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে রোপণ করিতে হয়। কলমের চারার গাছগুলিতে অতি শীঘ্র ফল দিতে আরম্ভ করে।

যে-সকল জমিতে চুণ ও পটাস্ থাকে এবং মাটিতে কাঁকর মিশান থাকে, সেই সকল জমিতেই কমলার চাষ ভাল হয় এবং জমি উচ্চ হওয়া আবশ্যক।

অস্থিচূর্ণ ও গোয়ালের আবর্জ্জনাই কমলালেবু গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

আশ্বিন মাসের প্রথমেই প্রত্যেক গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া মূল অনাবৃতভাবে একপক্ষকাল রাখিলে ভাল হয়। তারপর উহার গোড়ায় অস্থিচূর্ণ-সার, পচা গোময়-সার, পুরাতন গাঁথনির চুণ, শুরকীর জমাট

মসলা ও নূতন ভাল মাটি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেইগুলি ভরাট করিয়া দিতে হয়। যে স্থানে অধিক বায়ু সঞ্চালিত হয়, সেরূপ স্থানে কমলার গাছ ভাল জন্মে না। বিশেষতঃ সমুদ্রের বাতাস কমলার গায়ে লাগিলে গাছ শুকাইয়া যায়, ফল হওয়া ত' দূরের কথা।

আমাদের দেশে যাঁহারা উদ্যানে কমলার চারা বসান, তাঁহারা প্রায় দেখিতে পান যে ফল টক। এই জন্য কমলার গুঁড়ির চারিদিকে দুই হস্ত-পরিমিত একটি পরিধিযুক্ত বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া কিঞ্চিৎ চূণ দিয়া রাখিলে সেই ফল মিষ্ট হইতে দেখা যায়। গোড়ায় চূণ দিলে তত উপকার হয় না, বরং গাছ ঝলসিয়া যায়।

শ্রীহট্ট প্রদেশে মাটিতে চূণ অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া শ্রীহট্টের কমলা এত সুস্বাদু ও সুগন্ধ হয়।

ডাক্তার ও কবিরাজগণ বলেন—রোগীকে যদি সুমিষ্ট কমলা সময়ে সময়ে দেওয়া যায়, তাহাতে রোগী শরীরে বল পায়, ক্ষুধার উদ্রেক হয়, হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, এমন কি, আঙ্গুর ও বেদানা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

নারাঙ্গীলেবু

নামভেদে—

বাঙ্গালায়—নারাঙ্গী
হিন্দুস্থানী—নারিঙ্গ
গুজরাটী—নারঙ্গী লিম্বু
কর্ণাটে—মাধবলা
তৈলঙ্গে—দয়াকায়া ভঞ্জনির্ম্ম
তামিলে—কিচিলি

উৎকলে—নারিঙ্গী

আরবী ও ফার্সিতে—নারলা

আসামে—শুম্থিরা ডেঙ্গা

ল্যাটিনে—**Citrum aurantium**

ইংরাজীতে—**Orange**

গুণ—নারঙ্গং মধুরাম্লং স্যাদ্দীপনং বাতনাশনম্।

অপরস্বম্লমত্যুষ্ণং দুর্জ্জরং বাতহৃৎ পরম্॥

ইহা—অম্লমধুররস, অগ্নিদীপক ও বায়ুনাশক। ইহার অন্য জাতীয় আছে—

নাগরঙ্গঃ সুগন্ধঃ স্যাৎ ত্বক্‌সুগন্ধী মুখপ্রিয়ঃ।

ইহা—সুগন্ধি ও মুখপ্রিয়, এই জন্য ইহার নাম হইয়াছে ত্বক্‌সুগন্ধী ও মুখপ্রিয়।

ইহা—উষ্ণবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বায়ুনাশক ও সারক।

বাতাবীলেবু

বাতাবীলেবু সচরাচর দুই জাতীয় দেখা যায়। একটির ভিতরের বর্ণ হরিদ্রাভাযুক্ত শ্বেত এবং অন্যটির ভিতর গোলাপী।

এই লেবু প্রথমতঃ Batavia দ্বীপ হইতে আনীত হয়; এই জন্য ইহার নাম হইয়াছে বাতাবি বা বাতাবী। ইহার সাধারণ নাম শোলঙ্গ।

বাতাবীলেবু গাছ

বীজ গুটি বা দাবা কলমে ইহার চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ষাকালেই চারা তৈয়ার করিবার সময়। ৬।৭ হাত অন্তর চারা রোপণ করা উচিত। অন্যান্য গাছের যেরূপ পাট হইয়া থাকে, তদপেক্ষা ইহার বিশেষ কিছু পাট

করিবার নাই। তবে মাটির তারতম্যানুসারে ও বীজের প্রকারভেদে ইহার ফলের বিশেষ তারতম্য হয়।

পৌষ মাসের শেষভাগে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কয়েক দিবস শিকড় বাহির করিয়া রাখিয়া, পরে সার দিয়া তাহা ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাঘ মাসে গাছে ফুল আসে। ইহার ফুল শুভ্রবর্ণের থোলো থোলো মনোহর সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

ইহার ফল কাঁচা খাওয়া যায় না। শ্রাবণ মাস হইতে গাছে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। গাছ হইতে না পাড়িলে প্রায় এক বৎসরকাল ইহা গাছেই ঝুলিতে থাকে। কিন্তু পাকিয়া যাইবার পর অধিক দিন গাছে থাকিলে ক্রমে নীরস হইয়া যায়।

মাঘ মাসে যখন গাছে ফল ধরে, তখন গাছের গোড়ায় লবণ দিলে ফল সুমিষ্ট ও রসাল হয়।

অন্যান্য জাতীয় লেবুর কথা যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উহাদের আবাদ-প্রণালী প্রায় একই রকম।

আর ঐ সকল লেবুগাছ, বীজ, জোড়কলমও দাবাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। চারা বা কলম উৎপন্ন করিবার সময় বর্ষাকাল।

ঐ সকল লেবু, যে স্থানে বালির ভাগ অধিক, সেখানে ভাল জন্মে না; কিন্তু দো-আঁসলা বা দুধে এঁটেল মাটিতেই ভালরূপ জন্মে। এ জন্য বেলে মাটি পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত প্রকারের রসা মাটি নির্ব্বাচন করিয়া আট-দশ হাত অন্তর গাছ রোপণ করা উচিত।

গাছ রোপণকালে মাটির সহিত পুরাতন রাবিশের গুঁড়া এবং উপযুক্ত সার মিশ্রিত করিয়া দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

লেবুগাছ ঈষৎ হেলাইয়া পুঁতিলে বিস্তৃতাকার ধারণ করে এবং তাহাতে প্রচুর ফলও জন্মিয়া থাকে।

অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ঐ সকল গাছের শিকড় বাহির করিয়া ১০।১৫ দিবস রাখিয়া পরে যথোপযুক্ত সার ও মাটি দিতে হয়। মাঘ মাসে গাছে ফুল ধরে। ঐ সময়ে গোড়ায় রসের অভাব হইলে ফুল ও ফল ঝরিয়া যায়; এজন্য সপ্তাহে একবার করিয়া জলসেচন করা বিশেষ আবশ্যক। বৈশাখ হইতে লেবু ব্যবহার করিবার উপযোগী হয়।

এতদ্ভিন্ন চীনে, গোঁড়া, কামরালি প্রভৃতি অনেক জাতীয় লেবু দেখা যায়।

পান বা তাম্বূল

পানের সংস্কৃত নাম—তাম্বূল বা তাম্বূলী। ইহা যে কেবল মুখশুদ্ধি জন্যই ব্যবহৃত হইত, তাহা নহে। রাজপ্রসাদের চিহ্নস্বরূপ পুরাকালে পান বা পানের খিলি দেওয়া হইত। তাই আমরা পাঠ করিতে পাই—

"রাজ্ঞাসনং দত্তং তাম্বূলঞ্চ"

এমন কি, যে সময় রাজা বিক্রমকেশরী আমাদের ধনপতিকে চন্দন আনয়ন জন্য সিংহলে যাইবার আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনও—

"বুঝিয়া কার্য্যের গতি বিড়া লয় ধনপতি
অঞ্জলি করিয়া নিল পান।"

(বিড়া = পানের খিলি)।

আবার রাজাদের পানের খিলি দিবার জন্য "তাম্বূল করঙ্কবাহিনী" এক বা ততোধিক ভৃত্য নিযুক্ত থাকিত।

তাই বলিতে হয়, ভারতে পানের আদর চিরকালই সমান ছিল ও আছে। তবে আজকাল ভারতে আদেশ প্রদান জন্য রাজাও নাই, পানের সেরূপ ব্যবহারও নাই।

এখন কেবল "তাম্বূল চিবায়ে করে অধর লোহিত।" আর বলেন— ইহা কেবল মুখশুদ্ধি মাত্র।

আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থাদিতে এই পানের নানা প্রকার গুণ লিখিত আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দ্বিবিধ পানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়;—শ্বেত ও কৃষ্ণ।

আজকাল কিন্তু নানাজাতীয় পানের প্রচলন দেখা যায়, যথা—বাংলা, কড়ি, কর্পূর, সাচী ইত্যাদি।

অন্যদিকে উৎপত্তির স্থানভেদে পানের অনেক প্রকার নামের উল্লেখ আছে যথা—শ্রীবাটী, অম্লবাটী, সতসা, গুহাগরে, অম্লসবা, পাটুলিকা, বেহসনীয় ইত্যাদি।

এক্ষণে সুন্টে বাটুলের সুগন্ধি পানের আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়।

আজকাল যাহারা পানের চাষ করে, তাহাদিগকে বারুই বলিয়া আখ্যা দেয়। পূর্ব্বে কিন্তু তাহাদিগকে তাম্বূলী বা তাম্বূলিক বলিত। তাহারা—

"তাম্বূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাঃ পানভূময়ঃ" করিত, এইরূপ বর্ণনা পাঠ করা যায়।

সকল প্রকার পানলতা যে বোরোজে পালিত হয়, তাহা নহে; গাছ-পান বলিয়া একজাতীয় পান আছে, তাহা বড় বড় বৃক্ষের তলায় রোপিত হয় এবং ঐ সকল লতা বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত পানলতা পরম যত্নে পাঁকাটি আচ্ছাদিত গৃহমধ্যে লালিত-পালিত হয়। বারুইগণ ঐ সকল পানগৃহকে অতি পবিত্র ভূমি জ্ঞান করিবা অতি শুদ্ধাচারে তন্মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে। অপবিত্র দেহে বা অশুচি অবস্থায় পানগৃহে কখনও প্রবেশ করে না। তাহাদের ধারণা, অশুচি অবস্থায় পাণগৃহে প্রবেশ করিলে পান শুকাইয়া যায় বা পানগাছে পোকা লাগে।

এ হেন পানের গুণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

তাম্বূলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং তু বরং সরম্।
বশ্যং তিক্তং কটুক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘু।

বল্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্য-মলবাত-শ্রমাপহম্।
নক্তান্ধ্যশমনং কামদীপনং ক্ষতরোপণম্॥

ইহা—বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়, তিক্ত, কটুরস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক, কামদীপক ও ক্ষত-উপশমকারী।

ইহার অমোঘ প্রয়োগ—

কফ, মুখদৌর্গন্ধ্য, মল, বায়ু, শ্রান্তি, রাত্র্যন্ধতা (রাতকানা) প্রভৃতি নাশক।

আবার রাজনিঘণ্টুকারমতে—

নাগবল্লী কটুস্তীক্ষ্ণা তিক্তা পীনসবাতজিৎ।
কফকাসহরা রুচ্যা দাহকৃৎ দীপনীপরা॥

ইহা কটু, তীক্ষ্ণ ও তিক্তরস, ইহাতে পীনসরোগ ও বাত নাশ করে, কফ ও কাস আরোগ্য হয়, ইহা রুচিকারক, তবে দাহকৃৎ ও দীপনী। ইহা ত' গেল পানের সাধারণ গুণ।

কালো পানের গুণ

কৃষ্ণা তাম্বূলবল্লী তু তিক্তোষ্ণা চ কটুস্তথা।
কষায়া চ মলস্তম্ভকারিণী দহেকারিণী।
মুখজাড্যকরী প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

অর্থাৎ কালো পান—তিক্ত, কটু, কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, মলস্তম্ভক, দাহজনক ও মুখের জড়তাকারক—ইহাই মুনিগণের উক্তি; তাঁহারা ইহার তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন।

শ্বেত পান

শ্বেতপানকে লোকে ছাঁচিপানও বলে।

"শ্বেতা তু তাম্বুলী পথ্যা রুচ্যা দীপনকারিণী।
পাচকা কফবাতানাং নাশিনীতি প্রকীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ ছাঁচিপান সুপথ্য, রুচিবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও কফবাত-নাশক।

তাই কবিরাজগণ বলেন, খাইতে হয় ত' ছাঁচিপান খাইও।

তবে সকলের পক্ষে পান উপকারী নহে, এতৎসম্বন্ধে বৈদ্যক-গণের মত—

তাম্বূলমহিতং প্রোক্তং শরীরে রুক্ষদুর্ব্বলে।
জ্বরাস্যশোষপিত্তাস্কৃমদমূর্চ্ছাক্ষিরোগিষু॥

অর্থাৎ শরীর রুক্ষ ও দুর্ব্বল থাকিলে এবং জ্বর, মুখশোষ, রক্তপিত্ত, মদ, মূর্চ্ছা ও নেত্ররোগীর তাম্বুল সেবন নিসিদ্ধ।

অন্যদিকে ইহাও লিখিত আছে, অধিক পরিমাণে পান সেবন করিবে না।

তাম্বূলাত্যুপযোগাৎ স্যাৎ শ্লেষ্মপিত্তানিলান্বিতঃ।
দেহাস্কৃকেশদন্তাগ্নিশোত্রবর্ণবলক্ষয়ঃ॥

অর্থাৎ অধিক পরিমাণে পান খাইলে শরীরস্থ ত্রিদোষ কুপিত এবং শরীর, নেত্র, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শোত্র (শ্রবণশক্তি), বর্ণ ও বল ক্ষয় পাইয়া থাকে।

কিন্তু হায়, এ সকল শুনেই বা কে, বলিই বা কাকে, বলিয়া কবিরাজগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

দেশ ও ভাষাভেদে নামভেদ

ইহাকে বাঙ্গালায়—পাণ বা পান
হিন্দুস্থানীতে—পান, নাগরবেল
তৈলঙ্গে—তামলপাকু
তামিলে—বেট্টিলী
মহারাষ্ট্রে—নাগবেল
গুজরাটে—নাগরবেল্য, পান
কর্ণাটে—নাগরবল্লী, পর্ণ,
আসামে—পান্
ফার্সিতে—বর্গংতবোল,
আরবীতে—কান
কোকণদেশে—পানবেল
ইংরাজীতে—Betel leaf
ডাক্তারী নাম—Piper Bettle
সংস্কৃত ভাষায়—"তাম্বূলবল্লী, তাম্বূলী, নাগিনী, নাগবল্লরী।"

আধুনিক মত

ইহা পচননিবারক (Antiseptic), অজীর্ণ, গ্রহণী, মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি রোগে ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। পান চোয়াইয়া যে তৈল পাওয়া যায়, উহা অতিশয় পচননিবারক—এমন কি, কার্ব্বলিক এসিড্ অপেক্ষাও অধিক কার্য্যকর। এই তৈল কফজ যাবতীয় পীড়ায় এবং কণ্ঠস্বর ও স্বরযন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

কেহ কেহ বলেন, (Diphtheria) রোহিণীরোগে ইহার কবল ও ধূম বিশেষ উপকারী।

১০০ ভাগ অত্যুষ্ণ জলে একফোঁটা পানতৈল দিয়া তদুত্থিত ধূম আঘ্রাণ লওয়া যাইতে পারে।

প্রসূতির স্তনের ফোলায় পান দিয়া বাঁধিয়া দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং স্তনের অযথা দুগ্ধস্রাব নিবারণ হয়।

পানে চূণ মাখাইয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কপালে দিলে কপাল ধরা নিবারিত হয় এবং কখনও কখনও অন্যবিধ শিরোবেদনা দূর হয়।

পানের বোঁটায় কিঞ্চিৎ তৈল মাখাইয়া শিশুর মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে বদ্ধমল নিঃসারিত হয়।

সর্দি ও কাসিরোগে—পানে তৈল মাখাইয়া উহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বুকের উপর রাখিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

শোথরোগে—সাতটি পান বাটিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণসহ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে শোথরোগ আরোগ্য হয়।

কেহ কেহ বলেন, ইহার ২।৪ ফোঁটা রস সন্ধ্যাকালে চক্ষুর ভিতর ঢালিয়া দিয়া, পরক্ষণেই পরিষ্কার শীতল জল দিয়া চক্ষু ধৌত করিয়া ফেলিবে। এই প্রকার ২।৩ দিবস ব্যবহার করিলেই রাতকানা রোগ আরোগ্য হয়।

আমরা পানের খিলি বা বিড়ি প্রস্তুত করিয়াই চর্ব্বণ করিয়া থাকি এবং ঐ খিলি প্রস্তুত করিবার সময় তাহাতে চূণ, খয়ের, সুপারী, ধনের চাল, মৌরী, রাঁধুনি, এলাইচ, লবঙ্গ, জৈত্রী, দারুচিনি প্রভৃতি নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া থাকি। আর গোলাপজলের ত' কথাই নাই। সুতরাং ঐ সকল খিলির উপকারিতা তৎসমূহের উপাদানের উপর নির্ভর করে।

১। চূণ বা চূর্ণ

আমাদের দেশে তিন প্রকার চূণ ব্যবহৃত হয়। প্রথম পাথুরে চূণ, দ্বিতীয় ঝিনুকে চূণ, তৃতীয় মুক্তাভস্ম প্রভৃতি। সকলেই জানে যে,

অম্লপিত্ত ও শূল রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ ও পথ্য—চূণ। আবার ক্রিমি নাশ করিতেও চূণ যথার্থ উপকারী।

চূর্ণ প্রস্তুত করিবারও প্রাণালী আছে। তবে সচরাচর ৮ তোলা আন্দাজ চূণ দশ সের আন্দাজ জলে ২।৩ প্রহর ভিজাইয়া রাখিয়া তবে চূণোদক প্রস্তুত হয়। চূণ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে একবার ছাঁকিয়া লইলে ভাল। অনেকে পানে চূণ মিশাইবার সময় অঙ্গুলি দিয়া লাগায় তাহাতে আঙ্গুল হাজিয়া যাইবার ভয় আছে, (বিশেষতঃ কাজকর্ম্মের বাটীতে যখন বহুসংখ্যক খিলি প্রস্তুত করিতে হয়, সে সময়ে) একটি কাঠী করিয়া লাগাইলে ভাল হয়।

চূণের গুণ

···চূর্ণকং বাতশ্লেষ্মমেদঃপ্রশান্তিকৃৎ।
হন্ত্যম্লপিত্তং শূলঞ্চ গ্রহণীঞ্চ ব্রণং ক্রিমীন্॥

অর্থাৎ চূণ বাত, শ্লেষ্ম, মেদ, অম্লপিত্ত, শূল, গ্রহণী, ব্রণ ও ক্রিমি নষ্ট করে।

২। খদির বা খয়ের

ইহা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। কেবল যে আমরা পান দিয়া ভক্ষণ করি, তাহা নহে। ইহা হইতে রং প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ খদির লৌহপাত্রে ভিজাইয়া ঐ জলের সহিত সোহাগার খৈ মিশ্রিত করিয়া লিখিবার কালি প্রস্তুত করেন। কেহ কেহ বা বিবিধ সুগন্ধি মিশাইয়া কেতকী বা কেয়াফুলের পাতার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া একরূপ সুগন্ধি খয়ের প্রস্তুত করে, তাহাকে কেয়াখয়ের বলে।

ইহার বৃক্ষ ঠিক বাবলা গাছের মত। আকার বাবলার মত কণ্টকযুক্ত। ইহা হইতে খদির প্রস্তুত করা কঠিন নহে। প্রথমতঃ বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড

করিয়া কর্ত্তনপূর্ব্বক অগ্নিতে একটি পাত্রে জল সহ সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। কিছুক্ষণ সিদ্ধ হইলে উহা হইতে মধুর মত এক রকম গাঢ় রস নির্গত হইতে থাকে, উহা শুষ্ক করিয়া লইলেই খদির প্রস্তুত হইল। ইহাকে কেহ কেহ "পাপড়ি খয়ের" বলে।

খদির-বৃক্ষের বীজ বাবলার বীজের মত ছোট হয়। একটি হাপর প্রস্তুত করিয়া উহাতে বীজ রোপণ করিলেই বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। ঐ চারাগুলি একটু বড় হইলেই উহা অন্যত্র নাড়িয়া লইয়া উপযুক্ত স্থানে রোপণ করিতে হয়। এই বৃক্ষ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়, প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া অল্প পরিমাণে সার দিলেই গাছ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উদ্ভিজ্জ সার বা প্রাণিজ সার ব্যবহার করা চলে।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ মতে খাদিরের গুণ অনেক।

খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কণ্ডূকাসারুচিপ্রণুৎ
তিক্তঃ কষায়ো মেদোঘ্ন ক্রিমিমেহজ্বরব্রণান্।
শ্বিত্রশোথামপিত্তাংশ্চ পাণ্ডুকুষ্ঠকফাময়ান্।
বহ্নিমান্দ্যমতীসারং রক্তদোষং বিনাশয়েৎ॥

খদির শীতল, দন্তের হিতকারী এবং ইহাতে অরুচি, ক্রিমি, প্রমেহজ্বর, শোথ, পিত্ত, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, কফ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার রক্তদোষ প্রভৃতি নাশ করে।

আজকাল এই খদির অনেক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, আবার ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে নানাবিধ খয়ের আমদানী হইতেছে।

কিন্তু এক্ষণে কি আমদানী, কি রপ্তানী, কি প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া, আমাদের হস্তে কিছুই নাই।

৩। সুপারী বা গুবাক বা গুয়া

আমাদের দেশে সুপারী যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সুপারী গাছের জন্য বিশেষ কোন চাষের আবশ্যক নাই, তবে চারা অবস্থায় একটু জলসেচনাদি করিলেই যথেষ্ট। উহা হইতে যে সুপারী হয়, তাহাকে দেশী সুপারী বলে আর জাহাজে করিয়া যে সকল সুপারী ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আনীত হয়, তাহাকে "জাহাজী" সুপারী বলে।

এতদ্ভিন্ন চট্টগ্রামের "বনগুয়া" শ্রীহট্টের "রামগুয়া", কুচবিহারের "দেশোয়ালি", আসামের "রুণীগুয়া" সুবিখ্যাত। আবার "চতল" সুপারী বলিয়া এক জাতীয় সুপারী পাওয়া যায়, তাহা সুগন্ধি বলিয়া বিখ্যাত। আবার আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদির মতে সুপারী সপ্তবিধ ;—সৈরী, তৈগুণ, ঘোণ্টা, চেতল, বেল্লিগু, চন্দ্রাপুরী ও আভ্র। কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল রকমের সুপারী বড় দেখা যায় না।

ইহার গুণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

পূগং গুরু হিমং রুক্ষং কষায়ং কফপিত্তজিৎ।
মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্॥

অর্থাৎ—ইহা গুরু বটে কিন্তু ইহাতে মুখের বিরসতা নাশ করে, এবং ইহা রুক্ষ, শীতল, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, অগ্নিপ্রদীপক ও রুচিকর।

আর্দ্রং তৎ গুর্ব্বভিষ্যন্দি বহ্নিদৃষ্টিহরং স্মৃতম্।
স্বিন্নং দোষত্রয়চ্ছেদি দৃঢ়মধ্যং তদুত্তমম্॥

অপক্ব সুপারী—গুরু, অভিষ্যন্দি এবং অগ্নি ও দৃষ্টিনাশক, স্বিন্ন পূগ—ত্রিদোষনাশক—মধ্যভাগ উত্তম। এই জন্যই সুপারী ভিজাইয়া তবে পানে দিয়া খাওয়া ভাল। গোলাপজলে ভিজাইলে ত' কথাই নাই।

আবার কেহ কেহ এই সুপারীকে দ্বিখণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিয়া গোদুগ্ধে

সিদ্ধ করিয়া লয়, তাহাকে লোকে "চিকি সুপারী" বলে। ইহা মধুর ও বহুগুণবিশিষ্ট।

সুপারী কাঁচা ভক্ষণে মত্ততা আনয়ন করে এবং মাথা ঘুরে।

সুপারীর ছাই দিয়া দন্তধাবন করিলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় এবং ফোলার যন্ত্রণা দূর হয়।

৪। ধনে

ধনে আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। ইহার পাতা সুগন্ধি, সবুজবর্ণ, সূক্ষ্ম ও চিরাল, দেখিতেও সুন্দর। ইহার গাছ যত বড় হইতে থাকে, পাতা ততই ছোট হইয়া যায়। ইহার ফুল সাদা সাদা।

ইহা চর্ব্বণ করিলে মনে প্রফুল্লতা আনয়ন করে, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী সবল হয়। পেটের দূষিত বায়ু মস্তকে উঠিতে দেয় না। উষ্ণতাবশতঃ মনের ঔদাস্য, চাঞ্চল্য ও হৃৎকম্প দূর করে। শুক্র ও মেহ রোগে উপকারী। পিপাসা নিবারণ করে, বমন নিবারিত হয়। ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। ইহার সরবৎ পান করিলে মদের নেশা বিনষ্ট হয়। ইহার কাথ পান করিলে গ্রহণী ও ওলাউঠা রোগে উপকার পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ভাজা ধনের কাথ বিশেষ উপকারী। ইহা ক্রিমি বিনষ্ট করে, ইহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরোবেদনা দূর হয়। ধনের তৈল সুগন্ধী ও বায়ুনাশক। ব্যঞ্জন সুগন্ধী করিবার জন্য ধনে-শাক দিয়া রন্ধন করে। ইহা পিত্তনাশ করে।

"আর্দ্রস্তু তৎগুণং স্বাদু বিশেষাৎ পিত্তনাশনম্।"

৫। মৌরি

ইহা এক প্রকার বীজ। গাছ এক গজ পরিমিত হয়, ফুল হরিদ্রা-বর্ণ, পাতা শুলফার পাতার মত সরু। বীজ ঈষৎ ধূসর ও সবুজবর্ণ—ছোট, ঈষৎ বক্র। মৌরি দ্বিবিধ দেখা যায়—বন্য ও উদ্যানে জাত।

ইহাতে পাকস্থলী সবল করে, চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করে, বায়ুজনিত বেদনা দূর করে, মুখে সুগন্ধ হয়। পুরাতন গ্রহণী রোগে বিশেষ উপকারী। ইহার সূক্ষ্ম চূর্ণ শিশুদিগের পেটে মর্দ্দন করিলে পেটফুলা ও পেটের বেদন নিবারণ হয়। ইহার পাতার রস চক্ষুতে দিলে চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। ইহা জলে ভিজাইয়া সেবন করিলে পাথুরী রোগে বিশেষ উপকার হয়, এবং বমনেচ্ছা বন্ধ হয়।

তবে বন্য মৌরি উষ্ণ প্রকৃতির লোকের পক্ষে অপকারী। ইহা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে বিছা বা ভীমরুল দংশনে উপকার হয় ইহা গুরুপাক। পাকস্থলীকে শীতল করে। তবে হাবা রোগে উপকারী. ইহার প্রলেপ দিলে স্ফোটক ফাটিয়া যায়। ইহা বায়ু-বিনাশক।

৬। রাঁধুনী

"হিঙ্গুপত্রী ভবেদ্রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা পাবনী কটুঃ।
হৃদ্বস্তিরুগ্বিবন্ধার্শঃ-শ্লেষ্ম-গুল্মানিলাপহা॥"

ইহা হৃদ্রোগে, বস্তিগত রোগে, বিবদ্ধ অর্শে উপকারী; কফগুল্ম ও বায়ুনাশক। ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, পাচক ও রুচিকর।

৭। দারুচিনি

"ত্বচং লঘুষ্ণ কটুকং স্বাদু তিক্তক রুক্ষকম্
পিত্তলং কফ বাতঘ্নমামারুচিবিনাশনম্।
হৃদ্বস্তিরোগবাতার্শঃক্রিমিপীনসশুক্রহৃৎ॥"

ইহা লঘু, কটু, স্বাদু, তিক্ত, রুক্ষ ও পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, আমদোষ, অরুচি, হৃদ্‌রোগ, বস্তিরোগ, বাতজনিত অর্শ, ক্রিমি, পীনস ও শুক্রনাশক। সাধারণতঃ ইহাকে দারুচিনি বলে। ইহা মুখশোষ ও তৃষ্ণানিবারক এবং সুগন্ধী ও বলকারক।

"সুরভিঃ শুক্রলা ব্যলা মুখশোষতৃষ্ণাপহা"

ইহা একজাতীয় বৃক্ষের বল্কল মাত্র। ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জই ইহার জন্মস্থান। তবে আজকাল অনেকে আমদানী করিয়া নিজ নিজ উদ্যানে রোপণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতে বল্কলে দারুচিনির মত কোন গুণই পাওয়া যায় না। সখের গাছস্বরূপ উদ্যানশোভনার্থই সমাদৃত হইয়া থাকে মাত্র। লোকের নিকট বলা চলে, আমার উদ্যানে দারুচিনি বৃক্ষ আছে।

ইহার চাষ করিবার বিশেষ নিয়ম আছে। বিশেষতঃ ইহার চাষ সহিত কাবাবচিনির চারার জোড় কলম বাঁধিয়া দারুচিনির চাষ প্রস্তুত করিতে হয়।

চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় প্রদেশে দারুচিনি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানকার স্বভাবজ বৃক্ষ। লুসাই ভাষায় ইহাকে—থ্‌াকাথি্‌ন বলে। কুকীগণ বন হইতে ইহার বল্কল সংগ্রহ করিয়া সহরে লইয়া আসিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে।

৮। এলাইচ

এলাইচ দ্বিবিধ ;— ছোট এলাইচ ও বড় এলাইচ। এই দুই বৃক্ষ বিভিন্ন দেশজাত।

ছোট এলাইচ—গুজরাট ও মালাবারের পার্ব্বতীয় অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। ইহার গাছ প্রায় দুই গজ উচ্চ হয়। ইহার পাতা ডালিম-পাতার মত, ফল গুচ্ছবদ্ধ ও সবুজবর্ণ হইয়া থাকে। ফল শুষ্ক হইলে শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ইহার ফল ত্রিকোণবিশিষ্ট। ইহা সুগন্ধী। ইহার গুণ তিন বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। ইহার ব্যবহারে মনে প্রফুল্লতা উৎপন্ন হয়। মুখ ও ঘর্ম্ম সুগন্ধযুক্ত হয়। ইহাতে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়, হৃৎপিণ্ড সবল করে, বায়ুজনিত পেটের বেদনা দূর করে। ইহার রসে ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হয়।

বিগত গন্ধবণিক মহাসভায় যে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, সেই প্রদর্শনীতে আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাল মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ও অনেক যত্ন ও কষ্টে একটি সজীব ছোট এলাইচের বৃক্ষ আনয়ন করিয়া গন্ধবণিকমাত্রেরই ধন্যবাদপাত্র হইয়াছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহারই কৃপায় চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া লইয়াছেন।

আজকাল এই বঙ্গদেশে যে ছোট এলাইচ বাজারে সচরাচর বিক্রীত হয়, তাহা বিশুদ্ধ অবস্থায় আনীত হয় না। উহা হইতে উহার নির্য্যাস বাহির করিয়া লইয়া পরে এখানে প্রেরিত হয়। তাই না থাকে সুগন্ধ, না থাকে রসকস। নামে মাত্র ছোট এলাইচ।

বড় এলাইচ—এই গাছ সুমাত্রা, যাবা প্রভৃতি ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ হইতে আনীত হয়। সত্য বটে, এক্ষণে ভারতের স্থানে স্থানে বড় এলাইচের বৃক্ষ দেখা যায়। বিশেষতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে, কিন্তু সেগুলি পূর্ব্বোক্ত বড় এলাইচের মত সুগন্ধ ও সৎগুণবিশিষ্ট নহে।

এই বৃক্ষের ফল গোলাকার, তিনটি ধারযুক্ত ফলের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধী বীজ নিহিত থাকে। ইহার বীজ, আবরণ-মধ্যে থাকিলে ইহার গুণ ২ বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। কিন্তু খোসা ছাড়াইলে ১ বৎসরের অধিক থাকে না।

ইহা মনের প্রফুল্লতা আনয়ন করে। ইহাতে পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি করে। দন্তের মাড়ি শক্ত করে। মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে। যকৃতের বেদনায় ও ওলাউঠা রোগে বিশেষ উপকারী।

ইহার খোসা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরোবেদনা দূর হয়।

সংস্কৃত ভাষায় ছোট এলাইচকে সূক্ষ্মৈলা ও বড়এলাইচকে স্থূলৈলা বলে। ছোট এলাইচের গুণ সম্বন্ধে আর্ব্বয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে আছে—

এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাসকাসার্শোমূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ।
রসে তু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহরী মতা॥

ছোট এলাইচ—কফ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বায়ু নাশ করে, ইহা লঘু ও কটু রস। আর বড় এলাইচের গুণ সম্বন্ধে আছে—

স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘু।
রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তার্দ্রকণ্ডুশ্বাসতৃষাপহা।
হৃল্লাসবিষবস্ত্যাস্যশিরোরুগ্‌বমিকাসনুৎ॥

ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বিষদোষ, বস্তিগত রোগ, মুখরোগ, শিরোরোগ, বমি ও কাস নষ্ট করে।

কিন্তু রাজনিঘণ্টুকারমতে—উভয়বিধ এলাইচ একরূপ গুণবিশিষ্ট, যথা—

এলাদ্বয়ং শীতলতিক্তমুষ্ণং সুগন্ধপিত্তার্ত্তিকফাপহারি।
করোতি হৃদ্রোগমলার্ত্তিবস্তিপুংস্ত্বঘ্নমন্ত্রস্থবিরো গুণাঢ্যঃ।

৯। জৈয়ীত্রী বা জৈত্রী

জায়ফলের আবরণকে জৈত্রী বলে। জায়ফল-গাছ মলাক্কা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে জন্মিয়া থাকে এবং পিনাং, মালয় ও জাঞ্জিবর দ্বীপেও ইহার আবাদ আছে। ইহার শাখাগুলি ভূমির দিকে নত থাকে। পাতা মর্দ্দন করিলেও কিঞ্চিৎ সুগন্ধ পাওয়া যায়।

ইহার ফুল বহুসংখ্যক; ক্ষুদ্রাকার গন্ধবিহীন এবং হরিদ্রাবর্ণ। ফল প্রায় গোলাকার কুক্কুটডিম্বের ন্যায়। গাত্র মসৃণ ও হরিদ্রাবর্ণ। ইহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। শুষ্ক হইলে পীতবর্ণ হয়, বীজাবরণ কঠিন ও স্থূল। জায়ফল যতই বড় হয়, ততই উত্তম।

ইহার গুণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

জাতীফলস্য ত্বক্ প্রোক্তা জাতীপত্রী ভিষগ্বরৈঃ।
জাতীপত্রী লঘু স্বাদুঃ কটুষ্ণা রুচিবর্ণকৃৎ।
কফ-কাস-বমিশ্বাস-তৃষ্ণাক্রিমিবিষাপহা।
বক্ত্রবৈশদ্যজননী তিক্তা দৌর্গন্ধহারিণী॥

ইহা কফ, কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, ক্রিমি-বিষ, দৌর্গন্ধ বিনাশ করে;

জৈত্রীর বিশেষ গুণ।—ইহা যকৃৎ ও পাকস্থলী সবল করে এবং মনে প্রফুল্লতা আনয়ন করে। ইহা পাচক, বায়ুনাশক।

১০। লবঙ্গ

লবঙ্গকে সংস্কৃত ভাষায়—দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ ও শ্রীস্থনক বলে। ইংরেজী—ক্লোভস্, হিন্দীতে—লওঙ্গ, মহারাষ্ট্রী—লবল, গুজরাটী—লবীঙ্গ, কর্ণাটে—লবঙ্গকলিকা, তৈলঙ্গী—লবঙ্গলু, আরবী—করণফল, ফার্সি—মেখক বলে।

ইহার গাছ জাঞ্জিবার ও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জে জন্মিয়া থাকে। বৃক্ষ নয় বৎসরের না হইলে ফল ধরে না। ইহা চির-সবুজ। অর্থাৎ বারো মাসই এই গাছে পাতা থাকে।

আমরা যাহাকে লবঙ্গ বলি, তাহা লবঙ্গবৃক্ষের পুষ্পের শুষ্ক কলিকা মাত্র। উহার অগ্রভাগে যে গোলাকার পদার্থ থাকে, উহা লবঙ্গফুলের চারটি দল মাত্র এবং ঐ দলে চতুর্দ্দিকে চারিটি দাঁতের ন্যায় থাকে। ইহার ভিতর অনেকগুলি পুংকেশর এবং এক একটি গর্ভতন্তু থাকে।

লবঙ্গফুলের কলিকাগুলি যখন উজ্জ্বল লালবর্ণ হয়, তখন ঐগুলি আস্তে আস্তে বৃক্ষ হইতে হস্ত দ্বারা চয়ন করিয়া লইতে হয়। পরে ২।৩ দিন ধরিয়া কোন একটি মাদুর বা চেটাইয়ের উপর ঐগুলি রৌদ্রে রাখিয়া

দিতে হয়। যখন ঐগুলি শুষ্ক হইয়া যায়, তখন উহার রং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, এবং বেশ কঠিন হইয়া যায়। তাহার পর ঐগুলি বিক্রয়ার্থ নানা দেশবিদেশে রপ্তানী হয়।

ইহার গুণ—

লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিমম্।
দীপনং পাবনং রুচ্যং কফপিত্তাস্রনাশকৃৎ।
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষয়পতি ধ্রুবম্॥

লবঙ্গ কটু, তিক্ত, লঘু, নেত্রহিতকর, শীতল, দীপন, পাবন ও রুচিকর। ইহা কফ, পিত্ত, কফদোষ, তৃষ্ণা, বমি, উদরাধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা, ক্ষয়রোগ আশু বিনাশ করিয়া থাকে। ইহা সিদ্ধ করিলে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। ইহাতে মনের প্রফুল্লতা উৎপাদন করে, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে।

পূর্ব্বোক্ত দশবিধ উপকরণসহ আমরা যে পানের খিলি চর্ব্বণ করিয়া থাকি, বিশেষতঃ আহারাদির পর, তাহাতে যে কেবল মুখের অসারতা ও দৌর্গন্ধ দূর করে, তাহা নহে, তৎসঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যের গুণ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে নানা রোগ নাশ করে—মন প্রফুল্ল রাখে এবং রক্ত পরিষ্কার করে।

ওল, কচু, মান

আমাদের দেশে প্রচলিত প্রবাদ আছে :—

ওল, কচু, মান,
তিনই সমান।

অর্থাৎ—ওল, কচু, মান কন্দজ এবং গুণে প্রায় একরূপ। এতদ্ভিন্ন স্বাদেও প্রায় একরূপ, আবার খারাপ হইলে মুখে লাগে, বোধ হয়, এই জন্যই উক্ত প্রবাদ হইয়াছে। এই প্রবাদ হইতেই ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহার অন্যের মত হইলেই—যদিও উক্ত ব্যক্তি উহার আত্মীয়স্বজন নহে, অথবা একজাতীয় নহে, তথাপি ব্যবহারে উভয়কেই সমান দেখিলেই লোকে বলিয়া থাকে—ওল, কচু, মান—তিনই সমান। আবার বাপ-বেটা, খুড়া-জেঠা, ভাইপো বা ভাগিনেয় একরূপ দুষ্ট হইলেও লোকে উক্ত প্রবাদের সাফল্য দেখান। কিন্তু বাস্তবিক ওল, কচু ও মান এই তিনের গুণে কিছু কিছু প্রভেদ আছে, যথা :—

ওল—রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফহর ও অর্শরোগীর পথ্য। কিন্তু কুষ্ঠ ও বাতরক্ত বা অন্য প্রকার রক্তদুষ্টিতে অপথ্য।

মান—শীতল, শুষ্ক, শোথরোগীর পথ্য।

কচু—রেচক ও আমবাত-রোগীর অপথ্য।

কার্ত্তিক মাসে ওল খাওয়া নিষিদ্ধ।

শরৎকালে ও মধুমাসে (চৈত্র) দেবীপূজায়—মান ও কচু-পাতার আবশ্যকতা দেখা যায়। যথা, নবপত্রিকায়—কদলী, দাড়িম্ব, ধান্য, হরিদ্রা, মান, কচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তী—এই নয়পত্রসংগঠিত স্ত্রীমূর্ত্তি।

ওল

ওল দুই প্রকার ;—বন্য ও গ্রাম্য। যাহা বনমধ্যে আপনা আপনি জন্মে, তাহাকে বন্য ওল বলে, আর যাহা আবাদ করিয়া বাজারে বিক্রীত হয়, তাহা গ্রাম্য। বন্য ওল বড় কুটকুটে। তবে ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

আবার রাজনিঘণ্টুকার মতে—বর্ণভেদে ওল দুই প্রকার, যথা—একের কন্দ শ্বেত, অপরের কন্দ রক্তাভ শ্বেত।

নামভেদ

বাঙ্গালায়—ওল।
হিন্দুস্থানী—শূরণ, জিমিকন্দ।
মহারাষ্ট্র—গোড়াশূরণ, খাজেরাশূরণ।
আসাম—ওলকচু।
গুজরাটী—শূরণ।
তৈলঙ্গী—মঞ্চাকন্দা, দোলকন্দা।
ফার্সি—ওল।
বোম্বায়—জংলিশূরণ।
সংস্কৃতে—"শূরণঃ কন্দ ওলশ্চ কন্দলোঽর্শোঘ্ন ইত্যপি।"
ডাক্তারি নাম—Arum companulatum,
ল্যাটিন নাম—Amo phophallus paniculatus.

গুণাবলী

শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃ কৃন্তলো লঘুঃ॥

বিশেষাদর্শনে পথ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥
দদ্রূনাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ।
সন্ধানযোগসম্প্রাপ্ত শূরণো গুণবত্তরঃ॥

ইহা অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কষায়, কটুরস, কণ্ডূকারক, বিষ্টম্ভী বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক ও লঘু। ইহাতে কফ, অর্শ, প্লীহা ও গুল্ম রোগ আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ অর্শরোগে ইহা সুপথ্য। সর্ব্বপ্রকার কন্দশাকের মধ্যে ওলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগে ইহা অনিষ্টকর এবং সন্ধানযোগপ্রাপ্ত ওল অধিক গুণদায়ক।—(ভাবপ্রকাশ)

রাজনিঘণ্টুকার মতে—

বজ্রশূরণকো রুচ্যঃ কটূষ্ণক্রিমিনাশনঃ।
গুল্মশূলাদিদোষঘ্নঃ সদা চারুচিহারকঃ॥

অর্থাৎ শ্বেতওল রুচ্য, কটু, উষ্ণ, ক্রিমিনাশক, গুল্মশূলাদি দোষ নাশ করে এবং অরুচি দূর করে।

ধন্বন্তরীর মতে—

কাসং শ্বাসঞ্চ ছর্দ্দিঞ্চ নিবারয়তি সেবিতঃ।

ইহা কাস, শ্বাস, সর্দ্দি দূর করে।

হারীতমতে—

দীপনঃ শূরণো রুচ্যঃ কফঘ্নো বিশদো লঘুঃ।

ইহা দীপক, রুচ্য, লঘু, বিশদ ও কফ নাশ করে।

ঔষধে—।০ আনা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

ঔষধে

চক্রদত্তমতে—

রক্তাভ শ্বেত বন্য ওলকে মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পাক করিয়া সৈন্ধব লবণ, তিল ও সরিসার তৈল সহ ভক্ষণ করিলে **অর্শরোগ** আরোগ্য হয়।

মৃল্লিপ্তং শৌরণং কন্দং পক্ত্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ।
অদ্যাৎ সতৈললবণং দুর্নামবিনিবৃত্তয়ে॥

হারীতমতে—

বন্য ওল ঘৃত ও মধুসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বল্মীক ও শ্লীপদ আরোগ্য হয়।

পিষ্ট্বা শূরণকন্দঞ্চ মধুনা চ ঘৃতেন চ।
লেপনঞ্চ হিতন্তস্য বল্মীক-শ্লীপদাপহম্॥

ওলকে পোড়াইয়া ঘৃত ও মধুসহ লেপন করিলে "আব" বিনাশ পায়।

শৌরণং কন্দকং দগ্ধ্বা ঘৃতেন চ গুড়েন চ।
লেপনঞ্চার্ব্বুদানাঞ্চ নাশনঞ্চ ভিষগ্বর॥

মুষ্টিযোগ

(১) অর্শরোগে ওল বিশেষ উপকারী, এবং গ্রহণী ও দৌর্ব্বল্যে রোগী ওল খাইলে বিশেষ উপকার বোধ করে।

R. N. Khory বলেন—

It is stomachic and tonic, used in piles and given as a restorative in Dyspepsia, Debility etc.

(২) ওল, হরিদ্রা, চিতামূল ও সোহাগার খই এই সকল দ্রব্য, কাঁজিসহ পেষণ করিয়া এবং তাহাতে গুড় মিশাইয়া অর্শে প্রলেপ দিলে প্রবল শ্লৈষ্মিক অর্শ বিনষ্ট হয়।

(৩) বন্য ওল মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া পুটপাকে তাহা সিদ্ধ করিবে, সেই সিদ্ধ ওল কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অচিরে অর্শরোগ আরোগ্য হয়। ইহা অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(৪) ওলের আচার করিয়া খাইলেও অর্শরোগে উপকার হয়।

চাষ

ওল নিম্নস্থানে পুতিলে, তাহা মুখে লাগে। আর উচ্চস্থানে অর্থাৎ যেখানে জল বসে না, এরূপ স্থানে রোপণ করিলে বড় হয় ও মুখে লাগে না।

কলিকাতার অদূরে সাঁতরাগাছির ওল বিখ্যাত। ইহার উপরিভাগ বেশ লাল হয়। ভিতর কিন্তু সাদা।

প্রথম বৎসর ইহার চাষ করিয়া যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা আকারে বড় ছোট হয়। এই জন্য একবার তুলিয়া ফেলিয়া জমিতে সার দিয়া (ছাই ও খোল) পুতিতে হয়। তবে জল বসিলে পচিয়া যায়, সেই জন্য জল-নিকাশের বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হয়।

চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য প্রদেশের ওল আকারে অর্দ্ধমণ পর্য্যন্ত হয়। ইহার আকার চ্যাপ্টা, গোলাকার, ডাঁটার নিম্নাংশ কিছু চাপা হয়। ইহা যেমন সুস্বাদু ও উপকারক, তেমনি বহুদিন পর্য্যন্ত সরস থাকে। সেখানকার ওল এখানে পুতিলে তেমনটি হয় না। এখানে এঁটেল মাটি, পার্ব্বত্য প্রদেশে কঙ্করমুক্ত দোআঁসলা মাটি। তাহার উপর এ স্থানে জল আদৌ বসিতে পায় না।

আমাদের দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ওল-ফুল ফুটিতে দেওয়া উচিত নহে, ফুটিলে বড় অলক্ষণ। আর চাষারা বলে—ওলফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই ওল তুলিয়া ফেলা উচিত, নচেৎ উহার সমস্ত গুণ নষ্ট হইয়া যায় এবং অবশেষে পচিয়া যায়।

অনেকের ধারণা, ওল দুই বা তিন বৎসর বাদে তুলিলে খুব বড় হয়, কিন্তু তাহা সত্য নহে। বর্ষার সময় ইহা তুলিয়া ফেলিয়া আবার বর্ষার বেগ কমিয়া গেলে মাটিতে সার দিয়া ওল পুতিয়া দিলে আকারে বড় হয় এবং কটুত্ব দোষ চলিয়া যায়।

ওল স্বভাবতঃই পল্লীগ্রামস্থ ব্যক্তিগণের বসতবাটি বা বাগানের চতুর্দ্দিকে জন্মিয়া থাকে। তাহার জন্য লোকে কোন প্রকার চাষ করে না। একবার যেখানে ঐরূপ ওল জন্মিয়াছে, সেইখানে প্রতিবৎসর বর্ষার পরই আপনা আপনি গজাইয়া থাকে। কিন্তু চাষ না করায় সেগুলি কি আকৃতিতে, কি আস্বাদে তত ভাল হয় না। অধিকাংশ সময়ে খাইলে মুখে লাগে। তজ্জন্যই অনেকে ওলকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে।

তবে এই বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে আজকাল ওলের চাষ হইতেছে। সুতরাং সেই সেই স্থানের ওল কি আকৃতিতে, কি আস্বাদনে, কি উপকারিতায় সকল বিষয়েই উৎকৃষ্ট।

সকল জমিতে কিন্তু ওল ভাল জন্মে না। উচ্চ মাটাল দোঁয়াশ জমিতেই ওল ভাল জন্মে অর্থাৎ যেখানে জল বসিতে পায় না এবং যে স্থানে উঠন্ত ও পড়ন্ত রৌদ্র গাছের গোড়ায় লাগে, সেই স্থানেই ওল ভাল জন্মে।

তবে ওল পুতিবার পূর্ব্বে জমিতে প্রথমতঃ উত্তমরূপে লাঙ্গল দিতে হয়, পরে মই দিয়া মাটির ডেলাগুলি ভাঙ্গিয়া লইতে হয়।

তাহার পর দুই হাত অন্তর একটি গর্ত্ত খুড়িতে হয়। গর্ত্ত অন্ততঃ আধ হাত গভীর হওয়া চাই। চারা রোপণের পূর্ব্বে প্রত্যেক গর্ত্তে

সামান্য উনানের পোড়া মাটি ও সোডা মিশ্রিত করিয়া ঐ গর্ত্ত সকল বুজাইতে হয় এবং প্রত্যেক গর্ত্তে এক একটি করিয়া চারা রোপণ করিতে হয়। ওলের মুখীগুলিই চারার জন্য বীজরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম বৎসর ঐ মুখী হইতে যে চারা উৎপন্ন হয়, তাহা তত বড় বা উৎকৃষ্ট হয় না। ২।৩ বৎসর ঐরূপ ভাবে চাষ দিবার পর যে ওল জন্মে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হয়। সাঁতরাগাছিতে ঐরূপ ভাবে চাষ হইয়া থাকে। তাই উহার সুনাম এত অধিক।

ভাদ্র আশ্বিন এই দুই মাস ওল তুলিবার সময়; এবং উহা আহার করিলে নানা উপকারও পাওয়া যায়। কারণ, বর্ষাকালে বঙ্গদেশে লোকের নানাপ্রকার পেটের পীড়া হয়। ঐরূপ ওল খাইলে ঐ সকল পেটের পীড়ায় আর কষ্ট পাইতে হয় না।

ওল আজকাল বাজারে নানাজাতীয় দেখা যায়, তন্মধ্যে চীৎ ওল, মুগীওল ও বাঘা ওলই প্রধান।

দুই বৎসরের না হইলে ওল বড় হয় না। ছোট ছোট কাঠবিড়াল, শূকর, সজারু প্রভৃতি জীব ওলের প্রধান শত্রু। ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়—গোড়ার মাটি আলগা করিয়া তুঁতের জল সেচন করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে ওলের ক্ষেত্রে গন্ধকের ধূম দিলে ভাল হয়।

আজকাল ওলের ব্যবসায়ে লাভও যথেষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে চাষ না করিয়া ওলের ব্যবসায়ে নামা বাতুলতা মাত্র।

মান

ইহার সংস্কৃত নাম—মানক, মহাপত্র ও স্থলপদ্ম।

"মানকঃ স্যান্ মহাপত্রঃ স্থলপদ্মোঽপি বা স্মৃতঃ"

ল্যাটিন নাম—Alocasia. A, Montana.

গুণ—ভাবপ্রকাশের মতে—

মানকচু শোথহারক, শীতবীর্য্য, লঘু পিত্ত ও রক্তদুষ্টিনাশক।

"মানকঃ শোথহৃচ্ছীতো রক্তপিত্তহরো লঘুঃ।"

রাজনিঘণ্টু মতে—

মান—সুস্বাদু, শীতল, গুরু, শোথহর ও কটু।

"মানকঃ স্বাদুঃ শীতশ্চ গুরুঃ শোথহরঃ কটুঃ।"

সুশ্রুত মতে—মান—স্বাদু, শীতল, কটু, শোথহর ও গুরু।

"মানকঃ স্বাদু-শীতশ্চ গুরুশ্চাপি প্রকীর্ত্তিতঃ।"

নামভেদ—

বাঙ্গালায়—মান বা মাণ

হিন্দী—মানকন্দ

মহারাষ্ট্রী—কস্আলু

কর্ণাটী—ভোগমানা

ঔষধার্থে ইহার কাণ্ড ও পত্রবৃন্ত ব্যবহৃত হয়; মাত্রা—১ তোলা পর্য্যন্ত। তবে ঔষধার্থে ব্যবহৃত করিবার পূর্ব্বে মানকে কাটিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লয়।

শুষ্ক করিয়া রাখিলে ইহা সুদীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। পশ্চিমের লোকেরা মানকচু খাদ্যস্বরূপ ব্যবহার করে না, মাত্র উদ্যান-শোভনার্থে ইহার চাষ বা আবাদ করিয়া থাকে।

ইহার ডাঁটা কটুরস, সঙ্কোচক এবং রক্তরোধক, তবে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে আগুনে সেঁকিয়া লইতে হয়।

ইহার রস শিশুগণের কানের পূঁজ নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে ইহার রস একবারের অধিক দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। উপকার হইবার হইলে একবারমাত্র ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

বাতরোগীর পক্ষে—মানকচু সরু সরু টুকরা করিয়া কাটিয়া বস্ত্রমধ্যে বাঁধিয়া অগ্নিতে সেঁকিয়া লইয়া তবে উহার স্বেদ ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া.যায়।

অর্শরোগে—ডাঃ ডি, বসু প্রভৃতি ডাক্তারগণের মতে অর্শরোগীকে মানকচু সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। আবার যাহারা কোষ্ঠবদ্ধ রোগে বহুদিন কষ্ট পায়, তাহাদের পক্ষেও মান বিশেষ উপকারী।

মুখক্ষতে—সার্জ্জন মেজর আর, এল্, দত্ত মহাশয়ের মতে মান ভস্ম করিয়া উহা মধুর সহিত মাড়িয়া মুখের ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে মুখের ক্ষত অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। আজকাল বড় বড় ডাক্তারগণ শোথরোগে রোগীকে মানকচুর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা মৃদুরেচক ও মূত্রকারক।

চক্রদত্তমতে—

উদররোগে—পুরাতন মানচূর্ণ ৮ তোলা, ঈষৎ কুট্টিত তণ্ডুল ১৬ তোলা, দুগ্ধ /১ সের, প্রায় /২ সের জলসহ পায়স প্রস্তুত করিয়া রোগীকে ভোজন করিতে দিলে আশু উপকার পায়। ইহাতে গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়।

"পুরাণং মাণকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃততণ্ডুলম্।
সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যসেৎ পায়সন্তু তৎ।
হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি॥"

প্লীহোদর শোথে—পুরাতন মানকচু আধ তোলা, অর্দ্ধ পোয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে প্লীহা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে শোথেরও বিশেষ উপকার হয়। সে শোথ এক অঙ্গেই হউক বা সর্ব্বাঙ্গেই হউক।

"স্থলপদ্মময়ং কল্কং পয়সালোড্য পায়য়েৎ।
প্লীহাময়হরঞ্চৈব সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গশোথজিৎ॥"

শোথে—মানক-ঘৃত—

মানের ঘৃত, মানের কাথ ও কল্কযোগে নিয়মমত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শোথ-রোগে বিশেষ উপকার হয়।

মানকক্কাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষঞ্চ ব্যপোহতি॥

জিহ্বারোগে—মানভস্ম—

মানকচু অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম খাঁটি সরিষা-তৈল ও সৈন্ধবলবণ সহ জিহ্বায় ঘষিলে জিহ্বার জড়তা দূর হয়।

"জিহ্বাজাড্যং চিরজং মাণকভস্মলবণতৈলঘর্ষণৈঃ হন্তি"

মান, কচু ও ওল ছাই পাইলে বেশ সতেজ হয় এবং উহাদের কন্দও পরিপুষ্ট হয় ও কুটকুটে হয় না।

চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের মানকচুগুলি ৫।৬ হাত লম্বা হয়, এবং ইহাদের ব্যাস প্রায় অর্দ্ধহস্তপরিমিত হয়। সুতরাং ওজনে প্রায় সময়ে সময়ে এক মণ পর্য্যন্ত হয়। ইহাকে হাতীকচু বলে, কারণ ইহার আকৃতি অনেকটা হাতীর পায়ের মত হয়। ইহা অল্পেই সুসিদ্ধ হয় এবং কখনও মুখে লাগে না। সুতরাং উহাতে নানাবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুকাইয়া রাখিলেও মানকচু অনেক দিন যাবৎ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এত বড় হইবার কারণ কেবল মাটির উর্ব্বরত্ব। উহাতে কোন প্রকার সার দিবার আবশ্যক করে না।

ডাক্তারীমতে—

It contains circular crystals of Oxalate of lime to which it acridity is due. It is a mild laxative and deuretic and is

given in piles and habitual constipation. The ash is used as a local applications for aphthac in the mouth. (Khory)

এহেন মানের গুণ কবির মুখে বড়ই মধুর—

কচুর সমাজে তার অতিশয় মান
গুণ দেখে রসিকেতে নাম দিলে মান।
মানদাস বাবাজীর অভিমান নাই,
পরিমাণে বাড়ে মান মানে দিলে ছাই।
মাছের সহিত প্রেম যুক্ত হলে ঝোলে,
একবার যে খেয়েছে সে কি আর ভোলে।

কচু

আমরা যাহাকে কচু বলি, সংস্কৃত ভাষায় তাহার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। * অথচ আমরা কচু প্রচুর পরিমাণে আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি।

এই কচু তিন প্রকার—(১) ক্ষুদ্র কড়ির মত।
(২) শঙ্খাকার অর্থাৎ ছোট শঙ্খের মত।
(৩) লম্বা লম্বা ডাঁটার মত

১। ক্ষুদ্র কচু লালা-সংযুক্ত হয়। কখনও কখনও সিদ্ধ করিয়া খাইলে মুখে লাগে। তখন উহাকে বিশেষ শুষ্ক করিয়া তাহার পর সিদ্ধ করিলে ইহার দুষ্টদোষ চলিয়া যায়।

২। যেগুলি পেঁজের মত বা শঙ্খাকৃতি, সেগুলি প্রায় মুখে লাগে না। উহাতে নানাপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলে অতি উপাদেয় হয়।

---

* কচুর সংস্কৃত নাম "কচু"। দুর্গাপূজায় কচু গাছ নবপত্রিকার একটি অঙ্গ। কচুগাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে "কচ্চধিষ্ঠাত্রী দেবী" বলা হয়।

৩। মধুপুর অঞ্চলে কচু প্রায় ১।২ হাত লম্বা হয়। উহা ভাতে দিয়া খাইতে অতি সুস্বাদু এবং উহা বিশেষ উপকারী; বিশেষতঃ প্লীহা ও যকৃৎ-রোগীর পক্ষে। মানকচুর মত ইহাতে শোথের বেশ উপকার হয়। ইহা পাতলা পাতলা করিয়া কুটিয়া ভাজিলে ঠিক পাঁপর-ভাজার মত মুড়মুড়ে হয় ও বিশেষ মুখরোচক, এবং ডালনা প্রভৃতিতে এই কচু-ব্যবহার করিলে ডালনার স্বাদ বিশেষ উপাদেয় করিয়া দেয়।

কচুকে ইংরাজীতে—Arum বা Yam বলে।
আরবী নাম—কলকাল।
ফার্সি নাম—কনকাল।
হিন্দী নাম—ঘুইটাঁ।
বাঙ্গালা—কচু।
সংস্কৃতে—ক্ষুদ্র শৌরণ বলে।

কচু অতি স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হয় বলিয়া এবং অনেকেই ইহা তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করে বলিয়া অতি তুচ্ছ দ্রব্যকে কচুর সহিত তুলনা করে। সে আমার কচু করবে। আবার দগ্ধ করিলে ছাইয়ের মত বিস্বাদ হয় বলিয়া লোকে বলে কচুপোড়া খাও।

এদেশীয় হিন্দুস্থানীগণ যথেষ্ট পরিমাণে কচু খাইয়া থাকে। আজকাল কলিকাতায় কচু সিদ্ধ করিয়া ছানার পরিবর্ত্তে ছানাবড়ার মত প্রস্তুত করিয়া পানতুয়া বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা তৎসঙ্গে সাদা আলু মিশ্রিত করিয়া দেয়। সামান্য সামান্য ব্যঞ্জনে (যেমন চচ্চড়ি) কচু দিয়া রন্ধন করিলে ব্যঞ্জন বেশ সুস্বাদু হয়। অর্থাৎ যে আটার মত দ্রব্য নির্গত হয়, তাহাতে ব্যঞ্জন আটা আটা করিয়া দিয়া স্বাদ বৃদ্ধি করে। গুণেও পুষ্টিকর হয়।

আর একপ্রকার কচুগাছ দেখা যায়, তাহার পাতা চন্দনের ছিটা দেওয়া মত লাল লাল বিন্দুবিশিষ্ট, তাহাকে বিলাতী কচু বলে ; ইহার কন্দ আহার্য্য নহে। সেই জন্য সাহেবেরা উদ্যান-শোভার্থে উহার চাষ করিয়া থাকে। কখনও কখনও ছোট টবে করিয়া গৃহের পার্শ্বে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়া দেয়। দেখিতে নয়নাভিরাম বটে।

মুষ্টিযোগ

১। কচু (যেন উত্তমজাতীয় অর্থাৎ কুটকুটে না হয়), চিতামূল ও সোহাগার খই এই সকল দ্রব্য কাঁজিসহ পেষণ করিয়া এবং তাহাতে গুড় মিশাইয়া অর্শে প্রলেপ দিলে শ্লৈষ্মিক অর্শ আরোগ্য হয়।

২। কেহ কেহ বলেন, রক্তজবা ও কচুপাতা টাকে ঘসিয়া দিলে টাক সারিয়া যায় এবং অচিরে ঘন চুল বাহির হয়। কিন্তু ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই।

৩। মানের পরিবর্ত্তে কচু ব্যবহার করিলেও অনেকানেক রোগে সমান ফল পাওয়া যায়।

গুণাবলী

ইহা ব্যবহার করিলে শরীর পুষ্ট ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়। কান ও কণ্ঠের রুক্ষতা বা সুড়সুড়ি দূর করে এবং আমাশয় রোগে বিশেষ উপকারী।

ইহা গুরুপাক বটে, কিন্তু কষ্টদায়ক নহে। ইহার খোসা ব্যবহারে দাস্ত বন্ধ হয়। মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা দূর হয়।

ইহাও ওল-মানের মত অর্শরোগে বিশেষ উপকারী।

ইহা রন্ধন করিলে ইহা হইতে যে এক প্রকার আটা বাহির হয়, তাহা পাকস্থলীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ইহাতে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি করে। ইহার পত্রের রস মূত্রকর।

মানকচুর চাষ

মানকচু কন্দজাতীয় উদ্ভিদ্। ইহার শিকড় হইতে ছোট ছোট চারা আপনি বাহির হয়। ঐ চারাগুলিকে যত্নের সহিত রোপণ করিলেই মানকচু পাওয়া যায়।

বর্ষার পরেই যখন মাটি ভিজা থাকে অথচ অধিক বৃষ্টি না হয়, সেই সময়ে চারা রোপণ করিতে হয়। অন্য সময়ে রোপণ করিলে গাছগুলি মারা পড়ে। ইহার জন্যও মাটি প্রথমতঃ উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে ওলের ক্ষেত্রের চাষ সম্বন্ধে যেরূপ লেখা হইয়াছে, মানের জন্যও সেইরূপ করিতে হয়। তবে ওলের ক্ষেত্রের মত তত গভীর করিয়া কর্ষণ করিবার আবশ্যক নাই, এরূপ মনে করা ভুল, বরং তদপেক্ষা আরও গভীর গর্ত্ত করা আবশ্যক। যে ক্ষেত্র যত গভীর কর্ষিত হইবে, সেই ক্ষেত্রজাত মানও অপরাপর মান অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ও ওজনে ভারী হইয়া থাকে।

মানকচুর গর্ত্তগুলি ভরাট না করিয়া ঐ মাটি বর্ষার জলে আপনি যাহাতে ভরাট হয়, তজ্জন্য খোলা রাখিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, তাহাতেই গর্ত্তগুলি আপনা আপনি মানকচুর উপযুক্ত সারযুক্ত হয়। তবে ঐ গর্ত্তে কিছু পরিমাণে সোডা দিলে ভাল হয়। তৎপরিবর্ত্তে উনানের ছাই, বৃক্ষাদির সার দিলে ভাল হয়।

পটাসিয়ম্ উৎকৃষ্ট সার। ছাও ও ভস্মে পটাসিয়ম্ অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়া মান বৃদ্ধি পায়, তাই লোকে বলে—ছাই দিলে মাণ বাড়ে। ছাই দিলে মান যত লম্বা তত মোটাও হয় এবং আস্বাদনেও উৎকৃষ্ট বোধ করা যায়।

এ দেশে চারি জাতীয় মান দেখা যায়;—মানকচু, মানগিরি, মানগুঁড়ি ও লোলকচু; ইহাদের চাষে বেশী অর্থ ব্যয় হয় না। ওলের ন্যায় মানেরও শত্রু আছে, ব্যবস্থাও একরূপ।

কচুর চাষ

মানকচুর ন্যায় ছোট কচুর চাষ করা আবশ্যক। না করিলে ভাল হয় না।

ছোট কচুও এ দেশে নানাজাতীয় দেখা যায়, যথা—মুখীকচু, ঝুলিকচু ও কালকচু।

মান ও ওলের মত কচুও বৎসরান্তে ক্ষেত হইতে তুলিয়া লইয়া মাটির পাট করিয়া পুনরায় জো বুঝিয়া পুতিতে হয়। ইহাতে উহার আকার বড় হয় এবং শাঁসও পরিপুষ্ট হয়।

ইহারও শত্রু আছে, তবে তজ্জন্য ব্যবস্থা ঐ একরূপ।

যে সকল মান, ওল, কচু মুখে লাগে, তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে চূণ মাখাইয়া ঘণ্টা দুই রাখিয়া দিবার পর রন্ধন করিয়া খাইলে আর মুখে লাগে না।

কচু-রন্ধনে উহা হইতে এক প্রকার যে আটার মত বাহির হয়, তজ্জন্যই তরকারীর স্বাদ ভাল হয়। সেই জন্য কচু হইতে যত অধিক পরিমাণে আটা নির্গত হয়, ততই ভাল। *

---

* কচুর কচি শাকও খাইতে মন্দ নহে। গরীবেরাই শাক বেশী খায়। তবে ধনী দরিদ্র সকলেই অরন্ধনের দিনে কচু-শাক খাইয়া থাকে। কচুর ডাঁটাও সিদ্ধ করিয়া ও তাহার জল ফেলিয়া দিয়া, নারিকেলকুরা দিয়া খাইলে, অথবা কিঞ্চিৎ তেঁতুল দিয়া রন্ধন করিলে খাইতে সুস্বাদু হয়।

নিম্ব

নিমগাছ ভারতের সর্ব্বত্রই আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে। ইহার চাষের জন্য কোন প্রকার সারাদির প্রয়োজন হয় না। ইহার পাতা, ফুল ও ছাল তিক্তরসে পরিপূর্ণ। ইহার ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, তখনও ইহার স্বাদ তিক্ত। কিন্তু ঐ ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং স্বাদেও মিষ্ট হয়। তখন অনেকানেক পক্ষী আসিয়া ঐ ফল সাদরে ভক্ষণ করে। আমাদের দেশের রমণীকুল ঐ ফলের আকৃতি অনুযায়ী সুবর্ণফল নির্ম্মাণ করায়, তাহার নামও নিমফল রাখেন। ইহার ফল ছোট ও লম্বা।

ইহার পত্রের চারিধার করাতের ন্যায় দাঁতযুক্ত। এক একটি বৃন্তে ৩।৪ জোড়া পাতা থাকে। ফুল সাদা, ছোট ও গুচ্ছাকারে হইয়া থাকে।

নিম্ববৃক্ষে তিক্তরস সম্বন্ধে কবিগণ বলেন—

"শর্করা-শতদানেন ন নিম্বো মধুরায়তে।"

ইহার রস স্বাদে তিক্ত বটে, কিন্তু গুণে অমৃততুল্য; তাই সকলেই আদর করিয়া নিম্ববৃক্ষ আপন আপন বাটি ও উদ্যানে রোপণও করিয়া থাকেন; ডাক্তার ও কবিরাজগণ বলেন—ইহার বায়ু জ্বরঘ্ন, বিশুদ্ধ ও পরম হিতকারী। এমন কি, সাধারণ প্রবাদ এই—"নিম নিসন্দা যেথা, মানুষ মরে কি সেথা"?

নিমগাছ চারিবিধ—

১। সাধারণ নিম (বা গ্রাম্য নিম)।

২। মহানিম (বা পার্ব্বত্য নিম) ঘোড়ানিম্ব।

৩। ভূমিনিম্ব।

৪। কার্পাকনিম বা কৈতর্য্য।

কিন্তু চারি জাতীয় নিমবৃক্ষের গুণ প্রায় সমান, তবে মহানিম বা ঘোড়ানিমের গাছ আকৃতিতে বড় হয়, ইহার পাতাও কিছু বড় বড় হইয়া থাকে এবং স্বাদেও অতিশয় কটু। ইহার পাতাগুলি সাধারণ নিমপাতার ন্যায় বক্রাকৃতি হয় না।

ভুঁইনিম গাছ—আকৃতিতে ছোট, পাতাও ছোট হয়। আর কার্পাক-নিমের পাতার এক দিক শ্বেতাভ এবং অন্য ভাগ কৃষ্ণাভাযুক্ত হয়।

ভাষাভেদে নামভেদ

সাধারণ নিম—বাঙ্গালায়—নিম
হিন্দীতে—নীম্
আরবী—আজা দরখতুলহিন্দ
ফার্সি—নিব
তামিল—বেপুম্মরম
তৈলঙ্গী—বেয়াটোচেট্ট
কর্ণাটে—বেড
গুজরাটে—লিংবড়ো
মহারাষ্ট্রে—লিম্ব বা কতুনিম্ব
আসামে—নীম
ইংরাজী—Neem tree নিম ট্রী
ডাক্তারী নাম—Melio Azadiracta.
সংস্কৃত ভাষায়—ইহার অন্যান্য নাম—পিতুমর্দ্দ, পিতুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র, হিঙ্গুনির্য্যাস ইত্যাদি।

"নিম্বঃ স্যাৎ পিতুমর্দ্দশ্চ পিজুভেদশ্চ তিক্তকঃ।
অরিষ্টঃ পারিভদ্রশ্চ হিঙ্গুনির্য্যাস ইত্যপি ॥"

মহানিম্বের নাম

বাঙ্গালায়—ঘোড়ানিম

হিন্দী—বকায়ন

মহারাষ্ট্র—বকানিম্ব, কড়নিম্ব

গুজরাটী—বকান্য

কর্ণাটে—মহাবেত

তৈলঙ্গে—পেদবেয়া

তামিল—মালাইচেতু বা বেপ্পম্

ফার্সি—আজাদ্ দরলত

বীজকে—হবুল বলে।

ঔষধার্থে ইহার পত্র, পুষ্প, ত্বক্ এবং বীজ ও তৈল ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা—পত্র স্বরস—১ তোলা

ঐ চূর্ণ—/০ হইতে ।০ আনা

ত্বক্‌চূর্ণ—	ঐ
বীজ—	৵০ আনা
ক্বাথ—	৫ হইতে ১০ পর্য্যন্ত

গুণাবলী

সাধারণতঃ—

ইহা—শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, কটুবিপাক, অগ্নি ও বায়ুনাশক এবং অহৃদ্য।

ইহা—শ্রান্তি, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমি কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও প্রমেহনাশক।

"নিম্বঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী কটুপাকোঽগ্নিবাতনুৎ।
অহৃদ্যঃ শ্রম-তৃট্-কাস-জ্বরারুচিক্রিমিপ্রণুৎ।
ব্রণ-পিত্ত-কফ-চ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠ-হৃল্লাসমেহনুৎ॥"

নিম্বপত্রের গুণ—

ইহা—চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্দ্ধক ও কটুবিপাক।
ইহা—ক্রিমি, পিত্ত, বিষ, সর্ব্বপ্রকার অরুচি ও কুষ্ঠনাশক।

"নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্তবিষপ্রণুৎ।
বাতুলং কটুপাকঞ্চ সর্ব্বারোচক-কুষ্ঠনুৎ।"

নিম্বফলের গুণ—

"নিম্বফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটু-ভেদনম্।
স্নিগ্ধং লঘুষ্ণ কুষ্ঠঘ্নং গুল্মার্শঃক্রিমিমেহনুৎ॥"

নিম্বফল—তিক্তরস, কটুবিপাক, ভেদক, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, ক্রিমি ও প্রমেহনাশক।

মহানিম্বের গুণ

মহানিম্বো হিমো রুক্ষস্তিক্তো গ্রাহী কষায়কঃ।
কফপিত্তভ্রমচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠহৃল্লাসরক্তজিৎ।
প্রমেহ-শ্বাসগুল্মার্শোমূষিকবিষনাশনঃ॥

অর্থাৎ মহানিম্ব—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত, কষায় ও ধারক। ইহা—কফ, পিত্ত, ভ্রম, কফ, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, রক্তদোষ, প্রমেহ, শ্বাস, গুল্ম, অর্শ ও ইন্দুর-বিষ-নাশক।

এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—নিমের মত উপকারী বৃক্ষ আর নাই, ইহার প্রত্যেক অংশই উপকারক। বিশেষতঃ রক্তপরিষ্কারক গুণে অদ্বিতীয়।

চুলকনা, ফোড়া, ফুস্কুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত ইহাতে নাশ করে।

ইহার পাতা পোড়াইয়া যে ছাই হয়, তাহাতে লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া চোখ উঠা, চোখে ব্যথা, এমন কি, চক্ষুর ছানিতে উপকার হয়।

ইহার ফুল জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কুলি করিলে মাড়িঘা বা পুঁজপড়া বন্ধ হয় এবং দাঁত শক্ত হয়।

ইহার মূলের ছাল—সাড়ে চারি তোলা লইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে স্ত্রীলোকের ঋতু পরিষ্কার হয়।

ইহার কচি কচি ডাল দিয়া দাঁতন করিলে দাঁত শক্ত হয়, মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি হয়।

ইহার বীজ জলে ঘষিয়া ব্রণে বা ফুস্কুড়িতে দিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

ইহার কচি পাতা ৮।১০টি প্রত্যহ চিবাইয়া খাইলে খোস, চুলকনা ভাল হয়।

ইহার ফল-ভক্ষণে দাস্ত বন্ধ হয়।

নিমের তৈল—সর্ব্বপ্রকার ক্ষত, ঘা, খোস-পাঁচড়া অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। এই তৈল বাহির করিতে হইলে বীজের শাস প্রথমতঃ বাহির করিয়া লইবে, পরে ঘানি দ্বারা তৈল বাহির করিয়া লইতে হয়।

নিমপাতার তৈল—ছয় গুণ জলে নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে থাকিতে নামাইয়া লইতে হয় এবং নিমপাতার অর্দ্ধ-পরিমাণ তিল-তৈল লইয়া তাহাতে উক্ত জল নিঃশেষ করিবে। সাবধান, যেন তৈল পুড়িয়া না যায়।

অথবা পাতার রস বাহির করিয়া লইয়া তাহার অর্দ্ধেক মাত্রা তিল-তৈল পূর্ব্বোক্ত নিয়মে যদি পাক করা যায়, তাহাতে তৈল আরও উৎকৃষ্ট প্রস্তুত হয়।

উক্ত তৈল—সর্ব্বপ্রকার ক্ষতের বিশেষ উপকারী।

নিমের মলম—

শুষ্ক নিমপাতা	।০ আনা
মুদ্রাশঙ্খ	।০
উৎকৃষ্ট মোম	।০
গব্যঘৃত	২ তোলা
তুঁতে	
গন্ধবিরোজা	
রসবৎ	৷৷০
গুগ্‌গুলু	৷৷০ পরিমাণে লইবেন

প্রথমে গব্যঘৃত ২. তোলা লইয়া একটি লৌহপাত্রে গলাইয়া উহাতে মিশাইয়া দিবেন। পরে অন্যান্য দ্রব্যগুলির চূর্ণ করিয়া মিশাইবেন। পরে একটি লোহার হাতল দ্বারা মাড়িয়া লইবেন। ইহাই নিয়মের মলম।

সকল প্রকার দুষ্ট দুরারোগ্য ক্ষত ইহার দ্বারা আরোগ্য হইবেই হইবে।

প্লেগরোগাতঙ্কে নিমপাতা—

যে সময়ে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে প্রত্যহ কতকগুলি কচি কচি নিমপাতা চিবাইয়া খাইলে প্লেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তৎসঙ্গে ২।৪টি মরিচ খাইলে আরও ভাল।

জ্বরে—নিমছাল—

নিমগাছের উপরকার শুষ্ক ছালের তলদেশে যে ছাল থাকে, তাহা চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে সিন্‌কোনা অপেক্ষা অধিক উপকার হয়।

ভাবপ্রকাশমতে—

(১) মধুসহ নিমপাতার রস সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হয়।

ক্রিমিষু—"নিম্বপত্রসমুদ্ভূতং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ ॥"

(২) **রক্তপিত্তে**—

"পটোলনিম্ববেত্রাগ্রপ্লক্ষবেতসপল্লবাঃ।

শাকার্থে শাকসাত্ম্যানাং সর্ব্বত্রৈব হিতাঃ স্মৃতাঃ ॥"

(৩) ব্রণের পোকানাশার্থ নিম তৈলসহ হিং প্রশস্ত।

(৪) নিম্ববীজে—খর্জ্জুরাদি অজীর্ণে বিশেষ উপকারী।

সুশ্রুতমতে—

(১) **কুষ্ঠরোগে**—নিমছাল ও পিক্ত পটলপাতার ক্বাথে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। পোকা জন্মাইলে নিমছালের ক্বাথ পান করাইতে দিবে।

"নিম্বক্বাথং জাতসত্ত্বং পিবেদ্বাঽপিপ্রশাম্যতি।"

(২) **দাহজ্বরে**—

"মধুফাণিতযুক্তেন নিম্বপত্রাম্ভসা তথা।

দাহজ্বরার্ত্তং মতিমান্ বাময়েৎ ক্ষিপ্রমেব চ ॥"

মধু বা গুড়সহ নিমপাতার ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইলে দাহজ্বরে উপকার হয়।

ভৈষজ্যরত্নাবলীমতে—

(১) নিমের পাতা, মূল, ছাল, ফুল ও ফল সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিয়া মিশাইবে। ইহা ঘৃত, মধু, গোমূত্র, জল, আমলকীরস বা দুগ্ধসহ সেবনে সকল প্রকার চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়।

(২) নিমপাতার পুলটিসে ক্ষতের শোষ আরোগ্য হয়। উষ্ণ জলের সহিত বাটিলে আরও ভাল।

নিম্বের ও নিষিন্দের মত তিক্ত দ্রব্য আর নাই। কিন্তু এই বঙ্গদেশের কোন এক রসিক কবি মনের দুঃখে একটি প্রবাদবাক্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেটি এই :—

নিম তেতো নিষিন্দে তেতো
তেতো মাকাল ফল।
তার চেয়ে অধিক তেতো
বোন-সতীনের ঘর॥

অর্থাৎ দুই ভগিনী সতীন হইলে আর রক্ষা নাই, সে ঘর নিম-নিষিন্দে অপেক্ষাও তেতো হইয়া থাকে।

মহুয়া

মহুয়ার সংস্কৃত নাম মধুকঃ, মধুপুষ্পঃ, মধুদ্রবঃ, ও মধুষ্ঠীলঃ ; এবং জলজ মহুয়া গাছকে মধুলকঃ বলে। এই মহুয়া গাছে একসময়ে মধুপুর পরিপূর্ণ ছিল। কেহ কেহ বলেন, সেই জন্য এই স্থানের নাম মধুপুর হইয়াছে। কথাটা কতদূর সত্য বলা সুকঠিন। তবে ইহাও সত্য যে, এখানে মধু তেমন পরিমাণে পাওয়া যায় না—যাহার জন্য ইহাকে মধুপুর বলা যায়। অথচ এখানে মহুয়া গাছ বহুল পরিমাণ আছে।

এখানকার সাঁওতালগণ এই মহুয়া গাছকে বড় ভালবাসে। ইহার পত্র, ফুল ও ফল কেবল যে গবাদি পশুর ভক্ষ্য, তাহা নহে। ইহার ফুলগুলি হইতে একপ্রকার মদ প্রস্তুত করিয়া সাঁওতালগণ অতি আহ্লাদ-সহকারে পান করিয়া থাকে।

যাহা হউক, ইহার ফুলগুলির পাপড়ি বড়ই মিষ্ট এবং রসে ভরা। তবে ইহার ফুল ফুটিলে পাপড়িগুলি আপনা আপনি ঝরিয়া পড়ে। সেই জন্য এই দেশের অধিবাসিগণ ফুল ফুটিবার পূর্ব্ব হইতে এই গাছের তলদেশটি উত্তমরূপে ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে।

প্রভাত হইতে-না-হইতে ছেলে-মেয়েরা ছোট ছোট ঝুড়ি লইয়া ইহার তলদেশে উপস্থিত হয় এবং গান গাহিতে গাহিতে হাসি হাসি মুখে ফুলের পাপড়িগুলি সযত্নে কুড়াইতে থাকে। একটু পাপড়িও নষ্ট হইতে দেয় না। সময়ে সময়ে এই সকল ফুলের পাপড়ির জন্য কলহ বা বিবাদ যে হয় না, তাহা নহে। তবে অনেক সময়েই তাহারা পূর্ব্ব হইতে নিজ নিজ গাছ স্থিরীকৃত করিয়া রাখে—এবং একজনের গাছের ফুল বা

তাহার পাপড়ি অন্যে লইতে না পারে, তাহার জন্য রাত্রি জাগিয়া পাহারাও দেয়।

এই ফুল ফাল্গুন, চৈত্র মাসে ফুটে। তখন বসন্তকাল, কাজেই রাত্রে গান-বাজনা করিয়া আমোদ-আহ্লাদের সহিত পাহারা দেয় এবং প্রভাত হইতে-না-হইতে নিজ নিজ অধিকারস্থ বৃক্ষের ফুল ও তাহার পাপড়ি কুড়াইতে থাকে।

ইংরাজী ভাষায় মহুয়াকে Bassia lalifolia বলে; তবে রপ্তানীর সময় যখন জাহাজে উঠায়, তখন Moura বা Mahua seed বলিয়া চালান দেয়। C. W. E. Cotton I. C. S. sometime Collector of Customs, Calcutta তাঁহার Hand Book of Commercial Information নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর ও পশ্চিম-ভারতেই এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং ইহার বীজও প্রচুর পরিমাণে এই সকল প্রদেশ হইতে য়ুরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে। তিনি বলেন, ইহার ফুল খুব মিষ্ট এবং এই গাছের ডাল বড় পল্‌কা।

যত পরিমাণে য়ুরোপে মহুয়া রপ্তানী হয়, তন্মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাই হইতেই অধিক, তবে লম্বা লম্বা পাতাবিশিষ্ট মহুয়া মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ হইতেই অধিক রপ্তানী হয় এবং হিমালয়ের পাদদেশে যে-সকল মহুয়া বৃক্ষ জন্মে, তাহাকে বিতিরেশিয়া বলে—সেগুলি তত ভাল নহে।

য়ুরোপীয়গণ তজ্জন্য মহুয়া দুই প্রকার আছে বলিয়া গণ্য করে। যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা বোম্বাই ও কলিকাতা বন্দর হইতে চালান হয়—আর অন্যান্য প্রদেশের মহুয়া দ্বিতীয় শ্রেণীরূপে গণ্য করে। প্রথমোক্ত গুলির ফল—পাটকিলে রং ও পীতাভাবিশিষ্ট। ইহা খুব কমই নষ্ট হয় আর অন্য প্রদেশের মহুয়া ঘোরাল পাটকিলে রঙের এবং ইহার সিকি অংশ প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। এই রপ্তানী প্রায়ই সেপ্টেম্বর মাসেই অধিক

হয়। কারণ, ইহা জুন মাসে ফলে ও সেপ্টেম্বর মাসে বাজারে চালান হয়, তবে বিলাতের লোকেরা ইহার ফল বা বীজ ক্রয় করে। কেবলমাত্র ইহা হইতে তৈল বাহির করিবার জন্যই বিলাতে ইহার আদর। এক্ষণে ইহা হইতে মোটর গাড়ীর পেট্রোল বা অন্য অন্য কলের জন্য বহুল পরিমাণে এই তৈলের চলন হইতেছে।

এই ফুল এত অপর্য্যাপ্ত ফুটে যে, একটি বৃক্ষের ফুলেই এক এক পরিবারের সমস্ত লোক ও গবাদির আহারযোগ্যস্বরূপ মাস কয়েক তাহাদের স্বচ্ছলভাবেই চলে।

আমাদের দেশে যেমন পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে স্ত্রীলোকগণ নূতন চাউলের পিঠা আস্‌কে ভাজিয়া পৌষমাস সুখকর জ্ঞান করিয়া "এস পৌষ যেও না" বলিয়া গান করে, এতদ্দেশবাসীর স্ত্রীলোকগণ মহুয়া ফুল ও তাহার পাপড়ি সযত্নে গৃহে আনিয়া শুকাইয়া লয় এবং আবশ্যকমত কিছু গুঁড়া করিয়া তাহারই রুটি, পিঠা বা চাপাটি তৈয়ারী করিয়া সপরিবারে মিলিয়া উদর পূরিয়া আহার করে এবং প্রথম দিনটাকে তাহারা একটি উৎসবের দিন বলিয়া গণ্য করে। এই সময় তাহারা সমস্ত দিন-রাত্র গীত-বাদ্য, নাচ ও ক্রীড়া-কৌতুকে কাটায়।

একটা বড় গাছ হইতে প্রত্যেক বৎসর ৮।১০ মণ ফুল সংগ্রহ করা যায়। তাহার পর যখন ফল হয়—তাহাও সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে তৈলও বাহির করে। পূর্ব্বে ইহারা ঐ তৈল জ্বালানীরূপেই ব্যবহার করিত, কিন্তু এক্ষণে দুষ্ট লোকের পরামর্শানুযায়ী ঘৃতেও ভেজাল দিতে আরম্ভ করিয়াছে। টাট্‌কা অবস্থায় ইহার গন্ধও ঘৃতের মত সুন্দর। কিন্তু কিছুদিনের বাসী হইলেই ইহা হইতে একটা দুর্গন্ধ বাহির হয়। সেই জন্য ইহারা টাটকা রসই ঘৃতে ভেজাল দিয়া বাজারে ভেজাল ঘৃত বিশুদ্ধ ঘৃত বলিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হায়, এমন সরল লোকগুলিও

আমাদের দুষ্ট ব্যবসায়িগণের শিক্ষকতায় কিরূপ পিশাচে পরিণত হইতেছে, ভাবিলেও মনে মনে আধুনিক সভ্যতাকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতে হয় এবং মনে ভয়েরও উদ্রেক হয়। ভবিষ্যতে তারও কি হয়, কে বলিবে।

তবে ফল অপেক্ষা ফুলের আদর অধিক। তাহারা ইহার পাপড়ি কাঁচা খায়, রুটি পিঠা করিয়া খায়, গরু-বাছুরকে খাইতে দেয়। গাভীগণও এই ফুল খাইয়া প্রচুর পরিমাণে সুস্থভাবে দুগ্ধ প্রদান করে। আমাদের দেশে যেমন গাভীগণকে দোহনকালে খোল বা ভুষি দেয়, তেমনি এতদ্দেশীয়েরা দোহনের সময় গাভীকে ঝুড়ি করিয়া মহুয়া ফুলের পাপড়ি দিয়া থাকে। তবে তজ্জন্য দুগ্ধে অল্প অল্প মহুয়ার গন্ধও পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম আমাদের একটু দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে কিন্তু সহ্য হইয়া গিয়াছে।

মধুপুরে গ্রীষ্মের সময় ঘাস পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে, কাজেই গাভীগণ যথোচিত খাদ্যাভাবে শীর্ণ হইয়া আসে। তবে যাহারা প্রচুর পরিমাণে মহুয়া ফুল সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাদের গাভীগুলি বেশ মাংসল দেখায় এবং দুগ্ধও প্রচুর দেয়।

এই সকল কারণেই এতদ্দেশীয় অধিবাসিগণ মহুয়া গাছকে বড় আদর করে। তবে এই আদর কেবল ফুল ও ফলের সময়। অন্য সময়ে ইহার পত্রাদি ছিঁড়িয়া লইয়া গবাদিকে দেয় এবং সময়ে সময়ে ইন্ধনের কাষ্ঠের জন্য শাখা-প্রশাখাগুলি যথেচ্ছাক্রমে কাটিয়া লইয়া রন্ধনকার্য্য সমাধা করে। এই দেশের জমিদার বা রাজা পয়সার লোভে এই সব মহয়া গাছ বিক্রয় করিয়া ফেলে। তাহার ফলেই মধুপুরে মহুয়া গাছের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

তবে যাহাদের একটু অবস্থা স্বচ্ছল, তাহারা নিজ নিজ গৃহের প্রাঙ্গণে মহুয়া গাছ আজকাল সযত্নে রোপিত করিয়া রাখিতেছে।

কেবল যে মধুপুরেই মহুয়া গাছ পাওয়া যায়, তাহা নহে, বাঁকুড়া, সিংভূম ও ছোটনাগপুর জেলাতেও মহুয়া গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের মুদ্রিত রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর জার্ম্মাণীর সহিত ফরাসীদের যুদ্ধ বাধিয়াছিল, সেই বৎসর মহুয়া-বীজ বহুল পরিমাণে ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। অর্থাৎ

জার্ম্মাণীতে	২৮,৩৮৪ টন	মূল্য ৩০৯, ৭৯১ পাউণ্ড
বেলজিয়ামে	৪,৪৩৯ টন	„ ৪৮,৫৯৬ „
ফরাসীদেশে	৪২৫ টন	„ ৪,৬৯৬ „
হলাণ্ডে	৫০ টন	„ ৫৩৩ „
ইংলণ্ডে	১ টন	„ ১৭ „
মোট	৩৬,২৯৯ টন	মূল্য ৩৬৩,৬৩৪ পাউণ্ড

কিন্তু তাহার পর হইতে ক্রমেই রপ্তানী বাড়িয়া যাইতে লাগিল, অর্থাৎ

১৯১৫-১৬ খৃঃ	৪,২০০ টন
১৯১৬-১৭ „	৩,৯০০ টন
১৯১৭-১৮-১৯	অতি অল্পই রপ্তানী হইয়াছিল।

মধ্যপ্রদেশে এই মহুয়া হইতে এখন একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হইতেছে, তবে কোম্পানীর অধীনে গবর্ণমেণ্টের লোক পরিদর্শন জন্য নিযুক্ত আছে।

আজকাল যে Vegetable Ghee বলিয়া ভারতে জার্ম্মাণ হইতে ঘৃত আসিতেছে—তাহা এই মহুয়াবীজ হইতেই উৎপন্ন। আর সেই ঘৃতই ভারতের সর্ব্বত্র আদরের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে।

এই ত গেল বিলাতের ব্যবসা ও বিলাতের রপ্তানীর কথা। কিন্তু আমাদের দেশেও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে মহুয়ার কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত

আছে। তবে তাঁহারা ইহার উপকারিতার দিক্ দিয়াই পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ভেজালের জন্য নহে।

এই বৃক্ষ যখন ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে, তখন আমাদের জানা উচিত, কোন্ কোন্ প্রদেশে ইহার কি কি নাম—

তাই স্থানভেদে নামভেদ দেওয়া যাইতেছে—

সংস্কৃতে—মধুকো গুড়পুষ্পঃ স্যান্মধুপুষ্পো মধুদ্রবঃ।
বানপ্রস্থো মধুষ্ঠিলো জলজে তু মধূলকঃ॥

অর্থাৎ সংস্কৃতে মহুয়ার পর্য্যায়—মধুক, গুড়পুষ্প, মধুপুষ্প, মধুদ্রব, বানপ্রস্থ ও মধুষ্ঠিল—আর জলজ মহুয়াকে মধূলক বলে।

হিন্দীতে—মহুয়া ও জলমহুয়া; তামিলে—বাঠইল্লুপি; তৈলঙ্গে—ইপ্প, পিন্না, বোম্বাইয়ে—মোহা; মহারাষ্ট্রে—মোহাচা বৃক্ষ, মোহ বৃক্ষ, জল মোহা: গুজরাটে—মহড়া, জল মহড়া; কর্ণাটে—মুহইপ্পে, যরভুইপ্পে; ফার্সিতে—চকাং; ইংরাজীতে—Elloopa tree; ডাক্তারী নাম—Bassia latifolia.

উভয় বৃক্ষের (জলজ ও স্থলজ) পুষ্পের গুণ একইরূপ।

"মধুকপুষ্পং মধুরং শীতলং গুরু বৃংহণম্।
বলশুক্রকরং প্রোক্তং বাতপিত্তবিনাশনম্॥"

অর্থাৎ ইহার পুষ্প—মধুররসবিশিষ্ট, শীতবীর্য্য, গুরু, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক ও বাতপিত্তবিনাশক।

আর বৈদ্যগণ ইহাতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বায়ু ও পিত্ত-দোষ দমনার্থে ব্যবহার করেন।

আর মহুয়া ফলের গুণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"ফলং শীতং গুরু স্বাদু শুক্রলং বাতপিত্তনুৎ।
অহৃদ্যো হন্তি তৃষ্ণাস্র-দাহ-শ্বাস-ক্ষতক্ষয়ান্॥"

অর্থাৎ ইহার ফল—শীতবীর্য্য, গুরু, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, অহৃদ্য এবং ইহা—বায়ু, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, শ্বাস, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশ করে।

ইহার মাত্রা—চারি আনা মাত্র।

অন্যদিকে আমরা দেখিতে পাই যে, দার্জ্জিলং, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে যে-সকল মদের ভাটিখানা আছে, সেখানে মহুয়া হইতে মদ প্রস্তুত হইতেছে। বেহার প্রদেশেও ইহার মদ বেশ স্বচ্ছল।

মদ প্রস্তুত করিবার প্রণালী—প্রথমতঃ ফুলগুলি শুষ্ক করিয়া তার-পর পেষণ করিতে হয় এবং ঐরূপে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় তাহা গরম জলে চটকাইতে হয়। পরে ভাল করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। তাহার পর ইহাতে "ইষ্টাম্ব" নামক দ্রব্য মিশাইয়া সুরা প্রস্তুত করে; তবে ৫০ ডিগ্রী আন্দাজ উত্তাপ আবশ্যক। কেহ কেহ বা ৩।৪ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া যখন গাজিয়া উঠে, তখন উহা চোলাই করিয়া লয়। সাঁওতাল-গণও এইরূপেই মদ প্রস্তুত করে এবং তাহাদের বিবাহাদি উৎসবে এই মদ পান করিয়া ৩।৪ দিন অনবরত সস্ত্রীক গান-বাজনা করিয়া আনন্দস্রোতে ভাসিয়া যায়।

কোন কোন ইংরাজ বলিতেছেন যে, ইহা হইতে যে মদ প্রস্তুত হয়, তাহা আইরিস হুইস্কির মত—তবে ইহাতে যে একটা ধুঁয়াটে গন্ধ ছাড়ে, তাহার জন্য সাহেবরা উহা পান করিতে চায় না।

এক্ষণে সুদক্ষ রাসায়নিক পণ্ডিতগণ স্থির কয়িয়াছেন যে, ইহার তৈলভাগ নষ্ট করিতে পারিলেই ইহার দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া যাইবে। আশা করা যায়, সুচতুর বৈজ্ঞানিকগণ অনতিবিলম্বেই ইহা হইতে বিলাতীর মত উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত করিয়া ভারতবাসীকে পান করাইয়া আপনাদিগকে কোটিপতি করিতে সমর্থ হইবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিলাতে ইহার বীজ হইতে এক প্রকার স্পিরিট প্রস্তুত করিতেছে—যাহা দ্বারা তাহারা সচরাচর কল-কব্জা অল্প খরচে চালাইতে পারে এবং মোটরের জন্য অল্প পরিমাণে পেট্রোলও প্রস্তুত হইতেছে। তবে কি উপায়ে যে ঐ সকল স্পিরিট প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আমরা অবগত নহি।

যে বৃক্ষের উপকারিতা এত অধিক, তাহার যে আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে দুঃখের বিষয়, কি মধুপুর, কি ছোটনাগপুর, কি মধ্যপ্রদেশ সর্ব্বত্রেই মারবারিগণের হস্তেই আমদানী ও রপ্তানীর ভার, সুতরাং লভ্যাংশও তাহাদের সিন্দুকে যাইতেছে—আর আমাদের ভ্রাতারা মিটিমিটি চক্ষে তাহাই দেখিয়া সুখানুভব করিতেছেন।

বিশেষতঃ যে উপায়ে জার্ম্মাণগণ এই মহুয়া-বীজ, ফল ও ফুল হইতে vegetable ঘি প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার ঘৃত কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিতেছে, তাহা অবগত হইবার চেষ্টা করাই এক্ষণে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ম্ম।

হায়! আমাদের মধ্যে কি এমন কেহ নাই, যিনি এই সকল তথ্য সম্যক্‌প্রকারে অবগত হইয়া—দেশের ও দশের উপকার করিয়া নিজেও লক্ষপতি এবং পরে কোটিপতিও হইতে সমর্থ হইবেন?

অভাব হইলেই তাহার পূরণের জন্য অনেকের চেষ্টা ও উদ্যম হইয়া থাকে। তাই আশা আছে, আমাদের মধ্যেও অচিরে এমন কতকগুলি সুশিক্ষিত যুবক বাহির হইবেন, যাঁহারা কালে এই সকল বিষয়ে অগ্রণী হইয়া যথার্থই দেশের ও দশের মঙ্গল করিতে সমর্থ হইবেন।

ইহার কাণ্ড হইতে উৎকৃষ্ট কাষ্ঠও পাওয়া যায়। সচরাচর এক একটি গাছে ৫ মণ হইতে ১০ মণ পর্য্যন্ত মোল পাওয়া যায়, এবং গাছ শুষ্ক

হইলে তাহা হইতে অধিক কাষ্ঠ পাওয়া যায়, ইহাও বেশ মজবুত—আর যেগুলি পল্‌কা, সেগুলিও ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হয়।

সেই জন্য আজকাল অনেকেই এই সকল অঞ্চলে নিজ উদ্যানে মহুয়া গাছ লাগাইতেছেন। ইহাতে গবাদির খাদ্য অনায়াসেই পাওয়া যাইবে, তবে ইহার গাছ অধিক দিন বাঁচে না, শুষ্ক হইলে ইন্ধনকার্য্যেও লাগিতে পারিবে।

তবে যাঁহাদের উদ্যান বন-জঙ্গলের অতি সন্নিকটে অবস্থিত, তাঁহাদের একটি ভয় আছে—যে সময়ে মহুয়া-ফুল ঝরিতে থাকে, সেই সময় বনভল্লুক-গণ দলে দলে আসিয়া মহুয়া গাছ দখল করিয়া বসে। তজ্জন্য বাগানের চারিধারে কাঁটা গাছ দিয়া বেড়া দেওয়াই এক প্রকৃষ্ট উপায়। কারণ, ভল্লুকগণ প্রাচীর বাহিয়া অনায়াসে উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহুয়া ফুল ও ফল খাইতে পারে। এই জন্য সাঁওতালগণ যখন মহুয়া গাছ পাহারা দেয়, তখন রাত্রিকালে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাখে এবং রাত্রে বাজনা-বাদ্য করিয়া সারানিশি জাগিয়া বসিয়া থাকে।

বিল্ব

বিল্বকে বাঙ্গালায় বেল বলে। বেলের মত পবিত্র বৃক্ষ হিন্দুর নিকট আর নাই। বিশেষতঃ শৈব ও শাক্তদিগের নিকট বেল সমাদৃত। মহাশক্তির আবাহন বিল্বমূল ভিন্ন অন্যত্র সংসাধিত হয় না। শিবপূজায় ও মহামায়ার পূজায় সচন্দন বিল্বপত্রই প্রধান উপাদান।

ঔষধার্থেও ইহার ফল, পত্র, ত্বক্ ও মূল ব্যবহৃত হয়। পত্রস্থ রসের মাত্রা ১।২ তোলা, ত্বকের ক্বাথ ৫।১০ তোলা, বেলশুঁঠ-কল্ক (চূর্ণ বা শিলায় পেষণ করিয়া) ৷৷০ আনা।

ভাষা ও স্থানভেদে নামভেদ—

বাঙ্গালায়—বেল

হিন্দীতে—বেল্

মহারাষ্ট্রীয়—বেল, বেলকঠ্‌ঠ, বিল

গুজরাটী—বিলোবিলু

তৈলঙ্গী—মারেডী, চান্দবিল্ব

তামেলী—বিল্বপঝাম্

কর্ণাটে—বেললু

আরবী—সফরজলহিন্দী

আসামে—বেল

ইংরাজী—Bael fruit.

ল্যাটিন—Aegle Mramelos.

সংস্কৃতে—"বিল্বঃ শাণ্ডিল্যঃ শৈলূষো মালুরশ্রীফলাবপি।"

বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলুর, মালূষ ও শ্রীফল। ইহাকে ত্রিপত্র, গব্যপত্র ও মহাফলও বলে।

কচি বেলকে—বিল্বকর্কটী ও বিল্বপেষিকা বলে।

"বালং বিল্বফলং বিল্বকর্কটী বিল্বপেষিকা।"

কচি বেলের গুণ—

"বালং বিল্বফলং গ্রাহি দীপনং পাচনং কটু।
কষায়োষ্ণং লঘু স্নিগ্ধং তিক্তং বাতকফাপহম্॥"

ইহা—ধারক, অগ্নিদীপক, আমের পাচক, কটুকষায়তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও কফনাশক।

চরকমতে—

১। জ্বররোগীর মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হইলে ক্ষীরপরিভাষানুসারে পক্ক বেলশুঁঠের ক্বাথ পান করাইলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

২। অথবা অর্শরোগী বলির শূলে কাতর হইলে ঈষৎ উষ্ণ বিল্ব-মূলের ক্বাথে বসাইয়া রাখিলে যন্ত্রনা দূর হয়।

চক্রদত্তমতে—

১। অতিরিক্ত ঘাম হইয়া যাহার শরীরে দুর্গন্ধ হয়, বিল্বপত্ররস তাহার গাত্রে মর্দ্দন করিলে সেই দুর্গন্ধ দূর হয়।

২। গ্রহণীরোগাক্রান্ত রোগীকে বেলশুঁঠচূর্ণ কিঞ্চিৎ শুন্ঠীচূর্ণযোগে পুরাতন ইক্ষুগুড়সহ সেবন করিতে দিবে এবং তৎপরে ঘোল পান করিতে দিবে।

৩। বিল্বমূলত্বকের ক্বাথ শীতল করিয়া তাহাতে মধু দিয়া পান করিলে বমন প্রশমিত হয়।

৪। বেলশুঁঠের ক্বাথ সেবন করাইলে রক্তার্শঃ রোগ আরোগ্য হয়।

৫। বিল্বপত্রের রস মরীচচূর্ণসহ পান করিলে শোথ আরোগ্য হয়।

৬। বেলশুঁঠ গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক তৎকল্ক এবং ছাগদুগ্ধসহ যথা-বিধি তিল তৈল পাক করিয়া সেই তিল তৈল কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিলে বধিরতা দূর হয়।

কাঞ্জিকা সহ বিল্বের গুণ

"কাঞ্জিকে সংস্থিতং বিল্বমগ্নিসন্দীপনং পরম্।
হৃদ্যং রুচিকরং প্রোক্তমামবাতবিনাশনম॥"

কাঞ্জিকা সহ বিল্ব পানে অগ্নিবৃদ্ধি করে, ইহা হৃদ্য, রুচিকর এবং আমবাত বিনাশক।

প্রয়োগ

ভাবপ্রকাশমতে—

কাঁচা বেল পোড়াইয়া গুড়ের সহিত খাইলে রক্তাতিসার, আমশূল ও বিবন্ধ আরোগ্য হয় এবং কুক্ষিরোগ বিনষ্ট হয়।

"গুড়েন ভক্ষয়েৎ বিল্বং রক্তাতিসার নাশনম্।
আমশূল-বিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগহরং পরম্॥"

সুশ্রুতমতে—

(১) স্কন্দগ্রহাক্রান্ত শিশুকে বিল্বকণ্টকের মালা ধারণ করাইলে আরোগ্য হয়।

(২) বেলশুঁঠ ও যষ্টিমধু চাউলের জলে পেষণ করিয়া চিনি ও মধু যোগে পান করিলে পিত্তরক্তোত্থিত অতিসার আরোগ্য হয়।

"বিল্বমধ্যং সমধুকং শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতম্।
তণ্ডুলাম্বুযুতো যোগঃ পিত্তরক্তোত্থিতং জয়েৎ।"

বঙ্গসেনমতে—

বিল্বমূল-ত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত চিনি ও খৈ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে শিশুর বমন ও অতিসার আরোগ্য হয়।

"বিল্বমূলকষায়েন লাজাশ্চৈব সশর্করাঃ।
আলোড্য পায়য়েদ্ বালং ছর্দ্দ্যতিসারনাশনম্।"

পক্ক বেলের গুণ—

রাজবল্লভমতে—পক্বং সুগন্ধি মধুরং দুর্জ্জর গ্রাহি দোষলম্।

ইহা সুগন্ধি, মধুর, দুর্জ্জর, গ্রাহী, দোষল।

"পক্বং গুরু ত্রিদোষং স্যাৎ দুর্জ্জরং পূতিমারুতম্।
বিদাহী বিষ্টম্ভকরং মধুরং বহ্নিমান্দ্যকৃৎ॥"

ইহা গুরু, ত্রিদোষজনক, দুষ্পাচ্য, পূতিবায়ুজনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, মধুর ও অগ্নিমান্দ্যকর।

বিল্বমূলের গুণ—

"বিল্বমূলং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং লঘু বাতনুৎ।"

বিল্বমূলে ত্রিদোষ নাশ করে, ইহা মধুর, লঘু ও বাতনাশক।

বিল্বপেষিকার গুণ—

"কফবাতামশূলঘ্নঃ গ্রাহিণী বিল্বপেষিকা।"

বিল্বপত্রের গুণ—

"তৎপত্রং কফবাতামশূলঘ্নং গ্রাহি রোচনম্।"

ইহার পত্রে কফ, বাত, শূল নাশ করে, ইহা রুচিকর ও গ্রাহী।

বিল্বফুল—

"নিহন্যাদ্ বিল্বজং পুষ্পমতিসারং তৃষাং বমিম্।"

বিল্বপুষ্পে অতিসার, তৃষ্ণা ও বমি নাশ করে।

বিল্বতৈল—

"বিল্বমজ্জাভবং তৈলমুষ্ণং বাতহরম্ পরম্।"

বিল্বমজ্জা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাতে বাত নাশ করে এবং উহা উষ্ণ।

মুষ্টিযোগ—

১। বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল ও গনিয়াবি ইহাদের ক্বাথ বাতজ্বরে বিশেষ উপকারী। ইহা দীপন, বাত ও কফনাশক। ইহাকেই বৃহৎ পঞ্চমুল বলে।

২। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারি ও গোক্ষুর—ইহাদের ক্বাথে বাত ও পিত্ত নাশ হয়।

৩। দশমূল, চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ ও শুঁঠের ক্বাথ পান করিলে সন্নিপাতজ্বরে উপকার পাওয়া যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কার আবশ্যক হইলে উহাতে তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবে।

৪। বেলপাতার রস গোলমরিচচূর্ণসহ কামলা রোগে ব্যবহার্য্য।

৫। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মুথা ও আতিস—ইহাদের ক্বাথ সেবনে পিত্তাতিসার আরোগ্য হয়।

৬। বেলপাতার রস মধুসহ সেবন করিলে জ্বর নাশ করে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে।

বিল্বতৈল-প্রস্তুত-প্রণালী—

১। বেলশুঁঠ—১০০ পল, জল—৬৪ সের সহ পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নাবাইবে এবং তিলতৈল ৪ সের দুগ্ধ ৪ সের, ধাইফুল, কুড়, শুঁঠ, রাস্না, পুনর্নবা, দেবদারু, বচ, মুথা, লোধ ও মোসব্বর প্রত্যেকটি ৬ সের দিয়া তৈল পাক করিতে হইবে।

ডাক্তারীমতে—

২। যাহাদের প্রায়ই কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, তাহাদের পক্ষে সুপক্ক বেল বিশেষ উপকারী।

২। পাকা বেলের পানা গ্রহণীরোগে উপকারী।

৩। বেলের মোরব্বা—অতিসার ও রক্তাতিসারের মহৎ ঔষধ।

৪। বেলপাতার রস—পিত্ত ও জ্বরনাশক।

৫। ওলাউঠা প্রাদুর্ভাবের সময় প্রত্যহ বেলের পানা সেবনে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না।

৬। ইহা সেবনে অর্শরোগ উপশম হয়। এমন কি, সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়।

৭। বেল খাইয়া জলপান নিষিদ্ধ।

৮। পুরাতন জ্বরে বেল নিষিদ্ধ।

বেলের সরবৎ—

কাঁচা বেল কুটিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে মিছরী মিশাইয়া পাক করিলে সরবৎ প্রস্তুত হয়। ইহা বলকারক ও পেটের বিশেষ উপকারী।

শাস্ত্রের কথা—

শিবরাত্রির কথায় আছে—

শ্রীভগবান্ উবাচ।

"একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাৎ **বিল্বপত্রস্ত**থৈকতঃ।
মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা।
ন তথা জায়তে প্রীতির্বিল্বপত্রৈর্যথা মম॥"

সর্ব্ববিধ পুষ্পরাশি একদিকে গণি
অন্যদিকে **বিল্বপত্রতুল্য** মনে মানি।
মণি রত্ন প্রবাল বা স্বর্ণপুষ্পে তথা
না হয় সন্তোষ মম বিল্বপত্রে যথা।

তাহার পর ব্যাধের পূজায় সদাশিব কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—

দৈবযোগে সেই বিল্ববৃক্ষের মূলেতে
ছিল এক শিবলিঙ্গ বহুদিন হতে।

* * * * *

তাহার অঙ্গেতে লাগি হিম-জলভরে
পক্ক বিল্বদল এক পড়ে লিঙ্গোপরে।

ইহাতেই শিব তাহার উপর এমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, ব্যাধ হইয়াও অনায়াসে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শাক্তগণ বলেন—

পার্ব্বত্যুবাচ।

(দুর্গা দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন)

"যোগমধ্যে পুষাহঞ্চ পুষ্পে কৃষ্ণাপরাজিতা।
পত্রে মালূরপত্রঞ্চ পীঠে যোনিস্বরূপিণী॥"

"আমি—যোগের মধ্যে পুষা, পুষ্পের মধ্যে কৃষ্ণা অপরাজিতা এবং পত্রের মধ্যে বিল্বপত্র।"

আবার পূজোপকরণমধ্যে বিল্বপত্রের স্থান সর্ব্বোচ্চে, তাই শ্রীশঙ্করাচার্য্যদেব তাঁহার বিরচিত শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রে লিখিয়াছেন—

"হে দেব, আমি স্নানবিধি অনুসারে প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কখনও পূজার্থ গঙ্গাজল আহরণ করি নাই, কোন অরণ্যমধ্যে গমনপূর্ব্বক বিল্বদল আহরণ করি নাই * * * হে শিব, হে শম্ভো, হে মহাদেব, আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন।"

"স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিদ্বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বদলানি।
*　*　*　*
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো॥"

এবং তন্ত্রসারাদি গ্রন্থে দেখা যায়—

সচন্দন বিল্বপত্র ব্যতিরেকে মহামায়া পূজা গ্রহণ করেন না।

অন্যদিকে আমরা আবার দেখিতে পাই—

দুর্গোৎসব উপলক্ষে সপ্তমীপূজার পূর্ব্বে যে নবপত্রিকা-প্রবেশের নিয়ম আছে, সেই নবপত্রিকা এই—

কদলী, দাড়িম্ব, ধান্য, হরিদ্রা, কচু, মানকচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তী —এই নয় পত্রযুক্তা স্ত্রীমূর্ত্তি এবং তৎসহ দুইটি বিল্বফলও দিতে হয়।

ইহার পরও কি বলিয়া দিতে হইবে যে, শক্তিপূজায় বিল্বপত্র ও বিল্বফল পূজোপকরণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে?

বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—

কমলাদেবী প্রত্যহ সহস্র পদ্ম দ্বারা মহাদেবের পূজা করিতেন। একদা তিনবার গণনা করিয়াও দেখিলেন যে, দুইটি পদ্ম কম হইতেছে। তখন লক্ষ্মীদেবী নিতান্ত কাতর-মনে স্থির করিলেন, শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং আমার স্তনদ্বয়কে যখন পদ্ম বলিয়া উল্লেখ করেন, তখন এই স্তনপদ্মদ্বয় কর্ত্তন করিয়া মহাদেবের পূজা সমাপন করি। এইরূপ স্থির করিয়া প্রথমতঃ বামস্তন অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া মহাদেবের মস্তকে প্রদান করিলেন। তাহার পর যখন দক্ষিণ স্তন কাটিবার জন্য উদ্যতা হইলেন, তখন মহাদেব স্বর্ণলিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন—কমলা, তোমার দ্বিতীয় স্তন ছেদন করিবার আবশ্যক নাই। আমি তোমার ভক্তিতে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি এবং তোমার ছিন্ন স্তনটি যাহা আমার মস্তকে দিয়াছ, তাহা অবনীতলে

শ্রীফল নামে পুণ্যপ্রদ বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হউক এবং শ্রীফলবৃক্ষই তোমার মূর্ত্তিমতী ভক্তিতুল্য জানিবে। যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, তত দিন তোমার এই কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। এই বৃক্ষ আমার অতিশয় প্রিয় বলিয়া অবনীতলে প্রসিদ্ধ থাকিবে। এমন কি, এই বৃক্ষপত্র ব্যতীত কখনও আমার পূজা হইবে না। লক্ষ্মীদেবী ইহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত প্রীতা হইলেন।

বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে বিলবৃক্ষের অবনীতলে অবির্ভাব হয়। সেই মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে তথায় সমাগত হন। তখন সকলে অবলোকন করিলেন যে, এই বৃক্ষ স্নিগ্ধ শিবস্বরূপ ও স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান ; এবং বৃক্ষ ত্রিপত্রে পরিশোভিত।

ভগবান্ বিষ্ণু তখন এই বৃক্ষের একবিংশ নাম হউক বলিয়া ঘোষণা করিলেন—

বিল্ব, মালূর, শ্রীফল, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, শিব, পুণ্য, শিবপ্রদ, দেবাবাস, তীর্থপদ, পাপঘ্ন, কোমলচ্ছদ, জয়, বিজয়, বিষ্ণু, ত্রিনয়ন, বড় ধূম্রাক্ষ, শুক্লবর্ণ, সংযমী ও শ্রাদ্ধদেবক।

এই বৃক্ষের মূলদেশ হইতে শতধনুপরিমিত স্থান পরম তীর্থস্বরূপ। এই বৃক্ষের তিনটি পত্র তিনটি তীর্থতুল্য।

ঊর্দ্ধপত্র—শিব

বামপত্র—ব্রহ্মা

দক্ষিণপত্র—সাক্ষাৎ বিষ্ণু।

বিল্ববৃক্ষের ছায়া বা পত্র লঙ্ঘন ও পাদ দ্বারা স্পর্শ করা বিধেয় নহে। কারণ, লঙ্ঘনে—পরমায়ুহ্রাস ও পাদস্পর্শে শ্রীহীন হয়।

তুলসীপত্রের মত বিল্বপত্র-চয়নের সময় এই মন্ত্র পাঠ করা বিধেয়—

"পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালূর শ্রীফল প্রভো।
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্ ॥"

চয়নের পর এই বলিয়া প্রণাম করিবে—

"ওঁ নমো বিল্বতরবে সদা শঙ্কররূপিণে।
সফলানি মমাঙ্গানি কুরুষ শিব হর্ষদ॥"

অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দ্বাদশী তিথিতে এবং সায়ংকাল ও মধ্যাহ্নের সময় বিল্বপত্র চয়ন করিতে নাই।

এই বৃক্ষে আরোহণ নিষিদ্ধ এবং ইহার শাখা কখনও ভগ্ন করিবে না।

সূর্য্য ও গণেশ ভিন্ন সকল দেবতাকেই বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করা যায়।

যে স্থানে বিল্ববৃক্ষ থাকে, সে স্থান বারাণসীতুল্য জানিবে।

বাটীর ঈশান কোণে বিল্ববৃক্ষ রোপণ করিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না এবং পূর্ব্বদিকে থাকিলে সুখবৃদ্ধি হয়, দক্ষিণে শমনভয় নাশ করে এবং পশ্চিমে প্রজালাভ হইয়া থাকে; তবে বাটীর প্রাঙ্গণের মধ্যেস্থলে এই বৃক্ষ রোপণ করিবে না।

শ্মশানে, নদীতীরে, প্রান্তরে ও বনমধ্যে বিল্ববৃক্ষ থাকিলে পীঠস্থল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়।

বিল্ববৃক্ষ কখনও ছেদন করিবে না, অথবা উহার কাষ্ঠ দহন করিতে দিবে না।

চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই চারি মাস বিল্ববৃক্ষে জল সেচন করা বিধেয়।

কিন্তু বহ্নিপুরাণে লিখিত আছে—

"ভৃগো লক্ষ্মীশ্চ যা ধেনু গোরূপা সা গতা মহীম্।
তদ্গোময়ভবো বিল্বশ্রীশ্চ তস্মাদজায়ত॥"

গোরূপধারিণী লক্ষ্মী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে তাহার গোময় হইতে বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি হয়। এই বৃক্ষে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাস করেন, তজ্জন্য ইহার নাম হইয়াছে শ্রীবৃক্ষ।

আবার তন্ত্রমতে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

বিষ্ণু সরস্বতীকে অতিশয় ভালবাসিতেন, এই জন্য লক্ষ্মী মহাদেবের উদ্দেশে বহু বৎসর ধরিয়া তপস্যা করেন। তাহাতেও মহাদেব প্রীত না হওয়ায় তিনি বৃক্ষরূপে পরিণত হন, তজ্জন্য এই বৃক্ষের নাম বিল্ব-বৃক্ষ হয়।

বিল্বমহিমা

দর্শনং বিল্ববৃক্ষস্য স্পর্শনং পাপনাশনম্।
অঘোরপাপসংহার মে বিল্বং শিবার্পণম্॥ ১
ত্রিশিখৈর্বিল্বপত্রৈশ্চ অচ্ছিদ্রৈঃ কোমলৈঃ শুভৈঃ।
তব পূজাং করিষ্যামি অর্পয়ামি সদাশিব॥ ২
শালগ্রামেষু বিপ্রাণাং তড়াগদশকোটিষু।
কন্যাদানেষু যৎপুণ্যং একবিল্বং শিবার্পণম্॥ ৩
নমঃ শিবায় রুদ্রায় সর্ব্বশক্তিধরায় চ।
সর্ব্ববিদ্যায়াঃ পতয়ে ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥ ৪
নমঃ শিবায় শান্তায় সগণায় সম্ভূনবে।
সনন্দিনে সগঙ্গায় সবিষায় নমো নমঃ॥ ৫

আবার শারদীয়া মহাপূজার সময় মহামায়াকে জাগরণ করিবার জন্য বোধনের আবশ্যক, আর এই বোধন বিল্ববৃক্ষের মূলেই সম্পাদন করিতে হয়।

"ইষে মাস্যসিতে পক্ষে নবম্যামার্দ্রযোগতঃ।
শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥
ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥"

এই শারদীয়া পূজা অকালে সম্পাদিত হয়। উত্তরায়ণের সময় দেবতাগণের দিবাভাগ, আর দক্ষিণায়ণের সময় দেবতাগণের রাত্রিকাল, সুতরাং এই কালে দেবতাগণ নিদ্রিত থাকেন, তাই তাঁহাদিগকে জাগরণের জন্য এই বোধন আবশ্যক।

শাস্ত্রমতে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতেই বোধন হওয়া উচিত। কিন্তু কুলপ্রথামত ষষ্ঠ্যাদি কল্পও হয়।

তাই তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে—

"বোধয়েদ্বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং দলেষু চ।"

ষষ্ঠ্যাং বোধনে তু নক্ষত্রানুপদেশান্ন তদজ্জয় ॥

সুতরাং দেবীপূজায় বিল্ববৃক্ষের বিশেষ আবশ্যক। তাই হিন্দুর নিকট বিল্ববৃক্ষের এত আদর ও শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে হিন্দুগণ বিল্ববৃক্ষকে পূজা করিয়া থাকেন।

লাউ ও কুমড়া

লাউকে সংস্কৃত ভাষায় অলাবু বা তুম্বী বলে। ইহা দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, এক প্রকার লম্বাটে, অপরগুলা গোলাকার। লম্বা অপেক্ষা গোলাকার সুস্বাদু ও উপকারী।

ইহাকে হিন্দীতে—কদ্দু, তোম্বী, লম্বাসৌত্যা বলে।

মহারাষ্ট্রে—দুধ্যাভোংপলা।

গুজরাটে—দুধীয়ং, দুধলং।

কর্ণাটে—কড়ং বলসেয়ি।

তৈলঙ্গে—হীয়াতুখভীকায়া।

আসামে—লাও।

ফারসীতে—কদুশিরিন।

আরবীতে—যুক্তিনেহলুকবা।

ইংরাজীতে—White groud.

ল্যাটিনে—Cucwrbila Lagenrria.

ডাক্তারী—Lageuaria Vulgaris বলে।

ইহার গুণ সম্বন্ধে বৈদ্যক-গ্রন্থে লিখিত আছে—

"মিষ্টং তুম্বীফলং হৃদ্যং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু।
বৃষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টি-বিবর্দ্ধনম্॥"

আর রাজনিঘণ্টকার মতে—

"তুম্বী সুমধুরা স্নিগ্ধা পিত্তঘ্না গর্ভপোষকৃৎ।
বৃষ্যা বাতপ্রদা চৈব বলপুষ্টিবিবর্দ্ধিনী॥"

ইহা—হৃদ্য, গুরুপাক, বৃষ্য, রুচিকারক, ধাতুবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, বাতপ্রদ, কিন্তু বলকারক।

কিন্তু তিক্ত লাউয়ে উপকার করা দূরে থাক্, বিষম অপকার করে। তজ্জন্য তিক্ত লাউ কদাচ ভক্ষণ করা উচিত নহে। তবে ইহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

তিক্ত লাউকে সংস্কৃত ভাষায়—ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী, মহাফল বলে।

হিন্দীতে—তিতলোকী।
মহারাষ্ট্রে—কতুভোপলা।
কর্ণাটে—কহীগোরে।
তৈলঙ্গে—চেতি আনব।
ফার্সীতে—কটুতল্খ।
ইংরাজীতে—Bottle gourd.

ডাক্তারী নাম—Wild varieties of Lagenaria Vulgaais.

ইহার গুণ-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"কটুতুম্বী হিমা হৃদ্যা পিত্তকাস-বিষাপহা।
তিক্তা কটুর্বিপাকে চ বাতপিত্তজ্বরান্তকৃৎ॥"

ইহা পীতবর্ণ, অরুচিকর, তিক্তরস, কটুবিপাক। ইহা ঔষধার্থে এই সকল রোগে ব্যবহৃত হয়। যথা—বায়ু, পিত্ত, কাস, বিষ, পিত্তজ্বরাদিতে।

লাউয়ের ছালে তম্বুরার খোল প্রস্তুত হয়, এই জন্য ইহার নাম তুম্বী।

কুমড়া

কুমড়া দ্বিবিধ—

(১) সাঁচি বা চাল কুমড়া (White Gourd)

(২) বিলাতী বা মিঠে কুমড়া (Pumpkin)

সাঁচি কুমড়াতে যে কেবল তরকারি প্রস্তুত হয়, তাহা নয়, ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া সিদ্ধ করিয়া চিনিতে পাক করিলে যে বরফী হয়, তাহা অনেক রোগের পথ্য ও মহৌষধ। এই কুমড়া পুরাতন হইলেও নষ্ট হয় না, বরং মহার্ঘ্য মূল্যে বিক্রীত হয়। এই জন্য লোকে শিকায় করিয়া ইহা ঝুলাইয়া রাখে।

সাঁচি কুমড়ার ছোট অবস্থায় গায়ে ছোট ছোট লোমের মত থাকে; কিন্তু যতই বড় হইতে থাকে, ততই ঐ লোমগুলি শ্বেতবর্ণ গুঁড়ার মত হইয়া যায় এবং কুমড়াকে শ্বেতবর্ণ করিয়া দেয়, আর হাত দিলে হাতে ঐ গুঁড়াগুলি লাগিয়া যায়।

সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে কুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল, পীতপুষ্পা ও বৃহৎফল বলে।

হিন্দীতে—কুম্হড়া, পেঠা, কোহড়া
তৈলঙ্গে—গুম্মড়ি, পুল্লাহা, বভীবন
উৎকলে—কখারু, পীনাকখারু
মহারাষ্ট্রে—কোহবা
গুজরাটে—ভুকং কোলু
কর্ণাটে—দারকোহাল্লা
ফার্সীতে—ভূরাকদু
আরবীতে—মহদ্দেবা
আসামে—কোমরা

ইহার গুণ—কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তস্রবাতনুৎ।

ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক। পাকা সাঁচি কুমড়ার শস্য বাহির করিয়া লইয়া আমাদের স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ বড়ি তৈয়ারী করিয়া থাকেন। ঐ বড়িকে কুমড়ার বড়ি বলে। ইহা যেমন উপাদেয়, তেমনি উপকারী।

কচি কুমড়ার গুণ—

'বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্'

কচি কুষ্মাণ্ড পিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য। মাঝারি কুমড়ার গুণ—কফকারক।

পাকা কুমড়ার গুণ—

"বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু।
বস্তি-শুদ্ধিকরং চেতোরোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ॥"

অর্থাৎ—ইহা নাতিশীতল, সক্ষার, মধুররস, অগ্নিদীপক, লঘু, বস্তিশোধক এবং চিত্তবিকৃতি ও সর্ব্বদোষ-প্রশমক। ইহার ডাঁটা পাথুরী রোগে বিশেষ উপকারী। তজ্জন্য কবিরাজগণ ইহার ডাঁটা পথ্যরূপে ব্যবহার করিবার উপদেশ দেন।

বিলাতী বা মিঠে কুমড়া

ইহা বিলাতী হইলেও অধুনা আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু আধুনিক বৈদ্যকগণের মতে—ইহা অর্শ, অম্বল ও অজীর্ণরোগীর অপথ্য। ইহাতে পেট গরম করে। তজ্জন্য খাইতে হইলে অল্পমাত্রায় খাওয়াই উচিত।

চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় প্রদেশে যে বিলাতী কুমড়া হয়, তাহা দেখিতে চেপ্টা এবং অতিশয় সুমিষ্ট, এমন কি, মনে হয়—চিনি দিয়া পাক করা।

বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় বিলাতী কুমড়াকে 'সূর্য্যিকুমড়াকিম্বা ডিঙ্গিলা (ডিঙ্গি-লাউ) বলে। *

চাষ

কি লাউ, কি কুমড়া, উভয়ের জন্যই দোআঁশ-বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মাটিতে ৫।৬ হাত অন্তর একটা একটা মাদা তৈয়ার করিয়া তন্মধ্যে ৩।৪টি করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয় এবং প্রতিদিন অল্পপরিমাণে জল-সেচন করিতে হয়। মাটি সরস হইলে ২।৩ দিন অন্তর জলসেচন করিলেও চলে। তবে বর্ষার সমাগমে আর জল দিতে হয় না।

যখন গোড়ার মাটি কঠিন হইয়া যায়, তখন নিড়ান দিয়া গোড়ার মাটিগুলি আল্‌গা করিয়া দিতে হয়।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহাদের বীজ রোপণ করিতে হয়, এবং মাটিতে রোপণ করিবার পূর্ব্বে বীজগুলিকে ১০।১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়।

এ দিকে গাছের জন্য মাচান করিয়া দিতে হয়, কিম্বা ঘরের চালে তুলিয়া দিলেও চলে। মাচার উপর ফল ধরিলে প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া শিকা করিয়া দিয়া তাহার মধ্যে ফলটি রাখিয়া দিলে ভাল হয়। নতুবা ফলের ভারে গাছ ঝুলিয়া পড়ে এবং 'বাতাসের জোরে ফল ছিঁড়িয়া পড়িয়া যায়।

বিলাতী কুমড়া দুইবার রোপণ করা যায়। প্রথম জ্যৈষ্ঠ মাসে, দ্বিতীয় আষাঢ় মাসে। আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে।

---

* ডিঙ্গি-লাউ—অর্থাৎ ডিঙ্গিতে বা জাহাজে বিদেশ হইতে লাউয়ের মত যে ফল আনীত হইয়াছিল, তাহার নাম ডিঙ্গি-লাউ বা ডিঙ্গলা। ইহাকে বিলাতী কুমড়া বলে বটে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বিলাত হইতে আনীত হয় নাই। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপসমূহ হইতে আনীত হইয়াছিল।

আর এক প্রকার কুমড়া আছে, তাহাকে গিনি কুমড়া বলে। ইহা পলিযুক্ত চরভূমিতে আবাদ করিয়া থাকে। যে স্থানের জমিতে বালির ভাগ অধিক, সেইরূপ মাটিতে ইহার আবাদ প্রশস্ত। অন্যত্র ইহার আবাদ করিতে হইলে সার ও বালির ভাগ সমান করিয়া তদ্দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস ইহার বীজ-বপনের উপযুক্ত সময়।

যাহাতে গাছের গোড়ায় জল না জমিতে পায়, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, এবং বৃষ্টির জল-নিকাশের জন্য জোলা কাটিয়া দিলে ভাল হয়। এই গাছ মাটির উপরেই বর্দ্ধিত হইয়া প্রচুর ফল দেয়।

মাটিতে বালির ভাগ অধিক থাকিলে বাটীর নিকটস্থ জমিতে বীজ রোপণ করা যায়। তবে বীজ রোপণের পূর্ব্বে মাচা করিয়া সার দিয়া তবে বীজ রোপণ করিতে হয়, এবং কয়েক দিবস রীতিমত জল সেচন আবশ্যক।

আমাদের দেশে ভূঁইকুমড়া, নামে আর একজাতীয় কুমড়া জন্মে, তাহাকে সংস্কৃত ভাষায়—

"বিদারী স্বাদুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্টী সিতা স্মৃতা।
ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী॥"

এবং ইহার গন্ধ ইক্ষুর ন্যায়, এই জন্য ইহাকে ইক্ষুগন্ধা বলে।

ইহাকে হিন্দীতে—বিলাইকন্দ।
মহারাষ্ট্রে—ভূঙ্গকোহলা।
গুজরাটে—ভোকোলু।
তৈলঙ্গে—পেলগুংবুণ্ডু।
উৎকলে—ভূঁইকরবারু।
কর্ণাটে—বেলকুম্বল।

আসামে—পাতালিকোমরা

ল্যাটিন—Ipomoca dijitata

ডাক্তারী—Ipomoca digitata

ইহার গুণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা।
শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা।
গুরুঃ পিত্তাস্রপবনদাহান্ হন্তি রসায়নী॥"

অর্থাৎ ভুঁইকুমড়া—মধুররস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, মূত্রকারক, গুরুপাক, স্তন্য, শুক্র ও বলবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাধক, জীবনীশক্তি-বর্দ্ধক ও রসায়ন।

ইহার প্রয়োগ—পিত্তদোষ, রক্তদুষ্টি, বায়ুবিকৃতি ও দাহ নষ্ট করে।



পিপুল, পিপ্পলী বা পিপ্পলি

আমাদের দেশে বনে জঙ্গলে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্রই পিপুল-গাছ আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে। কেহ বা তাহার যত্ন করে, কেহ বা তাহা সংগ্রহ করে। ইহার পাতা অনেকটা পানপাতার মত।

জাতিভেদে পিপুল দুই প্রকার—একরকম সরু ও লম্বা, তাহাকে লোকে ঘোড়া পিপুল বলে। তাহার গুণ তত উপকারী নহে, সেই জন্য তাহার আদর নাই। তবে ইহা সুপক্ক অবস্থায় খাইলে মিষ্ট লাগে। পক্ষিগণ ইহা খাইতে বড় ভালবাসে।

আর যেগুলি আকারে ছোট ও মোটা, সেইগুলিই বৈদ্যকগণের মতে বিশেষ উপকারী। বাজারে বেণের দোকানে যে পিপুল পাওয়া যায়, ইহা এই জাতীয়। সুপক্ক পিপ্পলী-ফলগুলি তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বাজারে বিক্রীত হয়। পিপুল অযতনের ধন হইলেও ইহার গুণ অশেষ।

গুণ ঃ—স্বাদে কটু, কিন্তু গুণে স্নিগ্ধ, লঘু, রেচক, বলকারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক এবং ঔষধবিশেষের সহিত ব্যবহার করিলে রসায়ন, অনুষ্ণ ও অগ্নিদীপ্তিকারক। সাধারণতঃ লোকের কাসি হইলে ইহার লতা জাল দিয়া গোলমরিচ সহ সেবন করে। অধিকাংশ সময়ে বিশেষ উপকারও পাওয়া যায়। আর পৌষ মাসে যখন ইহার ফল পাকিয়া উঠে, ইহা তখন দেখিতে বেশ মনোরম বলিয়া বোধ হয়। ফল পাকিলে ১০।১৫ দিনের মধ্যে লতা শুকাইতে আরম্ভ করে। সেই জন্য সাধারণে কোন শিশুকে পাকামো করিতে দেখিলে বলে, ইহার পিপুল পেকেছে—অর্থাৎ ইহার পতন শীঘ্র।

এই পিপুল কবিরাজী ঔষধে খুব বেশী ব্যবহৃত হয়, সেই জন্য ইহার মূল্য বাজারে বড় কম নহে। সচরাচর ৪০৲। ৫০৲ টাকা মণে বিক্রীত হয় —আবার কখনও কখনও শতাবধি টাকায়ও পাওয়া যায় না।

ইহার চাষ করিলে বেশ লাভ হয়। উৎকৃষ্ট উপায়ে চাষ করিলে ফলগুলি বেশ সুপুষ্ট হয় এবং বাজারে খুব অধিক দামে বিক্রয় করা যায়। বিঘা প্রতি অন্ততঃ পাঁচ ছয় মণ পিপুল উৎপন্ন হইতে পারে। অথচ ইহার চাষে অতি অল্পই খরচ ও অধিক পরিশ্রম আবশ্যক করে না এবং ইহা বাজারে লইয়া যাইবামাত্র পড়িতে পায় না। সুতরাং পিপুলের চাষ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে।

চাষ—একটু উঁচু জমিতেই পিপুল-লতা ভাল জন্মায়। আর মাটি দোআঁশ হইলেই ভাল হয়। কারণ, ইহার মূলে জল বসিলে লতা শুকাইয়া যায় এবং ইহার মূল পচিয়া যায়। আবার গোড়া একেবারে শুকাইয়া গেলে লতাও শুকাইয়া যায়। সেই জন্য ইহা একদিকে যেমন এঁটেল মাটিতে ভাল জন্মে না, অপর দিকে বেলে মাটিতে ভাল হয় না। যে লতাগুলি সচরাচর বনে জঙ্গলে জন্মে—তাহার ফল পাকিলেই শুকাইয়া যায় বটে, কিন্তু রীতিমত চাষ করিয়া প্রতি বৎসর ফল পাকিবার পর কাটিয়া দিলে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ডাল-পালা বাহির হয় এবং এইরূপে ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত বিনা চাষে ও স্বল্প যত্নে বিঘা প্রতি প্রায় ২০০৲।২৫০৲ টাকা লাভ হয়। আমরা কৃষিকর্ম্মকে ঘৃণা করি বলিয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা। নহিলে যাহার ১০।১২ বিঘা জমি আছে, তাহার আবার পেটের জন্য ভাবনা কিসের? বাটীতে বসিয়া বৎসরে ২০০০৲, ২৫০০৲ টাকা উপার্জ্জন হইতে পারে।

পিপুল-লতার গাঁট পুতিলে তাহা হইতে নূতন গাছ বাহির হয়। ইহাকেই লোকে বীজ বলে। বাস্তবিক কিন্তু ফলের বীজ হইতে ভাল

গাছ জন্মে না। নিম্নভূমিতেই প্রায় ধান্যের চাষ হয় এবং অল্প উচ্চ ভূমিতে পাটের চাষ হয়। কিন্তু যে সকল স্থান তদপেক্ষা উচ্চ, সেখানে না ধান জন্মে, না পাট হয়; সুতরাং সেইরূপ ভূমিতে পিপুলের চাষ করিলে সেইরূপ জমি হইতে বিলক্ষণ লাভ হয়।

পূর্ব্বোক্ত জমিতে পৌষ হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে ৪।৫ বার চাষ দিলে ভাল হয়, এবং চৈত্র মাসের শেষ বরাবর লতার গাঁট সংগ্রহ করিয়া বৈশাখের প্রথমেই পুতিতে হয়।

বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পিপুল-লতা রোপণের পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসের প্রথমেই ধঞ্চে গাছ পুতিয়া দিলে, তাহার আওতায় পিপুল লতাগুলি সত্বর বেশ সতেজ হইয়া উঠে এবং গাছ পরিপুষ্ট হইলেও ফলও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সেই জন্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, ধঞ্চে গাছ পুঁতিয়া তাহার ছায়ায় পিপুল লতার ফল যেরূপ পুষ্ট হয়, সেরূপ ধঞ্চে গাছবিহীন ক্ষেত্রে সুফল হয় না।

জমিতে চাষ দিয়া জমি প্রস্তুত হইলে ফাল্গুনের আরম্ভেই ৩।৪ হাত অন্তর ৪ ৫টি করিয়া ধঞ্চের বীজ পুতিয়া দিলে, জল পাইলেই ধঞ্চে-গাছ বাহির হইয়া পড়ে। যাহাতে ধঞ্চে-গাছ অধিক ঘন না হয়, তজ্জন্য সতেজ চারাগুলি রাখিয়া অবশিষ্টগুলি তুলিয়া ফেলা হয় এবং বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে যখন পিপুল-লতা পোতা হয়, তখন ধঞ্চে-গাছগুলি বেশ বড় ও সতেজ হইয়া উঠে, এবং তাহার আওতায় পিপুলের গেঁড়গুলি পুঁতিলে অতি শীঘ্র পিপুল-লতা বর্দ্ধিত হয়। তবে পিপুলের গেঁড় পুঁতিবার পূর্ব্বে ঐগুলি গোবর মাখাইয়া পুতিলে আরও ভাল হয়। ইহাই পিপুল-লতার সারের কাজ করে।

পিপুল-লতার গেঁড়েগুলি পুঁতিবার পূর্ব্বে কতকগুলি লতা বন হইতে তুলিয়া আনিয়া একস্থানে ২।৩ দিন জমা করিয়া রাখিয়া

পাতাগুলি ছিঁড়িয়া দিবে এবং উক্ত ডাঁটাগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ১।১॥ হাত অন্তর উক্ত লতার গেঁড়েগুলি পুঁতিয়া দিবে। তাহাতে অল্প জলসেচন করিলে অতি শীঘ্রই নূতন লতার কল বাহির হয়। আর যদি জমিতে ঘাস জন্মিয়া যায়, তাহা হইলে ঘাসগুলি আস্তে আস্তে তুলিয়া মাটি আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। ক্রমে লতাগুলি বড় হইয়া ধঞ্চে-গাছে জড়াইয়া জড়াইয়া সতেজ হইয়া বাড়িতে থাকে। তবে অধিক বড় হইলে মাঝে মাঝে জাফ্‌রি করিয়া দিলে আরও ভাল হয়। লতা যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই ফল অধিকসংখ্যক হইয়া থাকে; লাভও প্রচুর হয়। আর লতা অধিক ঘন হইলে মাঝে মাঝে দুই-একটি লতা তুলিয়া অন্যত্র পুঁতিয়া দিলে ভাল হয়, তাহা হইলে অবশিষ্টগুলির পুষ্টি অধিক হয়।

বীজ পুঁতিয়া যদি বৃষ্টির জল পায়, ভালই, নচেৎ যথোপযুক্ত জলসেচন করিতে হইবে। তবে একবার লতা তেজ করিয়া বাহির হইলে আর তাহার মার নাই। যখন লতাগুলি একটু বড় হইয়া উঠিবে, সেই সময়ে একবার জমিটি অল্পপরিমাণে খুঁড়িয়া দিলে ভাল হয়।

এদিকে পৌষ মাসের প্রারম্ভেই ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। যেমন যেমন পাকিবে, সেই অনুসারে সুপক্ক ফলগুলি তুলিতে হইবে। অপক্ক অবস্থায় ফল তুলিলে বাজারে ভাল মূল্য পাওয়া যায় না, খরিদ্দারগণ বলে—ফলগুলি মরকুণ্ডে—উহা ঔষধের উপযুক্ত নয়।

১০।১২ দিন যাবৎ ফলগুলি একে একে রৌদ্রে দিলে বেশ শুষ্ক হইয়া যায়। দানায় ভাল হয়। রৌদ্র না পাইলে ভাল দানা বাঁধে না। যে সময় পিপুলগুলি বেশ শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন ঐগুলি কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া পরিষ্কার অবস্থায় বস্তাবন্দী করিতে পারিলেই হইল। বাজারে লইয়া গেলে পড়িতে পাইবে না। ৪০৲ হইতে একশত টাকা মণ বিক্রয় হইতে পারে

এবং বিঘা প্রতি ৫।৬ মণ জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং প্রতি বিঘার ২০০৲ হইতে ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

অতএব দেখা গেল, অতি সামান্যমাত্র পরিশ্রমে ও অতি অল্প মূলধনে ধান্য বা পাট অপেক্ষা অধিক লাভ হয় এবং একবার জন্মিলে ৪।৫ বৎসর ইহার কোন যত্ন না করিলেও পূর্ব্বোক্ত অর্থই প্রদান করে। তবে পাকিবার পর গাছগুলি কাটিয়া ফেলিলে বৃষ্টির জল পাইলেই আবার নূতন গাছ বাহির হইবে এবং মাঝে মাঝে গোবর সার দিলে ভাল হয়। প্রথম যে বৎসর বীজ পুঁতিবে, সেই বৎসর বিঘা প্রতি ৪০।৫০ মণ গোবর দিলেই যথেষ্ট। আর ধঞ্চেগাছ নিস্তেজ হইলেই নূতন ধঞ্চেগাছ পুঁতিতে হয় মাত্র।

বলা বাহুল্য, ফল সংগ্রহ করিবার সময় এরূপ সাবধানে ফল তুলিতে হয়, যাহাতে লতার কোন প্রকার অনিষ্ট না হয় বা একস্থানে জড় হইয়া না যায়।

ইংরাজী ভাষায় পিপুলকে—Long pepper লঙ্গপেপার বলে।

সংস্কৃতে পিপুলের নাম—

"বৈদেহী পিপ্পলী কৃষ্ণোপকুল্যা মাগধী কণা"

এবং পিপুলমূলের নাম—

"তন্মূলং গ্রন্থিকং সর্ব্বগ্রন্থিকং চটকাশিরঃ।"

—অভিধানচিন্তামণিঃ

অর্থাৎ পিপুলকে—বৈদেহী, পিপ্পলী, কৃষ্ণা, উপকুল্যা, মাগধী ও কণা বলে এবং পিপুলের মূলকে গ্রন্থিক, সর্ব্বগ্রন্থিক ও চটকাশিরস্ বলে।

আর মিশ্রিত শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের নাম—

"ত্রিকটু ত্র্যূষণং ব্যোষম্।"

বৈদ্যকগণের মতে ত্রিকটু বড় উপকারী—

হিন্দী—পীপর,	মঃ—পিম্পঠঠা,
গুঃ—লিণ্ডীপিপল,	কঃ—হিপ্পল,
তৈঃ—পিপ্পল,	তাঃ—পিপ্পিলী,
বঃ—বঙ্গালি পিম্পরিং,	ফাঃ—পিল্‌পিল্ দরাজ,
অঃ—তারফিল,	কোচবিহারে—পিপ্‌লী।

ধন্বন্তরির নিঘণ্টুকার বলেন, পিপুল চারি প্রকার;—(১) পিপ্পলী, (২) গজপিপ্পলী, (৩) সৈংহলী, (৪) বনপিপ্পলী। যে পিপুল মগধদেশে জন্মে, তাহাকে "মাগধী" বলে। ডিমক সাহেব বলেন—য়ুরোপে যাহা পিপ্পলী বলিয়া চলে, তাহা কিছু মোটা, বেশী ঝাল এবং তাহার অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু নহে—আগাগোড়া সমান মোটা ও গোল। তাহার উপর একটু সাদা আঁভা আছে।

পিপুলের Latin নাম—Chadica Roxburghii, Peper Longum. P. Officinarum.

বৈদ্যকগণের মতে—

শ্লেষ্মাবৃদ্ধিতে মকরধ্বজের সহিত পিপুল অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়।

খক্‌খকে কাসিতে নিম্নলিখিত ঔষধ বড় উপকারী—

পিপুলপাতা ও ছাল, বাসকপাতা ও ছাল, কণ্টকারি, তেজপাতা ও যষ্টিমধু—প্রত্যেকের ।/০ ওজন লইয়া পাচনমত ১ পোয়া জল দিয়া মৃদুমন্দ জ্বাল দিয়া একছটাক জল থাকিতে নামাইবে এবং সেই পাচন গরম গরম খাইলে দুই দিনের মধ্যে কাসি সারিয়া যায়। বলা বাহুল্য, সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকটি বেশ করিয়া থেঁতো করিয়া লইতে হইবে।

রাজনিঘণ্টুকার বলেন—"পিপ্পলী জ্বরহা বৃষ্যা স্নিগ্ধোষ্ণা কটুতিক্তকা।
দীপনী মারুত-শ্বাস-কাস-শ্লেষ্মক্ষয়াপহা॥"

আর মূলের গুণ—

"কটূষ্ণং পিপ্পলীমূলং শ্লেষ্মক্রিমিবিনাশনম্।
দীপনং বাতরোগঘ্নং রেচনং পিত্তকোপনম্॥"

এখানে দীপন অর্থে যাহা মৌরীর মত পাচকাগ্নি দীপ্ত করে; কিন্তু আম পরিপাক করিতে পারে না।

মারুত—অর্থে বায়ুবৃদ্ধিকারক।

রেচন—অর্থে যাহা পক্ব বা অপক্ব উভয়বিধ মলাদি দ্রব করিয়া বাহির করিয়া দেয়। (জোলাপ)

বৃষ্য—বীর্য্যকর।

কবিরাজগণ পিপুলের ফল ও মূল দুইই ঔষধার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ভাবপ্রকাশমতে—

প্লীহারোগের শান্তির জন্য দুগ্ধের সহিত পিপ্পলীচূর্ণ পান করিবে।

চক্রদত্তমতে—

উরুস্তম্ভে—গোমূত্র কিম্বা দশমূলের ক্বাথের সহিত পিপ্পলীকল্ক পান করিবে।

ক্বাথ—আধসের জলে দুই তোলা মাত্র দ্রব্য দিয়া জাল দিবে, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া লইলে ক্বাথ প্রস্তুত হয়।

কল্ক—অর্থে শিলায় পেষণ করিলে কল্ক প্রস্তুত হয়।

চরকে আছে—পিষ্ট পিপুল ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধবলবণ সহ সেবনে কাস রোগ আরোগ্য হয়।

কিন্তু হারীত বলেন—গুড়ের সহিত পিপুল সেবন করিলে কাস, অজীর্ণ, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয় এবং মরিচ ও পিপুলমূল দুগ্ধসহ সেবনে স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়।

আর রাগ্‌ভটে আছে—

পিপুলের কল্ক তিল-তৈলে ভাজিয়া মিছরির সহিত কুলত্থ কলায়ের কাথে আপ্লুত করিয়া পান করিলে কফজকালে বিশেষ উপকার হয়।

সুশ্রুতমতে—পিপুলের মূল পেষণ করিয়া একটি কলসীর ভিতর লেপন কর, তাহার পর উহাতে দুগ্ধ দিয়া দধি প্রস্তুত কর। **অর্শরোগী** সেই দধির তক্র পথ্যের সহিত একমাস পান করিলে **অর্শ** নিশ্চয় **আরোগ্য** হয়। তবে **অম্ল আহার** করিতে পারিবেন না। পিপুল **বাতরক্তে, বিষমজ্বরে** সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, তবে **মাত্রা** ক্রমে ক্রমে বাড়াইতে হয়।

ক্রিমিরোগে—পিপুলমূল ছাগীমূত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে **ক্রিমি** বিনষ্ট হয়।*

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পিপুল বহুবিধ রোগে বিশেষ উপকারী। সেই জন্য বিলাতেও ইহার বিশেষ আদর হইতেছে।



চন্দন

চন্দন যে কি পদার্থ, তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু ইহা কোথায় কোথায় জন্মে—অথবা চন্দনবৃক্ষের আকার কিরূপ, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। আর উহা কি কি গুণবিশিষ্ট, তাহাও অনেকে বিদিত নহেন।

আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পাঠ করিতে পাই—দেবর্ষি নারদ মহালক্ষ্মীর পূজায় বলিতেছেন—

"মলয়াচল-সম্ভূতং বৃক্ষসারং মনোহরম্।
সুগন্ধযুক্তং সুখদং চন্দনং দেবি গৃহ্যতাম্॥"

উক্ত শ্লোক হইতে আমরা চারিটি তথ্য চন্দন সম্বন্ধে অবগত হইলাম।

(১) ইহা বৃক্ষসার
(২) মলয়াচলসম্ভূত
(৩) সুগন্ধযুক্ত
(৪) সুখদ ও মনোহর

আবার বিষ্ণুশর্ম্মা-বিরচিত হিতোপদেশে আছে—

"বিনা মলয়মন্যত্র চন্দনং ন প্ররোহতি"

অর্থাৎ মলয় পর্ব্বত ব্যতিরেকে চন্দন অন্যত্র জন্মে না। সেইরূপ ধারণা এখনও অনেকের মনোমধ্যে আছে, কিন্তু তাহা কতদূর সত্য, তাহা কবি-কঙ্কণ চণ্ডীর পাঠকমাত্রেই বিশেষরূপে বিদিত আছেন।

"কুঙ্কুম কস্তূরীপঙ্ক, চামর চন্দন শঙ্খ
নাহি ছিল রাজার ভবনে,

রাজার আদেশ পায়, ভরা দিয়া সাত নায়,
চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে।"

অমনি চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল—

"সিংহলে যাবেন সাধু সাজায়েছে ডিঙ্গা।"

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সেই সময়ে সিংহলে চন্দনবৃক্ষ জন্মিত এবং সেই চন্দন ক্রয় করিবার জন্য রাজা বিক্রমকেশরীর আদেশমত আমাদের ধনপতিকে সিংহলে গমন করিতে হইয়াছিল।

আমরা—বণিকগণ ধনপতির বংশধর বলিয়া স্পর্দ্ধা করি বটে, কিন্তু হায়, আমাদের মধ্যে এক্ষণে চন্দন সংগ্রহার্থ সিংহল দ্বীপে যাওয়া দূরের কথা, কোথায় চন্দন জন্মে, তাহাও জানিবার জন্য কেহই উৎসুক নহেন।

পূর্ব্বোক্ত দুই-চারটি কথা কবির মুখে না শুনিয়া চন্দন সম্বন্ধে অন্যান্য পুস্তকে কি কি লিখিত আছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিলাম। যদি ইহাতে কাহারও কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপকার হয়, কৃতার্থ হইব।

দেশভেদে নামভেদ

চন্দন শব্দটি সংস্কৃত শব্দ—

চন্দয়তি, চন্দ্যতে বা আহ্লাদ্যতে ইতি চন্দনম্।

সিংহলবাসীরা ইহাকে "সন্দন" বলে এবং পারস্য ভাষায় ইহাকে 'সন্দল' বলে। বোধহয়, ঐ সন্দল শব্দ হইতে ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপবাসীরা চন্দনকে Sandal (স্যাণ্ডেল) বলিয়া থাকে।

স্পেন, ইতালী ও পর্টুগালবাসীরা ইহাকে "সন্দলো" বলে।

জর্ম্মণরা—Sandal Holy,
ফরাসীরা—Sandale Santal,
হলণ্ডবাসীরা—Sandel hurf,

ডেনমার্কবাসীরা—Sandel broe,

রুশীয়গণ—Sandloc Dereos,

সুইডেনবাসিগণ—Sandal trod বলিয়া থাকে।

আরবীয়গণ—সন্দল আরিয়াজ বলে।

তিব্বতবাসীরা—চন্দন বলে।

তৈলঙ্গীয়—চন্দনপু,

কর্ণাটে—শ্রীখণ্ড,

ব্রহ্মদেশে—করমাইসন্দুক,

চীনে—পেচেনতন, তনমূহ,

কোচিনে—কয়ুন্দন,

জাপানে—সন্দন বলিয়া থাকে।

Latin ভাষায় ইহার নাম Santalum Album.

কালের কি কুটিল গতি! একদিকে যেমন গন্ধবণিক্‌গণ সিংহলযাত্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি চন্দনবৃক্ষও সিংহল ত্যাগ করিয়া মহীশূর রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে। অর্থাৎ এক্ষণে সিংহলদ্বীপে চন্দনবৃক্ষ নাই বলিলেই চলে। তাহার স্থানে সুন্দর সুন্দর বিলাতী ফল ও ফুল-সুশোভিত উদ্যান হইয়াছে।

জন্মস্থান

এক্ষণে ভারতে—মহীশূর, গঞ্জাম, পশ্চিমঘাট, মলয়পর্ব্বত, কাশ্মীর, নলতিগিরি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মেলগিরি, কোইম্‌বাটুর, কোড়গ, মেতাব, সিদ্ধপুর, বাবাবুদন প্রভৃতি স্থানে চন্দনবৃক্ষের আবাদ আছে। তন্মধ্যে মহীশূরের আবাদই সুবিখ্যাত। অধুনা অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ফিজি ও তিমর প্রভৃতি দ্বীপ হইতেও প্রতি বর্ষে লক্ষাধিক মুদ্রার চন্দন আমদানী হইয়া থা...।

কিন্তু যাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে চন্দনবৃক্ষ জন্মায় না বলিলেও চলে। এক্ষণে সিংহলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা অতি নিকৃষ্ট জাতীয় চন্দন। মহীশূরে এক্ষণে নয়টি শ্রেণীর সুবৃহৎ চন্দনবৃক্ষের আবাদ আছে। (Pigot) পিগট সাহেব বলেন—মহীশূরে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে ২৪০ মাইল লম্বা এবং ১৬ মাইল চওড়া সর্ব্বশুদ্ধ ৫,৪৫০ বর্গমাইল পর্য্যন্ত চন্দনের আবাদ আছে। বৎসর বৎসর ঐ আবাদ হইতে ১৫০০ হাজার হইতে ২০০০ হাজার **টন** চন্দনকাষ্ঠ বিক্রীত হয়। তাহার মূল্য ৬।৭ লক্ষের অধিক। ঐ বৃক্ষের কাষ্ঠ ও কাষ্ঠের ধূলাগুঁড়ি পর্য্যন্ত আদরের সহিত বিক্রীত হয়। প্রথম শ্রেণীর চন্দনের মূল্য এক টন ৫০০৲।৬০০৲ টাকার কম নহে।

চন্দনবৃক্ষের আকৃতি ও প্রকৃতি

চন্দনবৃক্ষ তেমন বড় হয় না। যখন চারাগাছ অবস্থায় থাকে, তখন ইহাকে লতানে গাছ বলিয়া বোধ হয়, ক্রমে যতই বড় হইতে থাকে, ইহার গুঁড়ি ততই মোটা ও শক্ত হইতে থাকে। ইহা বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট হয়, সুতরাং এক একটি বৃক্ষ অনেকটি স্থান অধিকার করিয়া বিস্তৃত হইয়া থাকে। গাছগুলি যখন ক্ষুদ্র থাকে, তখন ইহাকে শশকাদি জন্তুগণ বড় নষ্ট করিয়া ফেলে, হরিণগণও ইহার পাতা খাইতে ভালবাসে। সেই জন্য ইহার চারিদিকে কাঁটাগাছের বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। আবার ইহার স্বভাব এই, একাকী ভাল জন্মায় না, অন্যান্য নানাজাতীয় গাছের মধ্যে বেশ তেজাল হইয়া উঠে। অর্থাৎ অন্য গাছের আওতা পাইলে ইহা শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া অন্যান্য গাছকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করে; অনেক স্থলে আবার ইহা (Orchid) অর্কিডাদি গাছের ন্যায় পরগাছারূপে জন্মিয়া থাকে। সরস সমতল ভূমিতে ইহা ভাল জন্মে না, পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা অধিক সারবান্ হয়। সুতরাং ঐ সকল বৃক্ষের মূল্যও অধিক হয়।

ইহার বৃদ্ধি অতি মন্দ; Lusi Ington সাহেব বলেন, ১০ বৎসরে ৮ ইঞ্চি মাত্র বর্দ্ধিত হয় এবং ৪০।৫০ বৎসরের কমে ইহা সারবান হয় না। তজ্জন্য মহীশূররাজের আদেশ, ৫০।৬০ বৎসরের না হইলে কোনও চন্দনবৃক্ষকে ছেদন করিতে পারিবে না। ইহা উচ্চে বড় বেশী হয় না। মাটি হইতে সাধারণতঃ ৫।৭ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। তবে অন্যান্য বৃক্ষের আশ্রয় পাইলে ৩০।৩২ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে, সেরূপ বৃক্ষ কিন্তু অতি বিরল।

ইহার **ফুলগুলি** সংখ্যায় অনেক হয় বটে, তবে আকৃতিতে অতি ক্ষুদ্র। ফুলের রং প্রথম প্রথম ফিকে পীতবর্ণ থাকে, পরে ঘোর বেগুণে রং ধারণ করে।

ইহার **ফল** আকৃতিতে ছোট, গোল ও মসৃণ, সুপক্ক হইলে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

ইহার **পত্রগুলি** লম্বাটে ধরণের অর্থাৎ যেরূপ লম্বা, সেরূপ চওড়া হয় না। পাতার অগ্রভাগ তেমন সরু নহে।

ইহার **ত্বক্**—বড় পাতলা।

ইহার **কাষ্ঠ** অতিশয় শীতল, তজ্জন্য সর্পগণ অনেক সময়ে ইহার গুঁড়ি জড়াইয়া থাকে। তাই লোকে বলে, চন্দনবৃক্ষ সাপের আবাস। পূর্ব্বে চন্দনবৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া বিক্রীত হয়। এক্ষণে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বিক্রয় করা হয়। কারণ, চন্দনবৃক্ষের কাষ্ঠাপেক্ষা মূলে অধিক তৈল থাকে।

চন্দন-তৈল—একমণ উত্তম চন্দনকাষ্ঠ হইতে তিন ছটাকের অধিক তৈল নিষ্কাশিত হয় না। ইহার তৈল অস্বচ্ছ এবং ফিকে হরিদ্রাবর্ণ। ইহার রস হইতে "চুয়া" প্রস্তুত হয়। তৈল ও চুয়া প্রায় এক, তবে নিষ্কাশন-প্রণালী বিভিন্ন মাত্র। এই চুয়া উড়িষ্যাবাসিগণ বহুল

পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও অনেক (কি স্ত্রী কি পুরুষ) দোক্তার মসলারূপে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভাইফোঁটা উপলক্ষে ভগ্নীগণ যখন ভ্রাতার কপালে ফোঁটা দেন, তখনও এই চুয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার ত্বক্, পুষ্প ও পত্রাদি মর্দ্দন করিলেও অতি সুখদ সুগন্ধ বাহির হয়। এই বৃক্ষের ত্বকে সুদীর্ঘ ফাটল দেখা যায় এবং অনেক সময়ে কাঁচাবৃক্ষেও নানা প্রকার কীটের আবাস হয়। তবে বৃক্ষ বড হইলে আর কীটের উৎপাত থাকে না। ইহার কাষ্ঠ বেশ কঠিন এবং সুগন্ধবিশিষ্ট।

চন্দনের প্রকারভেদ

বর্ণভেদে ও গুণের তারতম্যানুসারে চন্দনবৃক্ষ বৈদ্যকগণের মতে ছয় প্রকার।

"শ্রীখণ্ডং রক্তসারঞ্চ কালীয়কং কুচন্দনম্।
নির্গন্ধঞ্চ হরিশ্চেতি ষড়েতৎ চন্দনং স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ (১) শ্রীখণ্ড বা শ্বেতচন্দন
(২) রক্তসার বা রক্তচন্দন
(৩) কালীয়ক বা পীতকাষ্ঠ
(৪) নির্গন্ধ বা বর্ব্বরিকা
(৫) হরিচন্দন বা মহাগন্ধ
(৬) কুচন্দন

তবে ভাবপ্রকাশমতে চতুর্ব্বিধ—

(১) শ্বেতচন্দন Santalum Album
(২) রক্তচন্দন Pterocarpur Santilus
(৩) পীতচন্দন
(৪) কুচন্দন Adenanthera Pavonina

আবার ধন্বন্তরির মতে পঞ্চবিধ—

(১) শ্বেতচন্দন

(২) রক্তচন্দন

(৩) কুচন্দন

(৪) কালিয়ন (কালীয়ক)

(৫) বর্ব্বরিকা

সচরাচর চন্দন বলিলে আমরা শ্বেতচন্দনই বুঝিয়া থাকি।

বৈদ্যকগ্রন্থে উপরি-উক্ত এক একবিধ চন্দনের পর্য্যায় ও গুণাবলী

১। শ্বেতচন্দন

"শ্রীখণ্ডং চন্দনং ন স্ত্রী ভদ্রশ্রী তৈলপর্ণিকঃ।
গন্ধসারো মলযজস্তথা চন্দ্রদ্যুতিশ্চ সঃ॥"

অর্থাৎ শ্বেতচন্দনের অন্যান্য নাম—শ্রীখণ্ড, ভদ্রশ্রী তৈলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দ্রদ্যুতি।

উৎকৃষ্ট জাতীয় শ্বেতচন্দনের লক্ষণ—

"স্বাদে তিক্তং কষে পীতং ছেদে রক্তং তনৌ সিতম্।
গ্রন্থিকোটর-সংযুক্তং চন্দনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে শ্বেতচন্দন—আস্বাদে তিক্ত, কষে পীতবর্ণ; যাহা ছেদন করিলে রক্তবর্ণ এবং গ্রন্থি ও কোটরসংযুক্ত—সেই চন্দন উৎকৃষ্ট। মহীশূর রাজ্যের আবাদে ঐরূপ বৃক্ষ প্রচুর জন্মে।

ইহার গুণ—

"চন্দনং শীতলং রুক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু।
শ্রমশোথবিষশ্লেষ্ম-তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহনুৎ॥"

অর্থাৎ ইহা শ্রান্তি, শোথ, বিষ, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ বিনাশক এবং শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্তরস, আহ্লাদজনক ও লঘু গুণবিশিষ্ট।

মাত্রা ২ মাষকো—ইহার মাত্রা চারি আনা।

২। রক্তচন্দন

রক্তচন্দনের প্রসিদ্ধ নামাবলী—

"রক্তচন্দনমাখ্যাতং রক্তাঙ্গং ক্ষুদ্রচন্দনম্।
তিলপর্ণং রক্তসারং তৎপ্রবালফলং স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ রক্তচন্দন, রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্রচন্দন, তিলপর্ণ, রক্তসার ও প্রবালফল—এই কয়টি রক্তচন্দনের প্রসিদ্ধ নাম।

ইহার গুণাদি—

"রক্তশ্চ চন্দনঃ স্বাদুরতিশীতো গুরুঃ স্মৃতঃ।
চক্ষুষ্যস্তিক্তকো বৃষ্যো বর্ণ্যঃ কফহরো মতঃ।
নেত্ররুগ্‌রক্তদোষঘ্নঃ পিত্তকাসজ্বরাপহঃ।
বান্তিং ভ্রান্তিং তৃষাং দাহং ব্রণং জন্তূন্ বিষং তথা।
ব্যঙ্গঞ্চ বাতপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।
রাক্ষসানাং পিশাচানাং বাধায়াশ্চ বিনাশনঃ॥"

অর্থাৎ ইহা নেত্ররোগ, রক্তদুষ্টি, পিত্ত, কাস, জ্বর, বমন, ভ্রান্তি, তৃষ্ণা, দাহ, ব্রণ, ক্রিমি, বিষদোষ, বাত, পিত্ত ও রক্তপিত্ত রোগে প্রযোজ্য।

ইহা দ্বারা—রাক্ষসবাধা ও পিশাচবাধা দূরীভূত হইয়া থাকে।

মাত্রা ২ মাষকো—মাত্রা চারি আনা।

দেশভেদে ইহার নাম—

হিন্দী—লালচন্দন।
তৈলঙ্গে—এর্রগন্ধপুচেম্ব।
তামিলে—সেনশাগুন।

গুজরাটে—রতাংজলী।

মহারাষ্ট্রে—রক্তচন্দন।

আসামে—রঙ্গাচন্দন।

ফার্সিতে—মণ্ডলেসুরখ।

আরবী—সংদলঅহমর।

Latin—Tera carpus Santalum.

ডাক্তারী নাম—Red Sandal wood.

৩। কুচন্দন বা পতঙ্গ

ইহার অপর নাম বকমকাঠ।

"পতঙ্গং রক্তসারঞ্চ সুরঙ্গং রঞ্জনং তথা।
পট্টরঞ্জকমাখ্যাতং পত্তুরঞ্চ কুচন্দনম্॥"

পর্য্যায়—পতঙ্গ, রক্তসার, সুরঙ্গ, রঞ্জন, পট্টরঞ্জক, পত্তুর ও কুচন্দন।

গুণাদি—"পতঙ্গং মধুরং শীতং পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রনুৎ।
হরিচন্দনবদ্বেত্ত্যং বিশেষাদ্দাহনাশনম্॥"

ইহা—মধুররস, শীতবীর্য্য এবং পিত্তশ্লেষ্মা, ব্রণ ও রক্তদুষ্টিনাশক। ইহা হরিচন্দনতুল্য গুণকারক, বিশেষতঃ দাহনাশক।

নামভেদ—হিন্দুস্থানী, গুজরাটী ও কর্ণাটী নাম—পতঙ্গ, তৈলঙ্গে—ওকমুকণ্ট্য, উৎকলে—বকমে, তামিলে—বট্টঙ্গী, ফার্সি ও আরবী—বকম্, ইংরেজী—Sappan wood, ডাক্তারী নাম—Caesalpinia Sapan.

মাত্রা—চারি আনা।

৪। কালীয়ক বা পীতচন্দন

"কালীয়কন্তু কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনম্।
হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসাধকম্॥"

পীতচন্দনের অন্যান্য নাম—কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরিপ্রিয়, হরিচন্দন, কালসার ও কালানুসাধক।

দ্রাবিড়ে—ইহাকে কলম্বক বলে।

কিন্তু রাজনিঘণ্টুমতে হরিচন্দন ও কালীয়ক এক নহে। তাহার মতে—

"হরিচন্দনস্তু দিব্যং তিক্তহিমং তদিহ দুর্লভং মনুজৈঃ।
পিত্তাটোপবিলেপি চন্দনবৎ শ্রমহরং চ শোষহরম্‌॥"

ইহা এক্ষণে পাওয়া যায় না।

কালীয়কের গুণাবলী—

"পীতশ্চ চন্দনঃ শীতস্তিক্তঃ কান্তিকরো মতঃ।
বিচর্চ্চিকাকুষ্ঠকণ্ডূকফদদ্রুবিষাপহঃ।
রক্তপিত্তক্রিমিব্যঙ্গ-পিত্ততৃড়্‌জ্বরদাহহা।"

অর্থাৎ পীতচন্দন (বা কালীয়ক) বিচর্চ্চিকা (চুলকান), কুষ্ঠ, কণ্ডূ, কফ, দদ্রু, বিষদোষ, রক্তদোষ, ক্রিমি, ব্যঙ্গ, পিত্তদোষ, পিপাসা, জ্বর ও দাহরোগে প্রযোজ্য।

মাত্রা—চারি আনা।

৫। বর্ব্বরচন্দন

"বর্ব্বরোত্থং বর্ব্বরকং পিত্তারির্বর্ব্বরং তথা।
শ্বেতবর্ব্বরকং শীতং সুগন্ধি সুরভি স্মৃতম্‌॥"

পর্য্যায়—বর্ব্বরোত্থ, বর্ব্বরক, পিত্তারি, বর্ব্বর, শ্বেতবর্ব্বরক। ইহা স্নিগ্ধ, সুগন্ধি ও সুরভি।

গুণ—"বর্ব্বরং শীতলং তিক্তং কফমারুতপিত্তজিৎ।
কণ্ডূং কুষ্ঠং ব্রণং হন্তি বিশেষাৎ রক্তদোষনুৎ॥"

ইহা শীতবীর্য্য, তিক্তরস ও কফবাতপিতঘ্ন। ইহাতে কণ্ড, কুষ্ঠ, ব্রণরোগ, বিশেষতঃ রক্তদুষ্টিরোগ আরোগ্য হয়।

মাত্রা—৵০ আনা।

৬। গোপীচন্দন

"গোপীচন্দনকং দাহক্ষতরক্তবিকারনুৎ।
পিত্তং কফং চ প্রদরং নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম॥"

অর্থাৎ গোপীচন্দন ব্যবহারে দাহ, ক্ষত, রক্তবিকৃতি, পিত্ত, কফ ও প্রদর নষ্ট হয।

মাত্রা—৵০ আনা।

কাহারও কাহারও মতে আর একপ্রকার চন্দন আছে।

৭। শবরচন্দন

ইহার অন্য নাম কৈরাতক।

গুণ—"কৈরাতকঃ শীতলশ্চ তিক্তঃ পিত্তকফাপহঃ।
বিস্ফোটপামাকণ্ডূতিশ্রমবাতবিনাশকঃ।
গজকর্ণাদিকুষ্ঠঘ্নো লূতাতৃন্মোহনাশনঃ॥"

ইহা শীতবীর্য্য, তিক্তরস ও পিত্তকফনাশক। ইহাতে—বিস্ফোট, পামা, কণ্ডূ, শ্রম, বায়ু, গজকর্ণাদিকুষ্ঠ, লূতাবিষ, পিপাসা ও মোহ বিনষ্ট হয়।

মাত্রা—চারি আনা।

কেহ কেহ বলেন—উৎপত্তিস্থান অনুসারে চন্দনের নাম বিভিন্ন হইয়া থাকে। যথা—মলয়পর্ব্বতজাত শ্বেতচন্দনকে—ভদ্রশ্রী—তৈলপর্ণ ও গোশীর্ষপর্ব্বতজাত চন্দনকে তৈলপর্ণী ও গোশীর্ষ বলে। মলয়াদ্রিসমীপস্থ পর্ব্বতমালাজাত চন্দনকে বেট্‌ট চন্দন বলে।

কিন্তু রাজনিঘণ্টুকারমতে—চন্দনবৃক্ষকে জীবিতাবস্থায় ছেদন করিয়া যে চন্দন সংগ্রহ করা যায়, তাহার নাম বেট্ট। আর চন্দনবৃক্ষ আপনা আপনি শুষ্ক হইয়া গেলে যে চন্দন পাওয়া যায়, তাহার নাম সুক্কড়ি। বর্ব্বর পর্ব্বতজাত চন্দনকে বর্ব্বরক বলে।

"চন্দনং দ্বিবিধং প্রোক্তং বেট্টসুক্কড়িসংজ্ঞকম্।
বেট্টং তু সার্দ্রবিচ্ছেদং স্বয়ং শুষ্কং তু সুক্কড়ি॥"

গুণ—

"বেট্টচন্দনমতীবশীতলং দাহপিত্তশমনং জ্বরাপহম্।
ছর্দ্দিমোহতৃষাকুষ্ঠতৈমিরকাসরক্তশমনঞ্চ তিক্তকম্।
সুক্কড়িচন্দনং তিক্তং কৃচ্ছ্রপিত্তাস্রদাহনুৎ।
শৈত্যসুগন্ধদং চার্দ্রং শুষ্কং লেপে তদন্যথা॥"

কেহ কেহ বলেন, স্থানভেদে যেমন চন্দনের নাম ও গুণের প্রভেদ দেখা যায়, সেইরূপ ছেদনের কালভেদে চন্দনের গন্ধ, বর্ণ ও তৈলের পরিমাণেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

প্রস্তর ও কঙ্কর-মিশ্রিত অনুর্ব্বর মৃত্তিকাজাত চন্দনবৃক্ষগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও উহা যেমন সুগন্ধি, তেমনি উহার কাষ্ঠে অধিক পরিমাণে তৈল নির্গত হয়।

আর সরস উর্ব্বর ভূমিজাত চন্দনবৃক্ষ আকারে বৃহৎ হইলেও তাহা তত সুগন্ধি হয় না এবং উহাতে তৈলও অধিক পাওয়া যায় না।

এক্ষণে ধনপতি শ্রীমন্ত প্রভৃতি সদাগর নাই যে, তাঁহারা নানা স্থানে গিয়া এই বঙ্গদেশে চন্দন সংগ্রহ করিয়া আনিবেন।

মহীশূর রাজ্যে যেরূপ উৎকৃষ্ট চন্দন পাওয়া যায়, সেরূপ এক্ষণে আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বঙ্গদেশে এক্ষণে এমন কোন বাঙ্গালী বণিক্ নাই, যিনি মহীশূরে স্বয়ং গিয়া সুচন্দন ক্রয় করিয়া আনেন।

এক্ষণে মহীশূর হইতে চন্দন বোম্বাই নগরীতে নীত হয়, তথা হইতে ভাটিয়া প্রভৃতি বণিকগণ কর্ত্তৃক কলিকাতায় আনীত হয়।

মহীশূররাজের আদেশ আছে, চন্দনবৃক্ষ গুঁড়ি ৯।১০ ইঞ্চি মোটা না হইলে কর্ত্তন করিতে পারিবে না এবং বিক্রয়ের পূর্ব্বে উহার ছাল ছাড়াইয়া ২ মাসকাল মাটিতে পুঁতিয়া রাখিতে হইবে।

চন্দন-তৈল

এই বঙ্গদেশে চন্দনতৈল প্রস্তুত করা হয় না। আমরা যে চন্দনতৈল বাজারে ক্রয় করিয়া থাকি, সে সমুদয় অযোধ্যা, কনৌজ, লক্ষ্মৌ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্বেতচন্দন হইতেই তৈল প্রস্তুত হয়, অন্য কোন চন্দনে তৈল হয় না। রক্তচন্দন হইতে কেবল রঙ ও ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(Bahraich) বেরাইচ প্রদেশে চন্দনবৃক্ষের বন আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে শ্বেতচন্দন অতি বিরল।

হায়দ্রাবাদেও চন্দনের চাষ হয় বটে, কিন্তু সে চন্দনের বাজারে বড় কাটতি নাই।

তৈল প্রস্তুত করিবার প্রণালী

প্রথমতঃ চন্দনকাষ্ঠকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। তাহার পর নির্ম্মল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কোন এক তামার পাত্রে দুই দিন যাবৎ ভিজাইয়া রাখিলে ভাল হয়।

তাহার পর বক্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে প্রণালীতে গোলাপজল বা যোয়ানের আরক প্রস্তুত হয়, ঠিক সেই উপায়ে আগুনে চড়াইয়া কোন এক পাত্রে নীত হইলে, ঐ জলের উপর তৈল ভাসিতে থাকে। তাহার পর ঐ তৈল

আস্তে আস্তে উঠাইয়া লইয়া অন্য পাত্রে রাখিতে হয় এবং উত্তমরূপে ছাঁকিয়া পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়।

ঐ তৈল প্রায় এক বৎসরকাল কাচের পাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে উহার যত কিছু ময়লা ক্রমে থিতাইয়া পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকে। তৎপরে আস্তে আস্তে উপরের ভাগ অন্য পাত্রে পূরিয়া লইতে হয়।

কেহ কেহ বলেন, বঙ্গদেশের জলে ঐ তৈল ভালরূপ হয় না, কনৌজাদি স্থানের জলেই উৎকৃষ্ট চন্দনতৈল প্রস্তুত হয়। কনৌজে একমণ কাষ্ঠে প্রায় তিন সের তৈল হয়।

তৈল প্রস্তুত করিতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

(১) জল যেন পরিষ্কার ব্যবহৃত হয়।

(২) জলের পরিমাণ যেন অধিক না হয়।

(৩) অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা কাল যেন চন্দনকাষ্ঠের চূর্ণগুলি ভিজান থাকে।

(৪) জ্বাল সমানভাবে দিতে হইবে, বেশী-কম হইলে চলিবে না।

(৫) বোতল পূর্ণ হইলেই সেখান হইতে সরাইয়া লইতে হইবে।

(৬) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রস্তুত না করিলে বিশুদ্ধ তৈল পাওয়া যায় না।

(৭) এমন কি, বকযন্ত্রগুলি সর্ব্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

(৮) বিশেষতঃ বকযন্ত্রের সংযোগস্থলগুলি যেন পরিষ্কার থাকে এবং সছিদ্র না হয়।

কনৌজে বৎসরে হাজার হাজার মণ চন্দনতৈল প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে নীত ও বিক্রীত হয়। তবে আজকাল সেখানেও অনেক ভেজাল দেয় বলিয়া ক্রমে কাটতি কমিয়া যাইতেছে। অন্যদিকে চন্দনকাষ্ঠের দাম

বৃদ্ধি হওয়ায় চন্দনতৈলের পড়তা অধিক হয়, তাই ব্যবসায়িগণ ভেজাল মিশাল করিয়া আরও বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে।

আজকাল শ্বেতচন্দন-কাষ্ঠের দাম ৭৫৲।৮০৲ টাকা মণ এবং রক্তচন্দনের দাম ১০৲।১২৲ টাকা মণ, আর চন্দনতৈলের দাম ৩৮৲।৪০ টাকা সের। চীনারা চন্দনতৈল আনন্দসহকারে ভক্ষণ করে।

চন্দনকাষ্ঠের প্রস্তুত দ্রব্যাদি

চন্দনকাষ্ঠ সারবান্—তজ্জন্য বহু বৎসর একভাবেই থাকে। এইজন্য ভারতের নানা স্থানে চন্দনকাষ্ঠের বিবিধ খেলনা ও ঘরের আসবাব প্রস্তুত হয়। চন্দনকাষ্ঠ কঠিন বলিয়া ইহাতে যন্ত্র সাহায্যে সুন্দর কারুকার্য্য করা চলে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে ধনী লোকের গৃহে চন্দনকাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত দ্রব্যাদি শোভা পাইত। এমন কি, বসিবার চেয়ার বা চৌকিও চন্দনকাষ্ঠের তৈয়ারী হইত। দেবগৃহগুলি চন্দনকাষ্ঠের কারুকার্য্য দ্বারা বিমণ্ডিত থাকিত। এক্ষণে কিন্তু তাহা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

চন্দনকাষ্ঠে মৃতদেহ সৎকার করা হিন্দুগণের বিশেষ আদরের জিনিষ। তজ্জন্য ধনী ব্যক্তিরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চন্দনকাষ্ঠে মৃতদেহের অগ্নি-সৎকার করিয়া থাকেন।

ইতিহাসে পাঠ করা যায়, রোমের রাজা নীরোর (Nero) ভার্য্যাকে ঐরূপ চন্দনকাষ্ঠের দ্বারা অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল। ভারতীয় বণিক্গণ রোমে এই ভারত হইতে চন্দনকাষ্ঠ লইয়া গিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেন।

চন্দন হইতে নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। বৈদ্যক গ্রন্থগুলিতে চন্দনের গুণগুলি বিশেষভাবে বর্ণিত আছে এবং কোন্ ব্যাধিতে কি কি চন্দন কিরূপভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহারও উল্লেখ আছে।

ব্যবহার

সুশ্রুতের মতে—স্ত্রীলোকের ঋতুকালে বিস্রুতরক্ত দুর্গন্ধময় পুঁজের মত নির্গত হইলে শ্বেতচন্দনের কাথং পান করাইবে।

"দুর্গন্ধি পূয়নির্যাসে মজ্জতুল্যস্তথাহর্ত্তবে।
পিবেদ্ ভদ্রশ্রিয়ঃ কাথ চন্দনকাথমেব বা॥"

ভদ্রশ্রী—চন্দনবৃক্ষ।

শুক্রমেহে—অর্জ্জুনত্বক্ ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

"ককুভচন্দনং কষায়ং বা।"

বঙ্গসেনমতে—মসূরিকায় শ্বেতচন্দন বিশেষ উপকারী।

"শ্বেতচন্দনকল্কেন হিলমোচভবং রসম্।
পিবেৎ মসূরিকারম্ভে।"

শিশুগণের নাভিপাকে শ্বেতচন্দন।

"নাভিপাকেঽবচূর্ণনম্।
ত্বক্চূর্ণৈঃ ক্ষীরিণাং বাপি কুর্য্যাচ্চন্দনরেণুনা॥"

অর্থাৎ—শ্বেতচূর্ণ দ্বারা নাভি পূরণ করিলে ক্ষত পূরিয়া উঠে।

বাগ ভট্টমতে—

নেত্ররোগে—লোহিতচন্দনযোগে কথিত দুগ্ধ, রক্ত বা পিত্তোৎক্লিষ্টে নেত্রে সেচন করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

"পিত্তোৎক্লিষ্টে রক্তোৎক্লিষ্টে নেত্ররোগে চ চন্দনম্।"

চরকমতে—

হিক্কায় চন্দন বিশেষ উপকারী—স্ত্রীদুগ্ধে ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দনের নস্য লইলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

"নাবয়েচ্চন্দনং বাপি নারীক্ষীরেণ সংযুতম্"।

রক্তাতিসারে—

সুপিষ্ট শ্বেতচন্দন—শর্করা ও মধুসহ তণ্ডুলোদকে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ ও রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

"পীত্বা সশর্করা-ক্ষৌদ্রং চন্দনং তণ্ডুলাম্ভসা।
দাহতৃষ্ণাপ্রমেহেভ্যো রক্তস্রাবাদ্বিমুচ্যতে ॥"

ডাক্তারী মত

(রক্তচন্দন)—

ক্ষৌরি সাহেবের Materia Medica গ্রন্থে আছে;—A paste of the powder of Sandal wood is used as a cooling application to the head in headache and to inflamed and swollen limbs.

রক্তচন্দনের চূর্ণের প্রলেপ করিয়া দিলে শিরোদাহ ও প্রদাহান্বিত স্ফীত অঙ্গের বিশেষ উপকার হয়।

As an astringent it is used in combination with other astringent medicines in Dysentry, Diarrhoea etc.

ইহা ধারক—তজ্জন্য অন্যান্য ধারক ঔষধসহ আমাতিসার, রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

(শ্বেতচন্দন)—

A paste of it is applied to the body in pains in the limbs during high fever, with rose water and Camphor or with Saracocolla, to the head in headache, to inflammatory sweelling or to the skin affections.

তীব্রজ্বরে, রোগীর দেহে বেদনা অনুভব করিলে শ্বেতচন্দনের প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং শিরঃপীড়ায়, মস্তকের প্রদাহে ও অঙ্গস্ফীতিতে এবং

চর্ম্মবিকারগ্রস্ত শরীরের ত্বকে গোলাপজল এবং কর্পূরের সহিত প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মুষ্টিযোগ

১। রক্তচন্দন, বালা, বেণামূল, মুথা ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া সেবন করিলে পিপাসা, বমি ও গাত্রদাহবিশিষ্ট পিত্তজনিত জ্বর নিবারিত হয়।

২। রক্তচন্দন, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, নীলোৎপল, চিরতা, বেণার মূল একত্র করিয়া তাহার ক্বাথে চিনি দিয়া পান করিলে বাতপিত্তজ্বর নিবারিত হয়।

৩। রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কণ্টকী, চাকুলে এই সকল দ্রব্য রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে ক্বাথ করিয়া শীতল হইলে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা পিত্তপ্রবণ, সন্নিপাতজ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

৪। রক্তচন্দন, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা, শুঁঠ, কমলা, আকনাদি, চিরতা, দুরালভা, বেণার মূল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, কণ্টকারি, কুড, নিমছাল এই ১৮টি দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, শ্বাস, কাস ও শোথ প্রশমিত হয়।

৫। রক্তচন্দন, শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, বেণার মূল ও ধনে ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে পালাজ্বর আরোগ্য হয়।

৬। শ্বেতচন্দন, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, দেবদারু, ধুনা ও গুগ্‌গুলু—এই কয়টি দ্রব্য আগুনে পোড়াইয়া, রোগীর গৃহে ধূম প্রদান করিলে বসন্ত-রোগে বিশেষ উপকার হয়।

৭। রক্তচন্দন, বাসকমূল, মুথা, গুলঞ্চ ও দ্রাক্ষা ইহাদের শীতকষায় পান করিলে বসন্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

৮। বেণামূল, লোধ, অর্জ্জুনছাল ও রক্তচন্দন এই কয়টির ক্বাথ মধুসহ সেবন করিলে পৈত্তিক প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

৯। টীকা ভাল না উঠিলে জলপটি বাঁধিয়া রাখিলে পুঁজ ভরিয়া উঠে, তখন শ্বেতচন্দন ঘষিয়া লাগাইলে টীকার জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হইয়া শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

১০। টীকা ছিঁড়িয়া গিয়া বহু স্থান ব্যাপিয়া যাইয়া ঘা হইলে চন্দন ঘষিয়া প্রলেপ দিলে অচিরে আরোগ্য হয়।

১১। তলপেটে অত্যন্ত বেদনা হইলে দিনে দু'-তিনবার শ্বেতচন্দন ঘষা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিলে অতি শীঘ্র বেদনা বিদূরিত হয়।

১২। হরিণের শিং রক্তচন্দনের সহিত ঘষিয়া প্রলেপ দিলে আধ-কপালে অচিরে আরোগ্য হয়।

১৩। চন্দন তৈল ১০ ফোঁটা কিঞ্চিৎ জলের সহিত পান করিলে মেহের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়।

১৪। শ্বেতচন্দন ঘষা আন্দাজ আধতোলা মিছরির সরবতসহ পান করিলেও মেহজ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

১৫। শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেনগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—

পেটের ভিতর জ্বালা পোড়া বেশী বেশী করলে পরে,
চন্দনঘষা তোলা দু দিন দাও না নাভির গর্ত্তে ভ'রে।
এতেই যাবে পেটে ব্যথা দিতে দিতেই শান্তি পাবে,
মিছামিছি ব্যাকুল হয়ে কেন তুমি মর ভেবে।

এখানে চন্দন অর্থে—শ্বেতচন্দন।

১৬। শ্রীযুক্ত মহানন্দ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—

খোষ, পাচড়া, চুলকনায় ভুগে কেন মর,
দিন তিনেক চন্দনের তেল লাগিয়ে আহ্লাদে নৃত্য কর।

১৭। চক্ষু উঠিলে রক্তচন্দনঘষা চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে নিশ্চয় নিবারণ হইবে।

১৮। বসন্তরোগের প্রথম অবস্থায় শ্বেতচন্দন ঘষিয়া তাহার সহিত হিঞ্চাশাকের রস একতোলা পান করিলে বসন্ত বাহির হইয়া পড়ে। তাহার পর আর মৃত্যুভয় থাকে না।

১৯। বাধকজনিত তলপেটে অত্যন্ত বেদনা হইলে দুই বা তিনবার-মাত্র শ্বেতচন্দনঘষা নাভির চারিধারে নাভিগহ্বরে প্রলেপ দিলে বেদনা সহজেই প্রশমিত হয়।

২০। রক্তচন্দন, সারিবা (অনন্তমূল), লোধ, দ্রাক্ষা ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া গর্ভিণীর জ্বরশান্তির জন্য সেবন করিতে দিবে।

২১। • যে কোন প্রকার চর্ম্মরোগ হউক না, শ্বেতচন্দন ঘষিয়া প্রলেপ দিলে অতি সত্বর চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়।

দেবপূজায় চন্দন

সংস্কৃত ভাষায় গন্ধ শব্দের অর্থ ঘৃষ্টচন্দন। সুতরাং মন্ত্রের যে যে স্থলে "এতে গন্ধপুষ্পে" এই বাক্য আছে, তাহার অর্থ "সচন্দনপুষ্পে"।

"ন রক্তচন্দনং জাতু গৃহ্লীয়াদ্রক্তপুষ্পকম্।
বিল্বপত্রৈস্তৎপ্রসূনৈর্নার্চ্চয়েদ্দেবকীসুতম্॥"

অর্থাৎ কদাচ রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প, বিল্বপত্র ও বিল্বপুষ্প দ্বারা দেবকীনন্দন বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে না। শ্বেতচন্দন দ্বারাই পূজা বিধেয়। কিন্তু দেবীপূজায় রক্তচন্দন প্রশস্ত এবং শিবপূজায় শ্বেত ও রক্ত উভয়বিধ চন্দন ব্যবহৃত হয়। "নবগ্রহশান্তি" করিবাব সময় পূজায় শ্বেতচন্দন দিতে হয়।

চন্দনাদি-লেপনবিধি—

"নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্ব্বাঙ্গে চানুলেপনম্।"

নির্ম্মাল্য পুষ্পাদি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিবে।

চতুর্গন্ধ শব্দের অর্থ—চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুম।

শ্রীকৃষ্ণদেবের পূজায় বলিতে হয়—

"ওঁ পরমানন্দ-সৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তর।
গৃহাণ গন্ধং কৃপয়া প্রসীদ পরমেশ্বর॥" (এষ গন্ধঃ)

ওঁ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।

কেবল সচন্দন পুষ্প নহে, সচন্দন তুলসীও দিয়া পূজা করিতে হয়।

কখনও বা বলিতে হয়—

"ওঁ যদঙ্গস্পর্শমরুতঃ সঙ্গান্মলয়জদ্রুমাঃ।
সুগন্ধিরসসম্পন্নাস্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্॥" (এষ গন্ধঃ)।

আবার অভিষেকবিধিতে আছে—

চন্দন দ্বারা "ওঁ দ্রুপদাদিব" মন্ত্রে অনুলেপন করিবে। তৎপরে চন্দন, অগুরু, তিল ও আমলকী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া উহা দেবতার অঙ্গে বিলেপন করিবে।

মন্ত্র যথা—

"ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ।
উদ্বর্ত্তনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়াম্ ভক্তিমুত্তমাম্॥"

আবার চন্দনমিশ্রিত জল দিয়া বলিতে হয়—

"ওঁ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" ইত্যাদি।

কখনও বা "গন্ধো নমঃ" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া চন্দন ও নানাবিধ সুগন্ধিপুষ্প ভগবদ্ গোবিন্দগাত্রে দিবে।

অক্ষয়তৃতীয়ায় ভগবান্ বিষ্ণুকে চন্দনচর্চ্চিত করিলে ও তাঁহাকে চন্দনাক্ত দর্শন করিলে বিষ্ণুলোকে বাস হয়। তাহার প্রমাণ—

"যঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনভূষিতম্।
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে স যাতাচ্যুত-মন্দিরম্॥"

ইতি স্কান্দে।

শ্রীবিষ্ণুর ললাটে চন্দন প্রদান করিবার সময় বলিতে হয়—

"সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বকং চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিকামঃ এতৎ গন্ধং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং ওঁ ভগবৎশ্রীকৃষ্ণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

ঘটোৎসর্গ করিবার সময় বলিতে হয়,—

"ওঁ ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্তে সন্তু লিপ্তাশ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥"

নাগপঞ্চমীতে—মনসাদেবীকে স্নান করাইবার সময় বলিতে হয়—

"ওঁ গন্ধচন্দনমিশ্রেণ তোয়েন নাগমাতরম্।
স্নাপয়ামি মহাভাগাং সর্ব্বসম্পত্তিহেতবে॥"

আবার সরস্বতী-পূজায় পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় আমরা বলিয়া থাকি—

"ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা।
এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ॥"

সরস্বতীর ধ্যানেও বলিয়া থাকি—

"শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।"

ষষ্ঠীদেবীর পূজায় বলিয়া থাকি—

"সুবর্ণপ্রতিমাং ষষ্ঠীং কৃত্বা চ চন্দনাম্বিকাম্।
চন্দনাগুরুতাম্বুলৈরংশুকৈশ্চ প্রপূজয়েৎ ॥"

এইরূপে হিন্দুগণ দেবদেবীর পূজায় চন্দন নানাবিধ উপায়ে দিয়া তাঁহাদের নিকট নিজ নিজ কামনার সাফল্য প্রার্থনা করেন।

অন্যদিকে আমরা দীক্ষার সময় গুরুদেবকে পূজা করিতে করিতে—

শিষ্য—অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্"
গুরু—"ওঁ অর্চ্চয়"

তখন গন্ধপুষ্প, দূর্ব্বাক্ষত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ জানু ধরিয়া নিজ নিজ কামনা প্রকাশ করে।

চন্দনধেনুদানে—

সবৎসাধেনুর পাদমূল হইতে গাত্রাদি এবং শৃঙ্গাদি পর্য্যন্ত চন্দনাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় চন্দন-পুষ্পাদি দ্বারা ধেনুকে সাজাইয়া তাহার পূজা করিতে করিতে বলিতে হয়—

"এতৎ পাদ্যং ওঁ ধেনবে নমঃ
সবস্ত্রালঙ্কৃত-সবৎস-চন্দনাঙ্কিতধেনবে নমঃ।"

পূজান্তে বলিতে হয়—

"এতাং সবস্ত্রালঙ্কৃতচন্দনাঙ্কিতসবৎসাং ধেনুং রুদ্রদেবতাকাং ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।"

ইত্যাদি সমুদয় কর্ম্মেই চন্দনের ব্যবস্থা আছে। তবেই বলিতে হয়, চন্দন কেবল মানুষের ব্যবহারার্থ নয়, দেবদেবীর প্রীতির ও পূজার জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে।

আর শাস্ত্রের আদেশ—

"স্বনির্ম্মিতং ধৃতং মাল্যং স্বয়ং ঘৃষ্টঞ্চ চন্দনম্

······শক্রাদপি হরেচ্ছ্রিয়ম্।"

স্বগ্রথিত মাল্যধারণ, স্বকীয় ঘৃষ্টচন্দন দ্বারা অঙ্গলেপন করিলে লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রকেও পরিত্যাগ করেন—মানুষের কা কথা। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই, মনসার ভাসানে লিখিত আছে—সতী আপনি চন্দন না মাখিয়া স্বামীকে মাখাইয়া দেন।

প্রতিদিন দেখ সতী পরম যতনে

সহাস্যে স্বামীর সেবা করে বিবিধ বিধানে।

চন্দনে ভূষিত করে—আমোদিত গন্ধে

শরীর হইতে তাঁর নিকলে সুগন্ধে।"

কিন্তু হায়! সেরূপ স্বামীর সেবা উড়িয়া গিয়াছে। শুদ্ধ তাহাই নহে, শাস্ত্রের উক্তি—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধম্

অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত।"

পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্নপানাদি, এমন'কি, ঔষধ পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন না করিয়া উপভোগ করিবে না। কিন্তু হায়! আজকাল আমরা শাস্ত্রের আদেশ মানি না।

আর চন্দনাদি দান সম্বন্ধেও বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—

"গোপীচন্দনখণ্ডন্তু যো দদাতি হি বৈষ্ণবে।

কুলমেকোত্তরং তেন সন্তবেত্তারিতং শতম্॥"

যিনি বৈষ্ণবকে একখণ্ড মাত্র গোপীচন্দন দান করেন, তিনি একশত এক কুল উদ্ধার করেন।

যমরাজ স্বয়ং বলিয়াছেন—হে মম দূতগণ, শ্রবণ কর, যাঁহার ললাট গোপীচন্দনে অঙ্কিত, প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় অতি যত্নসহকারে তাঁহাকে দূরে পরিত্যাগ করিবে।

"দূতাঃ শৃণুত যদ্ভালং গোপীচন্দনলাঞ্ছিতম্।
জ্বলদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ॥"

অন্যদিকে এরূপও লিখিত আছে—

"যস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি গোপীচন্দনং
ভক্ত্যা ললাটে মনুজো বিভর্ত্তি।
তস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা হরিঃ
শ্রদ্ধান্বিতো কংসধ্বংসী বিহঙ্গম॥"

হে বিহঙ্গম, যে গৃহে গোপীচন্দন বিরাজিত এবং যে গৃহে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ললাটে গোপীচন্দনতিলক ধারণ করেন, সেই গৃহে কংসধ্বংসকারী হরি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বাস করেন। কিন্তু হায়! এক্ষণে আমরা এহেন চন্দনের প্রতি শ্রদ্ধা না করিয়া কেবলমাত্র পুত্রকন্যাগণের নামকরণের সময় চন্দন নাম রাখিয়া হৃদয় শীতল করিয়া থাকি।

কোন এক কবি মনের দুঃখে চন্দন-তরু-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মূলং ভুজঙ্গৈঃ কুসুমানি ভৃঙ্গৈঃ
শাখা প্লবঙ্গৈঃ শিখরাণি ভল্লৈঃ।
নাস্ত্যেব তচ্চন্দনপাদপস্য
যন্নাশ্রিতং দুষ্টতরৈঃ কুপক্ষৈঃ॥"

মূলে দেখ বিষধর, ফুলে মধুকর,
শিখায় ভল্লুক, আর শাখায় বানর,
চন্দনের হেন অঙ্গ দেখিতে না পাই,
যথায় দুর্জ্জন-সঙ্গ মলিনতা নাই।

তবে দুই জন কবি চন্দন-তরুর বিশেষত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি সত্য—

(১) "জীর্ণস্য চন্দনতরোরামোদ উপজায়তে"
দেখহ চন্দন তরু হলে পুরাতন
সৌরভে আমোদ করে সমস্ত কানন।

(২) "মলয়জরসবৃক্ষো বর্দ্ধতে নো হি তোয়ৈঃ।"
সত্য বটে অন্য তরু জলে বৃদ্ধি পায়
চন্দন না বাড়ে জলে বরঞ্চ শুকায়।

বাস্তবিকই চন্দনবৃক্ষে জলসেচন নিষিদ্ধ। এইরূপ কথা মহীশূরবাসিগণের মুখেও শুনা যায়।

চন্দনের আমদানী ও রপ্তানী

মহীশূর ও কুর্গপ্রদেশে সমুদয় চন্দন-তরুই রাজার নিজস্ব, আর মাদ্রাজে যদিও কোন কোন ধনী ব্যক্তির চন্দনের আবাদ আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল আবাদ হইতে যত পরিমাণে চন্দনকাষ্ঠ বা তৈল উৎপন্ন হয়, সে সমুদয়ই কোম্পানী বাহাদুরের একচেটিয়া, অন্য কাহাকেও বিক্রয় করিবার হুকুম নাই।

ঐরূপে উক্ত তিনটি প্রদেশে যত পরিমাণে চন্দনকাষ্ঠ বা চন্দন-তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা প্রকাশ্যভাবে নীলামে বিক্রীত হয়। ঐ সময়ে নানা দেশ ও প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক ব্যবসাদার আসিয়া নিজ নিজ আবশ্যকমত উচ্চহারে উহা ক্রয় করিয়া লয়। কেবল বাঙ্গালীকেই সেখানে দেখা যায় না। এখানে যত আমদানী হয় বোম্বাইওয়ালাগণ মারফৎ। প্রতি বৎসর ঐরূপ নীলামে প্রকাশ্য ভাবে ২৫০০ বা ৩০০০ টন বিক্রীত হইয়া থাকে।

মাদ্রাজে		পাউণ্ড
১৯১১।১২ খৃঃ	২৩৬৩ টন মূল্য	৮৪০০০
১৯০৮।৯ „	২১১৪ টন „	৭০০০০
১৯১২।১৩ „	২৪১৮ টন „	১৫১,২০০

কিন্তু পরবৎসর বিক্রয় তত অধিক হয় না।

রাজনীতিজ্ঞেরা বলেন—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর সহিত ফরাসীর যুদ্ধ বাধে। বোধ হয়, জার্ম্মাণগণ তন্নিমিত্ত ঐ বৎসরে আবশ্যকমত চন্দন অত অধিক মাত্রায় ক্রয় করিয়া রাখিতেছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে চন্দনের বিক্রয়মাত্রা একেবারে হ্রাস হইয়া যায়, এমন কি, মূল্যের হারও বিশেষরূপে কমিয়া গিয়াছিল। তাহাতে কোম্পানীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কারণ, ভারতের রাজপুরুষেরা পূর্ব্ব হইতে ঐরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২০০০ টন ১১৩,৩০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

তৎপরবৎসর হইতে বাঙ্গালোরে চন্দনের কারখানা খোলা হয়, তৎসঙ্গে মহীশূররাজ চন্দনের মূল্যের হার বৃদ্ধি করিয়া দেন। ফলে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৩৪৭ টন ১৫৩,৩০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল, ওজনের পরিমাণ কম, কিন্তু বিক্রেয় মূল্য অনেক বেশী হয়। তাহার পর মহীশূররাজ নীলাম বন্ধ করিয়া দেন।

মাদ্রাজে কত পরিমাণে চন্দন উৎপন্ন হয় বা কত পরিমাণে বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার তালিকা পাওয়া যায় না। তবে

১৯১৩।১৪ খৃঃ	১০,০০০ পাউণ্ড মূল্যে	
১৯১৭।১৮ খৃঃ	৩৫,০০০ „	বিক্রীত হয়।

কুর্গপ্রদেশ

১৯১৪।১৫ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র ৩২ টন ১,৬৬০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয়।

কিন্তু ১৯১৫।১৬ খৃঃ	৩৮০ টন	২৩,৩৩০ পাউণ্ড
১৯১৭।১৮ খৃঃ	৩০ টন	৩৫,০০০ „

এই সময়ে মাদ্রাজে ইংরেজ-পরিচালিত এক কোম্পানী আসরে অবতীর্ণ হয়, ঐ কোম্পানীর নাম মেসার্স সীমেল (Messrs Schimuel) তাহার ফলে প্রতি টনের মূল্য প্রায় ৬০ পাউণ্ডের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং মহীশূর ও কুর্গপ্রদেশেও মূল্যের হার বৃদ্ধি পায়, প্রত্যেক টন ৬০।৭০ পাউণ্ড অধিক হারে বিক্রীত হইয়াছিল। তাহাতে আমাদের কোম্পানী বাহাদুরকে কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

সুতরাং তৎপর হইতে মাদ্রাজে ও কুর্গপ্রদেশে প্রকাশ্য নীলামে চন্দন-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়া তদবধি মহীশূররাজ চন্দন একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অষ্ট্রেলিয়া, চীন, মালয় উপদ্বীপ হইতেও প্রচুর পরিমাণে চন্দনকাষ্ঠ ও চন্দনের তৈলের আমদানী হইয়া থাকে। তবে উহা তেমন উৎকৃষ্ট নহে এবং উহার মূল্যও তেমন অধিক নহে।

অন্যদিকে আমরা দেখিতে পাই যে, এই ভারত হইতে য়ুরোপীয়গণ চন্দনকাষ্ঠ ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া, তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈল বাহির করিয়া লন এবং ঐ তৈলের কিঞ্চিৎ পরিমাণ এই ভারতে রপ্তানী করিয়া বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছেন। আর আমরা ঐ তৈলের সুগন্ধ ও উপকারিতায় মুগ্ধ হইয়া বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া থাকি মাত্র।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, কনৌজ প্রভৃতি প্রদেশে বহুকাল হইতে চন্দন তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা তত উৎকৃষ্ট নহে। চন্দনের আতরও কনৌজ প্রদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে সম্প্রতি মাদ্রাজে ও মহীশূরে চন্দন-তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

সার এলফ্রেড চেটারটন্ সাহেব (Sir Alfred Chatterton, Director of Industries in Mysore) মহীশূরের শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কারখানা স্থাপন করেন। তাহার ফলে ঐ স্থানে মাসিক ২০০০ পাউণ্ড ওজনে তৈল প্রস্তুত

C. W. E. Cotton সাহেব তাঁহার "Hand Book of Commercial Information of India" নামক অমূল্য গ্রন্থে ভারতীয় চন্দন তৈলের নিম্নলিখিত একটি তালিকা দিয়াছেন—

প্রতি তোলা চন্দন-তৈলের উপর দাম

১৯১৪ খৃঃ	জুলাই মাসে	২১ শিলিং	
	আগষ্ট ,,	২৩ ,,	
	ডিসেম্বর ,,	২৩ ,,	
১৯১৫ খৃঃ	সর্ব্বাপেক্ষা কম মূল্য হইয়াছিল—২১॥ শিলিং		
	,, উচ্চ মূল্য	৩০	,,
১৯১৬ খৃঃ	কম দাম ...	৩১	,,
	উচ্চ হার ...	৪৫	,,
১৯১৭ খৃঃ	স্বল্প মূল্য ...	৪০॥	,,
	উচ্চ হার ...	৫০	,,
১৯১৮ খৃঃ	জানুয়ারী মাসে	৫২॥	,,
		৫২॥	,,

তিনি বলেন, প্রতি টন ওজন চন্দনকাষ্ঠে গড়পরতা ১০০ পাউণ্ড ওজনের তৈল পাওয়া যায়। সুতরাং বিলাতে কাষ্ঠ রপ্তানী করিতে হইলে যত ভাড়া দিতে হয়, তাহার দশ ভাগের এক ভাগেরও কম ভাড়ায় রপ্তানী করা চলে।

বাঙ্গালোরে যে কারখানা খোলা হইয়াছে, প্রতি মাসে ৬০০০ পাউণ্ড ওজনের তৈল প্রস্তুত হয় এবং মহীশূরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে ২০,০০০ পাউণ্ড ওজনের তৈল প্রস্তুত হইতেছে।

আর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত দুইটি কারখানায় ২১১৩ টন চন্দনকাষ্ঠে ২১২,৩৭১ পাউণ্ড ওজনের তৈল প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৯,৬০০০ পাউণ্ড (ওজন) তৈল অচিরে বিক্রীত হইয়াছিল এবং চন্দন বিক্রীত হইয়া ১৯১৭।১৮ খৃঃ মহীশূররাজ্যে ১,৮৩,৩০০ পাউণ্ড (সুবর্ণমুদ্রা) আয় হইয়াছিল।

১৯১৩ খৃঃ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মূল্যের চন্দনকাষ্ঠ ও তৈল এই ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার তালিকা।

	চন্দনকাষ্ঠ	চন্দন-তৈল	মূল্য পাউণ্ড (সুবর্ণমুদ্রা)
১৯১৩।১৪ খৃঃ	১২৮,৬২৬ পাউণ্ড		
১৪।১৫	৩৫,৯১৮ "		
১৫।১৬	১০ , ৭৯৫ "		
১৬।১৭	১৩০,৩৫১ এবং	৫৪,৮২৩ পাউণ্ড	
১৭।১৮	৫২,৩৪৭ "	১৪৫,৭৯৩ "	
১৮।১৯	১০,৫২৯ "	২২৭,৫৬৩ "	

উক্ত চন্দনকাষ্ঠ ও তৈল শুদ্ধ যে য়ুরোপে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহা নহে; জাপান, ইজিপ্ট, সিংহল প্রভৃতি স্থানেও পাঠান হইয়াছিল। তন্মধ্যে শতকরা

জার্ম্মাণীতে	৪৩৪	অংশ	হল্যাণ্ডে	৩.১	অংশ
ইংলণ্ডে	২১.৭	"	সিংহলে	.৪	"
আমেরিকায়	১৫.৫	"	ইজিপ্টে	৩ ৮	"
ফ্রান্সে	৭.৭	"	জাপানে	.৩	"

অন্যান্য দেশে অবশিষ্ট অংশ রপ্তানী হয়। তন্মধ্যে মহীশূর হইতে ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চন্দন-তৈল রপ্তানী হইয়া থাকে। সম্প্রতি জাপানে বড় কম রপ্তানী হইতেছে না, অর্থাৎ সেখানে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র এক গ্যালন পরিমাণে তৈল রপ্তানী হইয়াছিল, কিন্তু ১৯১৮।১৯ খৃষ্টাব্দে ৪২৩১ গ্যালনেরও অধিক পরিমাণে কেবল জাপানে রপ্তানী হইয়াছিল এবং ১৯১৮।১৯ খৃষ্টাব্দে কত স্বর্ণমুদ্রা মূল্যে কত পরিমাণে চন্দন-তৈল নানা দেশে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

	তৈলের পরিমাণ ও মূল্য	
ইংলণ্ডে	১০,১৫১ গ্যালন	১৫৫,০১৩ পাউণ্ড
জাপানে	৪,২৩১ ”	৬১,৯৮৬ ”
ফ্রান্সে	৩৭৪ ”	৭,২৮৪ ”
হংকঙে	৮৭ ”	১,৫৮৮ ”
যাভায়	৫৯ ”	১৯০ ”
ইজিপ্টে	৪৮ ”	৮৫৯ ”
অষ্ট্রেলিয়ায়	২৩ ”	৪৫১ ”
মলয়াদিরাজ্যে	৯ ”	১৩৪ ”
অন্যান্য দেশে	৩ ”	৪৬ ”
মোট	১৪,৯৮৫ গ্যালন	২২৭,৫৪৭ পাউণ্ড মূল্যে

মহীশূর হইতে চন্দন-তৈল ক্রয় করিয়া অন্য কোথাও রপ্তানী করিতে হইলে মহীশূররাজের আদেশ লওয়া চাই, নচেৎ একবিন্দু পরিমাণেও চন্দন-তৈল বিদেশে রপ্তানী করিতে দেয় না। সাধারণতঃ, বেঙ্গালোরের "সাদবরো ওয়াটসন্" কোম্পানীর (Messrs. Sudborough Watson of the Indian Institute of Science) নিকট চালান লইতে হয় এবং

তাহারা ঐ তৈল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তবে ছাড়পত্র (Certificate) দিয়া থাকে।

এই ত' গেল রপ্তানীর কথা। সম্প্রতি চীন, অষ্ট্রেলিয়া, যাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতেও চন্দন-কাষ্ঠ ও চন্দন-তৈলের আমদানী হইতেছে। ঐ সকল সিঙ্গাপুর দিয়া ভারতে আমদানী হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃই উহার পরিমাণ ও মূল্য অধিক দেখা যাইতেছে।

যদিও মহীশূর ও অন্যান্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে যত পরিমাণে চন্দন-কাষ্ঠ ও চন্দন-তৈলের রপ্তানীর পরিমাণ দেওয়া হইল, তথাপি আমাদের জানা উচিত যে, কনৌজাদি প্রদেশ হইতে চন্দন-তৈল এবং কাশ্মীরাদি দেশ হইতে চন্দন-কাষ্ঠ কারবী (পোর্ট) বন্দর দিয়া অনেক পরিমাণে প্রতি বৎসর রপ্তানী হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারি• নাই। কলিকাতা বন্দর হইয়া যে তৈল বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা টিন-কানাস্তারায় করিয়া চালান হয়; প্রত্যেক টিনের ওজন ১০০ পাউণ্ড মাত্র। আর ম্যাঙ্গালোর বন্দর দিয়া যাহা রপ্তানী হয়, ২৭ তোলা মাত্র প্রত্যেক তাম্রপাত্রে আবদ্ধ করিয়া পাঠান হয়। ঐ স্থান হইতে যে কাষ্ঠ পাঠান হয়, তাহা প্রত্যেক বস্তায় (কান্দী) ৫ হন্দর মাত্র থাকে এবং চটে থলিতে অনেক করিয়া পাঠান হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রদেশের বন্দর দিয়া যাহা পাঠান হয়, তাহার জন্য ওজনের বিশেষ পরিমাণ লক্ষিত হয় না।

গুলঞ্চ

সংস্কৃত ভাষায় গুলঞ্চকে গুড়ূচী বলে। ইহা এক প্রকার লতা। বড় বড় বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া এই লতা উর্দ্ধদিকে উঠিয়া থাকে। ইহার পাতা প্রায় পান-পাতার মত হয়। ইহার গায়ের খোসা খুব পাতলা—কাগজের মত। কোন কোন লতায় ছোট ছোট কাঁটার মতও থাকে, কিন্তু সচরাচর কাঁটা দেখা যায় না।

এই লতা সচরাচর বেত বা লাঠির মত হয়, তবে অতি পুরাতন হইলে মানুষের বাহুর মতও মোটা হইয়া থাকে।

ভারতের সকল স্থানেই গুলঞ্চলতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চাষ করিবার জন্য বিশেষ কোন কষ্ট করিতে হয় না। সকল প্রকার মৃত্তিকায় গুলঞ্চলতা জন্মিয়া থাকে। তবে বালিসংযুক্ত মাটিতে ইহার অধিক বৃদ্ধি দেখা যায়।

ইহার মূল কাটিয়া দিলেও লতা মরিয়া যায় না, পুনরায় ইহা হইতে শিকড় নামিয়া বৃক্ষ হইতে অথবা মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। দেখা গিয়াছে যে, গুলঞ্চ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া রাখিয়া দিলে বর্ষাকালে ঐ শুষ্ক টুক্‌রা হইতে আপনা আপনি শিকড় বাহির হয়। তখন ঐ টুক্‌রাগুলি পুতিয়া দিলেও লতারূপে ইহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এমন কি, যতগুলি টুক্‌রা ততগুলি লতা আপনা আপনি জন্মাইয়া থাকে।

এই লতা দুই প্রকার। এক প্রকার লতা আছে—উহা কাটিলে তন্মধ্যে চক্রাকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রায় ৪০।৫০ হাত লম্বা হয়। ইহাকে **পদ্ম-গুলঞ্চ** বলে। ঔষধার্থে পদ্মগুলঞ্চই শ্রেষ্ঠ।

আর যে লতাতে পদ্মাকার কোন চক্র দৃষ্ট হয় না, সেগুলি লম্বায় আরও বড় হয় ও অধিক তেজাল হইয়া থাকে বটে, কিন্তু গুণে পদ্মগুলঞ্চের মত হয় না।

আবার যেরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া এই লতা উপরে উঠিয়া থাকে, ইহার গুণও তদনুরূপ হইয়া থাকে। তজ্জন্য কবিরাজেরা বলেন—, যেগুলি অম্লরসবিশিষ্ট বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া উঠে, যেমন—তেঁতুল, আম, আমড়া, উহা জ্বরের পক্ষে ভাল নহে। তবে বমি বা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে বেশ উপকার পাওয়া যায়। আর যে লতা নিম্বাদি তিক্ত-রস-বিশিষ্ট বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া উপরে উঠে, সেইগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং গুলঞ্চ-পাতা বা লতা ব্যবহার করিতে হইলে—নিম্বাদি বৃক্ষের গুলঞ্চ বাছিয়া লইতে হয়। পুরাতন জ্বরে এই লতায় সত্ত্ব উপকার পাওয়া যায়। এমন কি, কুইনাইন অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। তজ্জন্য ইহার অপর নাম **"জ্বরনাশিনী"।**

সংস্কৃতে গুড়ূচ্যাদি পর্য্যায় শব্দ—

"বৎসাদনা ছিন্নরুহা গুড়ূচা তন্ত্রিকাঽমৃতা।
জীবন্তিকা সোমবল্লী বিশল্যা মধুপর্ণ্যাপ॥"

ইতি অমরকোষঃ।

স্থানভেদে—নামভেদ

বাঙ্গালায়—গুলঞ্চ বা গুড়চা বা গোলা।

হিন্দী ও উর্দ্দুতে—গুড়চ, গিলোয়।

ফার্সিতে—গেলো।

গুজরাটী—গলো।

মহারাষ্ট্রে—গুঠবেল।

তৈলঙ্গে—তিপ্পতিগা, তিয়াতিজ।

পাঞ্জাবে—গলাহর।

আসামে—শগুনীলতা

বোম্বায়ে—গিরুলী।

ল্যাটিনে—Combuscord folia or Tinaspora cordifolia.

গুলঞ্চের—পাতা, ত্বক্, কাণ্ড ও মূল সকল অংশই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। তবে উহার গুণ বিভিন্ন প্রকার এবং মাত্রাও বিভিন্ন। যথা—

রস—অর্দ্ধ হইতে দুই তোলা।

ত্বক্‌চূর্ণ—দুই আনা হইতে চারি আনা ওজন।

ক্বাথ—পাঁচ হইতে দশ তোলা পর্য্যন্ত।

গুলঞ্চ সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রীষ্ম ঋতুতে সংগ্রহ করাই কর্ত্তব্য—কারণ, এই কালে এই লতায় তিক্ত পদার্থ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

ইহার **পাতার গুণ** ভাবপ্রকাশমতে—

"আগ্নেয়ত্বং সর্ব্বজ্বরহরত্বং লঘুত্বঞ্চ কষায়কং কটুত্বং তিক্তত্বং স্বাদুপাকিত্বং তথা রসায়নত্বং উষ্ণত্বং সংগ্রাহিতত্বঞ্চ।"

আর **লতার গুণ** ভাবপ্রকাশমতে—

"দোষত্রয়ামতৃড়্-দাহমেহকাস-পাণ্ডুতাকামলা-কুষ্ঠবাতাস্র-জ্বরকৃমিবমি-নাশিত্বঞ্চ।"

পত্রেও এই গুণগুলি দৃষ্ট হয়।

আর রাজনিঘণ্টুতে—

"গুরুত্বং বীর্য্যদাতৃত্বঞ্চ ভ্রমনাশিত্বঞ্চ"

আবার অনুপানাদি ব্যাধি অনুযায়ী বিভিন্ন।

ঘৃতযুক্তায়া—বাতনাশিত্বম্

গুড়যুক্তায়া—বিবন্ধনাশিত্বম্

সিতাযুক্তায়া—পিত্তনাশিত্বম্
মধুযুক্তায়া—কফনাশিত্বম্
এরণ্ডতৈলযুক্তায়া—উগ্রবাতাস্রনাশিত্বম্
শুণ্ঠীযুক্তায়া—আমবাতনাশিত্বম্।

বৈদ্যক গ্রন্থমতে গুলঞ্চের গুণ

চরকমতে—গুলঞ্চের **কাণ্ডের** রস পান করিলে রসায়ন-ক্রিয়া সংসাধিত হয়।

কামলা রোগে প্রাতঃকালে গুলঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিবে।

পিত্তজনিত বমনে গুলঞ্চের ক্বাথ পান করা বিধেয়।

গুলঞ্চের রস ও দুগ্ধসহ যথানিয়মে তিল-তৈল পাক করিয়া সেই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

গুলঞ্চ সপ্তপর্ণের ক্বাথে শুণ্ঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রসূতির **স্তন্যদুগ্ধ** বিশোধিত হয়।

সুশ্রুতমতে—পিত্তপ্রবণ বাতরক্তে গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিবে। গুলঞ্চকে পেষণপূর্ব্বক উহা একটি মৃৎপাত্রের অভ্যন্তরভাগে লেপ দিবে এবং ঐ পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া দধি প্রস্তুত করিবে—পরে ঐ দধি হইতে **ঘোল** প্রস্তুত করিয়া সেই ঘোল পান করা **অর্শরোগীর** পক্ষে বিশেষ উপকারী।

বাতজ্বর-রোগে গুলঞ্চের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ভাবপ্রকাশমতে—গুলঞ্চের ক্বাথে পিপুল-চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর ও কফ বিনষ্ট হয়। **কামলারোগে** ঘোলের সহিত গুলঞ্চের পাতা পেষণ করিয়া পান করিবে।

চক্রদত্তমতে—গুলঞ্চ পিষিয়া শুণ্ঠীচূর্ণসহ আমবাত-রোগীকে সেবন করাইবে।

জ্বররোগীকে **শাকরূপে** গুলঞ্চের পাতা ভোজন করিতে দিবে।

তিল-তৈল বা কটু-তৈলসহ গুলঞ্চের রস সেবন করিলে **শ্লীপদ রোগ** প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠরোগীকে বলানুসারে গুলঞ্চের রস পান করাইলে বিশেষ উপকার পায়। ঔষধ জীর্ণ হইলে গব্যঘৃতের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। ইহাতে গলিত কুষ্ঠও আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাগ্‌ভট—

মেহরোগে গুলঞ্চের রসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে।

বঙ্গসেন—হৃদযস্থিত বায়ুতে অর্থাৎ অস্বাভাবিকরূপে বক **ধড়-ফড়** করিলে গুলঞ্চ পিষিয়া কিঞ্চিৎ মরিচচূর্ণ ও উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে।

ডাক্তারী মতে—

ডাঃ গুডিফ, ওসানেসী প্রভৃতি বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ গুলঞ্চ ব্যবহার করিয়া অনেক কঠিন কঠিন রোগে বিশেষ উপকার দেখিতে পাইয়াছিলেন—তজ্জন্য তাঁহারা অনেক সময়ে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে পুরাতন জ্বরে, সবিরাম জ্বরে, কম্পজ্বরে গুলঞ্চ-রসাদি প্রয়োগ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, ভারতে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ বিশেষ উপকারক।

বিশেষতঃ ইহার টাট্‌কা মূল বাসিভাতের জল ও চিনিসহ পান করাইয়া অনেক **প্রমেহ** রোগীকে আরোগ্য করাইয়াছিলেন। **প্লীহাদি-**সংযুক্ত জ্বরেও ইহা সেবনীয় এবং **বাত,** কুষ্ঠ ও **চর্ম্মবিকারে** (Impatigo) ও কামলা রোগেরও উপকারী। ইহা স্নিগ্ধ বলিয়া **মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে** বস্তিগত দুষ্ট শ্লেষ্মা-কর্ত্তৃক অল্প পরিমাণে রক্তবর্ণ মূত্রনির্গমনের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

গুলঞ্চের অরিষ্ট ও ফান্ট প্রস্তুত করাইয়া অনেক কঠিন কঠিন রোগে ডাক্তারগণ বিশেষ উপকার পাইয়াছেন।

কোন কোন বিচক্ষণ ডাক্তার বলেন যে, গুলঞ্চের **চিনি** ডাক্তারী টনিক অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

গুলঞ্চের **চিনি বাহির করিবার প্রক্রিয়া**—সর্ব্বপ্রথমে গুলঞ্চ-গাঁটগুলি কাটিযা বাদ দিবে, তাহার পর উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া ঘণ্টা দুই খানিকটা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহার পর মাঝে মাঝে চট্‌কাইয়া লইলে ভাল হয়, এবং ২৪ ঘণ্টা পরে লতাগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিবে, এবং জল ভালরূপে থিতাইলে আস্তে আস্তে উপরের জলটুকু ঢালিয়া লইলে, পাত্রের তলায় যে কাদার মত **পলি** পড়িয়া থাকে, উহাই গুলঞ্চের চিনি; উহা উত্তমরূপে শুকাইয়া লইলে গুলঞ্চের চিনি প্রস্তুত হইল।

উক্ত চিনি ১০০ ভাগ

পুরাতন গুড়—১৬ ভাগ

গব্যঘৃত—১৬ ভাগ

একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীর অবস্থামত ব্যবস্থা করিতে হয়। অর্থাৎ হজমশক্তি অনুযায়ী মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাক—দেখিবে, ডাক্তারী টনিক অপেক্ষা ইহা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

মুষ্টিযোগ

জ্বরে—গুলঞ্চের রস ১ তোলা মধুসহ পান করিলে সদ্য উপকার পাওয়া যায়।

পুরাতন জ্বরে—গুলঞ্চের পাতা শাকের মত রাঁধিয়া ভাতের প্রথম তিন গ্রাস খাইতে দিবে। অল্পদিনেই উপকার পাইবে।

সর্ব্বাঙ্গীন বাত (Rheumatism) রোগে গুলঞ্চের ক্বাথ ৫ তোলা প্রত্যহ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তবে উষ্ণ ক্বাথ ব্যবহার না করিয়া শীতল হইলে সেবন করিবে।

প্লীহা বড় হইলে—একপক্ষ কাল নিত্য গুলঞ্চ ব্যবহারে জ্বর বন্ধ হয় এবং দুর্ব্বলতা দূর হয়।

নিম্নলিখিত ঔষধটি প্লীহা-যকৃৎসংযুক্ত জ্বরে, বিষমজ্বরে ও পুরাতন জ্বরে অব্যর্থ ফলপ্রদ—

গুলঞ্চ	১ তোলা
গোলমরিচ	১ "
চিতামূলচূর্ণ	৩ "
নাটার শাঁস	১

এইগুলি পৃথক্‌ভাবে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, পরে উত্তমরূপে মিশাইয়া দুই আনা হইতে আরম্ভ করিয়া চার আনা পর্য্যন্ত সেবন করিলে জ্বরাদি নাশ হইবে।

অথবা—গুলঞ্চ, পিপ্পলী ও চিরতা সমান সমান পরিমাণে লইবে এবং পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া রোগীর বয়ঃক্রমানুযায়ী ৵০ হইতে ।০ আনা মাত্রায় একপক্ষ ব্যবহারে পুরাতন জ্বরাদিতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বিচক্ষণ কবিরাজগণ বলেন—ইহা জ্বরে ব্রহ্মাস্ত্র বলিলেও চলে।

কেহ কেহ বলেন—ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ, বেলপাতা ও শেফালিকাপত্র সমমাত্রায় লইয়া চূর্ণ করিবে, পরে আগুনে সেঁকিয়া উহার রস বাহির করিবে। সেই রস কিঞ্চিৎ মধুসহ সেবনে জ্বর যেরূপ হউক না কেন, অতি শীঘ্র প্রশমিত হয়। এতদ্ভিন্ন গুড়ূচ্যাদি ঘৃতাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহৃত হয়।

গুড়ূচীকৃতং গুড়ূচ্যা সহ পক্কং **ঘৃতং**

গুড়ূচীর ক্কাথ ও কল্কের সহিত দুগ্ধযুক্ত ঘৃত পাক করিলে তাহাকে গুড়ূচী-ঘৃত বলে।

গুড়ূচ্যাদি **কষায়**—গুড়ূচী, ধনে, আতইচ, শুঁঠ, বিল্বমুস্তা ও বালা এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত পাচনকে গুড়ূচ্যাদিকষায় বলে। এই পাচন শীতল করিয়া পান বিধেয়, ইহা সেবনে জ্বরাতিসার, হিক্কা, অরুচি, সর্দ্দি, পিপাসা ও গাত্রদাহ দূর হয়।—চক্রদত্ত।

গুড়ূচ্যাদি **ক্কাথ**—ভাবপ্রকাশে তিন রকম গুড়ূচ্যাদি ক্কাথ লিখিত আছে—

১। গুড়ূচী ও আমলকীসংযুক্ত ক্ষেতপাপড়ার ক্কাথ। ইহা সেবনে দাহ, শোষ ও শ্রান্তি উপসর্গযুক্ত পিত্তজ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

২। গুড়ূচী, চিরতা, কলা, বেণার মূল, অগুরু, মুথা তেউড়ী, আমলকী, কিস্‌মিস্, বাসক ও ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্যের ক্কাথকে গুড়ূচ্যাদি ক্কাথ বলে। ইহা সেবনে পৈত্তিক জ্বর বিনষ্ট হয়। প্রাতে মধুর সহিত সেবনীয়।

৩। গুলঞ্চ, নিমপাতা, ধনে, রক্তচন্দন ও কটকী এই সকল দ্রব্য দ্বারা যে ক্কাথ হয়, তাহাকে গুড়ূচ্যাদি ক্কাথ বলে। ইহা সেবনে পৈত্ত-শ্লৈষ্মিক জ্বর বিদূরিত হয় এবং পিপাসা, দাহ, অরুচি ও বমি নষ্ট হয়।

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে গুড়ূচীর গুণ—

গুড়ূচী, ধনে, নিম, পদ্মকাষ্ঠ ও চন্দন। ইহার গুণ—হিক্কা, অরুচি, সর্দ্দি, পিপাসা ও দাহনাশক।—চক্রদত্ত সুশ্রুত।

গুড়ূচ্যাদি **তৈল**—গুলঞ্চ ১০০ পল, ৪৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, দুগ্ধ ৬৪ সের, তিল-তৈল ১৬

সের, কল্কার্থ যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, রক্তচন্দনাদি প্রত্যেক ২ তোলা দিয়া পাক করিবে। এই তৈল পান ও অভ্যঙ্গরূপে ব্যবহার্য্য। ইহাতে বাতরক্ত ও কণ্ডু প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চের **ফান্ট**—গুলঞ্চ অৰ্দ্ধ ছটাক, শীতল জল ৫ ছটাক। আবৃত পাত্রে ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার মাত্রা অৰ্দ্ধ ছটাক হইতে দেড় ছটাক।

গুলঞ্চের **অরিষ্ট**—খণ্ডীকৃত গুলঞ্চ ২ ছটাক, সুরা ১০ ছটাক, সপ্তাহকাল ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে, মাত্রা—১ হইতে ২ ড্রাম।

ইহার মত উপকারী লতা আর দৃষ্ট হয় না। যে সময়ে এ দেশে কুইনাইনের উৎপাত ছিল না, সে সময় এই গুলঞ্চের ক্কাথাদি ব্যবহার করিয়া দুরূহ জ্বরে কবিরাজগণ বিশেষ উপকার দেখাইতেন। কিন্তু এক্ষণে কুইনাইনের প্রয়োগে গুলঞ্চের ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে, ফলও তদ্রূপ হইয়াছে, বারো মাস শিশি শিশি কুইনাইন খাও, আবার জ্বরে ভুগো! কিন্তু ভুলিয়াও গুলঞ্চের ব্যবহার করিও না!

গুলঞ্চের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—

"অথ লঙ্কেশ্বরো নাম্না রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
রামপত্নীং বলাৎ সীতাং জহার মদনাতুরঃ॥
ততস্তং বলবান্ রামো রিপুং জায়াপহারিণম্।
বলং বানরসৈন্যেন জঘান রণমূৰ্দ্ধনি॥
হতে তস্মিন্ সুরারাতৌ রাবণে বলগৰ্ব্বিতে।
দেবরাজঃ সহস্রাক্ষঃ পরিতুষ্টোঽপি রাঘবে॥
তত্র যে বানরাঃ কেচিদ্রাক্ষসৈর্নিহতা রণে।
তানিন্দ্রো জীবয়ামাস সংসিচ্যামৃতবৃষ্টিভিঃ॥

ততো যেষু চ দেশেষু কপিগাত্রাৎ পরিচ্যুতাঃ।
পীযূষবিন্দবঃ পেতুস্তেভ্যো জাতা গুড়ূচিকা ॥"

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, রামরাবণের যুদ্ধে রাক্ষসাধিপতি দশাননের নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে রামপক্ষীয় অনেক বানরসৈন্য নিহত হয়। রাম মৃত বানরগুলিকে বাঁচাইবার জন্য সুরপতির নিকট প্রার্থনা করেন। সুরপতি নিহত বানরগুলির উপরে অমৃত বর্ষণ করিলে মরা বানরগুলি বাঁচিয়া উঠিল। তাহাদের গায়ের অমৃতগুলি চারিদিকে মাটিতে পড়িয়া গেল, সেই সকল অমৃতবিন্দু হইতে সর্ব্বপ্রথমে গুড়ূচীর উৎপত্তি হয়।

হকীমগণ বলেন—Diabetes রোগে যখন অধিক পরিমাণে শর্করা নির্গত হয় এবং যখন প্রস্রাব করিলে ঐ স্থানে পিঁপড়া ধরে, তখন গুলঞ্চের চূর্ণ সমপরিমাণে ইক্ষু গুড়সহ হাতের তেলোর পরিমাণে খালি পেটে খাইলে ত্বরায় শর্করা-ভাগ অদৃশ্য হয়।

গুলঞ্চের **চিনি**—পুরাতন গ্রহণী, শুক্রমেহ ও অর্শরোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

মধুপুরে আসিয়া দেখিলাম, এখানে গুলঞ্চলতা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তবে নিমগুলঞ্চ কোথাও দেখিতে পাই নাই। তজ্জন্য আমার মধুপুর উদ্যানে যতগুলি নিম্ববৃক্ষ আছে, প্রত্যেকের মূলদেশে গুলঞ্চলতার শিকড় আনিয়া পুতিয়া দিয়াছি। এক্ষণে ঐ লতাগুলি বেশ বড় হইয়া নিম্ব গাছগুলির শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে।

গুলঞ্চের চিনির সহিত বংশলোচন ও ছোট এলাচদানা চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে **ম্যালেরিয়া** বিদূরিত হয় এবং জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

তাই আমাদের দেশে লোকে সচরাচর বলিয়া থাকেন—

নিম গুলঞ্চ যেথা
মানুষ মরে কি সেথা ?

ঋতু ও তিথি হিসাবে

খাদ্যাখাদ্যের বিচার

পঞ্জিকা খুলিলেই আমরা দেখিতে পাই, অমুক তিথিতে—অমুক দ্রব্য-ভক্ষণ নিষেধ। আমরা অনেক সময়ে ঐ সকল বাক্য উপেক্ষা করি এবং সভা-সমিতিতে আমাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রদর্শনার্থ সময়ে সময়ে পঞ্জিকাকার-গণকে ও হিন্দুশাস্ত্রকারগণকে উপহাস করিতেও পশ্চাৎপদ হই না।

কিন্তু হায়, কি কারণে যে আমাদের শাস্ত্রকারগণ ঐরূপ নিষেধ-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য কখন আমাদের মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে চাই না।

যাহা হউক, আজ আমরা পঞ্জিকাকারগণের উক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের পাঠকবর্গের অমূল্য সময়ের কিঞ্চিৎ অপব্যব-হার করিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হইলেও সাহসে ভর করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

পঞ্জিকাকার বলেন—প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী, তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলা পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমী শাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় মাংস ভক্ষণ নিষেধ।

এক্ষণে দেখা যাউক, ঐ সকল নিষেধবাক্যের মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কি না, অথবা উহা কেবল শাস্ত্রকারগণের প্রলাপবাক্যমাত্র।

শাস্ত্রে বলে—খাদ্য এক পক্ষে যেমন জীবন, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মরক্ষার প্রধান উপাদান, অপর পক্ষে পাপ ও রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণ।

অনেক ভাবেন ও বলেন—খাদ্যের সহিত পাপ ও পুণ্যের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে,—স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে ধর্ম্মার্জ্জন করা অসম্ভব, সুতরাং যে যে দ্রব্যে স্বাস্থ্যনাশ হয়—সেই সেই দ্রব্যই যে ধর্ম্মনাশক—পাপজনক, তাহা বলা বাহুল্য।

সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রে খাদ্যকে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া খাদ্যের ভেদাভেদ দেখান আছে।

সাত্ত্বিক খাদ্যে কেবল যে সহসা কোন রোগোৎপাদন করে না, তাহা নহে; মন নির্ম্মল ও পবিত্রভাবাপন্ন করে এবং ধর্ম্মার্জ্জনের পক্ষে সহায়তা করে। তজ্জন্য সাত্ত্বিক খাদ্যের আমাদের শাস্ত্রে ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়। অপর পক্ষে রাজসিক ও তামসিক খাদ্যের নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। কারণ, ঐরূপ খাদ্যে নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়—তৎসঙ্গে ধর্ম্মার্জ্জনে ব্যাঘাত জন্মায়, সুতরাং পাপের পথ মুক্ত হয়।

এতদ্ভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রপ্রমুখী ভ্রমণশীলা পৃথিবীর গতি অনুসারে মাস, ঋতু ও চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি নিবন্ধন—প্রতিপদাদি তিথির উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তনক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, যাহার সহিত আমাদের দেহস্থ ধাতুর ক্ষয়বৃদ্ধি ও বক্রতাবৃদ্ধিও হ্রাস করে।

ঋতু ও তিথিভেদে খাদ্যাখাদ্যের ব্যবস্থা

আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে ঋতু ও তিথিভেদে মানবদেহের কি সম্বন্ধ, বিশেষরূপে লিখিত থাকিলেও, আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সকল গ্রন্থাদি পাঠ না করিয়াই কেবল আমাদের পঞ্জিকায় যে লেখা আছে—প্রতিপদে কুষ্মাণ্ডভক্ষণ নিষেধ, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকুভক্ষণ করিও না ইত্যাদি নিষেধবাক্য পাঠে আমরা সময়ে

সময়ে শাস্ত্রকার ও পঞ্জিকাকারগণকে উপহাস করিয়া আমাদের বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ঐ সকল নিষেধ-সূচক বাক্যের মধ্যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, তাহা অবগত হইবার জন্য উৎসুক হইয়া হিন্দুর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে বাসনা করেন, তাঁহারা অবগত হইবেন যে, ঐ সকল নিষেধসূচক বাক্য নেহাৎ উপহাসযোগ্য নহে।

১। সম্প্রতি আমি একখানি তান্ত্রিক-চিকিৎসা-সার নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, ঐ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

"পক্ষদ্বয়ে প্রতিপদি কফ-ধাতুর্ভবেৎ পুনঃ।
লবণেন সমাযুক্তো দ্বিতীয়ায়াং তথৈব চ॥ ১
পিত্তধাতুশ্চ বায়ুশ্চ ক্রমাচ্চ ভৃশমুষ্ণতাম্।
তীক্ষ্ণত্বঞ্চ সমাপ্নোতি তৃতীয়ায়াঞ্চ শোণিতম্॥ ২
অত্যন্তমুষ্ণতাং প্রাপ্তং বায়ুশ্চ ক্রূরতাং গতঃ।
ক্রূরেণ বায়ুনা রক্তং সাচীভাবেন চালিতম্॥" ৩

অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় প্রতিপদে—শ্লৈষ্মিক ধাতু অপেক্ষাকৃত লবণরসাশ্রিত হয়, এবং দ্বিতীয়ায় পৈত্তিকধাতু অতীব উষ্ণ ও বায়ু রুক্ষ হয়, এবং তৃতীয়ায় শোণিত অত্যন্ত উষ্ণ, আর বায়ু ক্রূরভাব ধারণ করে এবং বায়ুর ক্রূরতায় ধমনীতে রক্ত সাচী-(বক্র) ভাবে চালিত হয়।

অন্য দিকে আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে পাঠ করিতে পাই—

"কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরুপিত্তাস্রবাতনুৎ।
বল্যং লঘুঞ্চ সক্ষারং দীপনং বস্তিশোধনম্॥"

অর্থাৎ কুষ্মাণ্ড পুষ্টিকারক, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরু, রক্ত-পিত্ত-নাশক, লঘু, উষ্ণ, ক্ষারগুণসম্পন্ন, অগ্নি উদ্দীপক ও বস্তিশোধক।

পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে যে, শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় প্রতিপদেই—শ্লৈষ্মিক ধাতু অপেক্ষাকৃত লবণরসাশ্রিত হয়। আবার শ্লেষ্মা স্বভাবতঃই লবণরসাত্মক।

চিকিৎসকেরা বলেন—লবণের আধিক্যে ব্রণাদি ক্লেদ-রোগ জন্মে।

কুষ্মাণ্ডে লবণের ভাগ—(ক্ষার) অত্যধিক পরিমাণে আছে, সুতরাং কুষ্মাণ্ড প্রতিপদে ভোজন করিলে তিথিসঞ্জাতলবণরসের পরিমাণ সমধিক বর্দ্ধিত হয়। তজ্জনিত ব্রণাদি-ক্লেদরোগ উৎপন্ন হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

তন্নিবারণ জন্য শাস্ত্রে বলিতেছে—

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

ইহা অনুমাণ-সাপেক্ষ নহে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে ব্রণাদি ক্লেদ রোগ বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং যাহার ঐ রোগ নাই, তাহাদের শরীরে ঐ সকল রোগ সহসা দেখা দেয়। •

বলা বাহুল্য, এ সকল পরীক্ষাসাপেক্ষ। সুতরাং ইহা পরীক্ষা করিয়া পরে উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

২। তাহার পর দ্বিতীয়ায়—পৈত্তিক ধাতু অতীব উষ্ণ ও বায়ু রুক্ষ হয়, এবং দ্বিতীয়ায়—বৃহতী (ক্ষুদ্র বেগুন) ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কারণ, বৃহতী পিত্তোষ্ণকারিণী, ক্রূরবায়ু-বর্দ্ধিনী।

"বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা তীক্ষ্ণা পিত্তোষ্ণকারিণী।
পাচনী দীপনী বৃষ্যা ক্রূরবাত-প্রকোপিনী॥"

তাই দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভোজন করিলে—ঐ তিথিসম্ভূত পিত্তের উষ্ণতা ও বায়ুর ক্রূরতা সমধিক প্রবল হয়। তন্নিবন্ধন সময়ে সময়ে দেখা যায়, অর্ব্বুদ—আব নামক রোগোৎপন্ন হয়। তন্নিবারণ জন্যই দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ।

৩। তৃতীয়ায়—পটোল ভক্ষণ নিষেধ কেন ?

"পটোলং কফপিত্তাস্বকৃজ্জ্বরদুষ্টব্রণাপহম্
পাচনং তর্পণং বৃষ্যং শোণিতশ্লোষ্ণকৃ দ্গুরু।

স্নিগ্ধোষ্ণং বৃংহণং স্বর্য্যং রুচ্যগ্নির্বলবর্দ্ধনম্
বিসর্পণ-জলব্যাধি-ত্রিদোষাণাং বিনাশনম্ ॥"

অর্থাৎ, পটোল—কফ, রক্তপিত্ত, জ্বর, ব্রণ, বিসর্প, জলব্যাধি ও ত্রিদোষ-নাশক, পরিপাকজনক, তৃপ্তিকর, শোণিতোষ্ণকারক, স্নিগ্ধোষ্ণ, স্বরগুণ-বিশিষ্ট, রুচিকারক, তৃপ্তিকারক এবং অগ্নি বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

সুতরাং দেখা গেল, পটোল রক্তোষ্ণকারক ও স্নিগ্ধোষ্ণ, এবং মধুরাম্ল রসাত্মক।

তৃতীয়ায়—রক্ত অত্যন্ত উষ্ণ, আর বায়ু ক্রূরভাব ধারণ করে। বায়ুর ক্রূরতায় ধমনীতে রক্ত সাচীভাবে চালিত হয়। ঐ সময়ে রক্তের উষ্ণতা-বর্দ্ধক স্নিগ্ধোষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিলে সেই বাতাক্রান্ত সাচীগামী উষ্ণ রক্ত আরও অধিক উষ্ণ হয়। বায়ু-সম্পর্ক-সম্পন্ন শোণিতের এই ক্রিয়া-বৈষম্যে রক্তবাত ব্যাধি জন্মে।

সত্য বটে, পটোল বাতাদি ত্রিদোষ-নাশক, কিন্তু শোণিতের উষ্ণ বিকার নিরতিশয় বৃদ্ধি করে।

সুতরাং তৃতীয়ায় পটোল ভক্ষণ করিলে—তিথিসম্ভূত সাচীগামী উষ্ণ রক্ত অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণ এবং ক্রূর বায়ু-সংমিশ্রণে রক্তবাত রোগে পরিণত হওয়া সম্ভব। এই জন্যই তৃতীয়ায় পটোল ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

৪। চতুর্থীতে মূলক-ভক্ষণ নিষেধ। মূলকের দোষগুণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"মূলকং গুরু বিষ্টম্ভী তীক্ষ্ণমামং ত্রিদোষকৃৎ।

তদেব স্নিগ্ধসিদ্ধন্তু পিত্তকৃৎ কফবাতনুৎ ॥"

অর্থাৎ—মূলক গুরু, মলধারক, তীক্ষ্ণ, আম ও বায়ু-পিত্ত-কফের ক্রূর-রুক্ষ-প্রাবল্যাদি বিকার উৎপাদক। কিন্তু তৈলাদি স্নেহে সিদ্ধ (পাক) করিলে মূলক কেবলমাত্র পৈত্তিক বিকার বৃদ্ধি করে। কফ বা বায়ু-বিকার স্নেহসিদ্ধ মূলকে বিনষ্ট হয়।

আর তিথি নিবন্ধন—

"চতুর্থ্যাং পিত্তধাতুশ্চ শ্লৈষ্মিকো ধাতুরেব চ।
দ্বৌ ধাতু রুক্ষতাং প্রাপ্তৌ বায়ুশ্চ ক্রূরভাবগঃ
রুক্ষাভ্যাঞ্চ তদা তাভ্যাং ক্রূরভাবেন বায়ুনা।
মলাধারান্মলং সর্ব্বং নিঃসৃতং ন যথোচিতম্।
তেনৈব হেতুনা ধীর বেদনোদ্বেগ এব চ।
ভবত্যেব হি লোকানাং আমরোগস্য লক্ষণম্॥"

অর্থাৎ চতুর্থীতে পৈত্তিক ধাতু ও শ্লৈষ্মিক ধাতু রুক্ষ হয় এবং বায়ু ক্রূরভাব ধারণ করে। বায়ুর ক্রূরতায় ও পিত্তশ্লেষ্মার রুক্ষতায় মলাধারস্থ মল যথোপযুক্ত নিঃসৃত না হওয়ায় দূষিত হয়। পুরীষত্যাগের পূর্ব্বে মলদ্বারে যেরূপ বেদনা আর উদ্বেগ জন্মে, ধাতুত্রয়ের বিকার নিবন্ধন কোষ্ঠ সমুচিত পরিষ্কার না হওয়ায় সেইরূপ বেদনা উদ্বেগ অর্থাৎ আমোৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মূলক ধাতুর ক্রূরতা ও রুক্ষতা নাশ করে না। ইহা ভিন্ন মূলক আমকারক। যে যে দ্রব্য আমকারক, তাহাই ত্রিবিধ ধাতুরই রুক্ষতা ও ক্রূরতাবর্দ্ধক ; সুতরাং মূলক আমরোগের উৎপত্তির কারণ হয়।

এই সময় কোথায় পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ুর ক্রূরতানাশক দ্রব্য ভোজন করিবে, তাহা না করিয়া যদি মূলক ভোজন করা যায়, তবে আমরোগকে প্রশ্রক দেওয়া হয়। এই জন্যই চতুর্থীতে মূলক-ভক্ষণ নিষেধ।

৫। পঞ্চমীতে—বিল্ব-ভক্ষণ নিষেধ—

বিল্ব-ফলের দোষগুণ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"শ্রীফলস্তু বরস্তিক্তো গ্রাহী রুক্ষোঽগ্নিপিত্তকৃৎ।
বালঃ শ্লেষ্মহরো বল্যো লঘুরুষ্ণশ্চ পাচনঃ॥"

অর্থাৎ—শ্রীফল কষায় ও তিক্তরসাত্মক, ধারকগুণবিশিষ্ট, রুক্ষ, অগ্নি ও পিত্তকারক। তরুণ বিল্ব শ্লেষ্মানাশক, লঘু, বলোদ্দীপক, উষ্ণ ও পাচক।

অন্যদিকে পঞ্চমীতিথিযোগে—

"পঞ্চম্যাঞ্চ তিথৌ পিত্তং প্রবলত্বং ব্রজেত্তথা।"

অর্থাৎ—পঞ্চমীতে পিত্ত প্রবল হয়।

সুতরাং একে পঞ্চমী তিথিতে আপনা-আপনি পিত্ত প্রবল হয়, তাহার উপর আবার পিত্তবর্দ্ধক বিল্ব ভোজন করিয়া পিত্তসম্বন্ধীয় রোগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়—তাহা নিঃসন্দেহ। সেই জন্যই পঞ্চমীতে বিল্ব ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

৬। ষষ্ঠী তিথিতে নিম্বক (কাজলী লেবুও ঐরূপ) নিষিদ্ধ।

"শিরায়াং শৈত্যভাগস্য ষষ্ঠ্যাং বৃদ্ধির্ভবেদ্ভৃশম্।"

অর্থাৎ ষষ্ঠীতে নাড়ীতে শৈত্যের ভাগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়। আর—

নিম্বকং ক্রিমিসংমূহনাশকম্

* * *

কিলং শীতরসং বর্দ্ধনস্ত্ৎশম্

অর্থাৎ নিম্বক শিরানিহিত শৈত্যরস অত্যন্ত বৃদ্ধি করে।

একে ষষ্ঠীতে শিরাসমূহ শৈত্যরসার্দ্রিত হয়, তাহার উপর শৈত্যরস-বর্দ্ধক অম্লগুণসম্পন্ন নিম্বক ভোজনে শিরাসংস্থিত শৈত্যরস নিম্বকের ঐ শীতাম্লরসসংমিশ্রণে আরও প্রবল হয়, এবং তাহার ফলে জলব্যাধি (অর্থাৎ কোষরোগ এবং গণ্ডমালা প্রভৃতি) দেহমধ্যে আশ্রয় পায়। সেই হেতু ষষ্ঠী তিথিতে নিম্বক-ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৭। সপ্তমী তিথিতে তাল-ভক্ষণ নিষেধ। কারণ, তান্ত্রিক চিকিৎসা-শাস্ত্র মতে—"রক্তপিত্তঞ্চ সপ্তম্যাং যুগপত্তরলং ভবেৎ।"

অর্থাৎ সপ্তমীতে রক্ত ও পিত্ত উভয়ই যুগপৎ তরল হয়।

আর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসামতে—

"পক্বং তালং তু মধুরং কফ-পিত্তাস্রবর্দ্ধনম্।"

অর্থাৎ তাল কফ ও রক্তপিত্ত-রোগবর্দ্ধক। একে ত' সপ্তমী তিথিতে রক্ত ও পিত্ত যুগপৎ তরল হয়, তাহার উপর রক্তপিত্তবর্দ্ধক তাল ভক্ষণ করিয়া সাদরে রক্তপিত্ত-রোগকে আহ্বান করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এই জন্য সপ্তমী তিথিতে তাল-ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৮। "অ.মী তিথিতে নারিকেল-ভক্ষণ নিষেধ।

"অষ্টম্যামগ্নিমান্দ্যঞ্চ পাকস্থানঞ্চ দুর্ব্বলম্।"

অর্থাৎ অষ্টমীতিথিতে অগ্নিমান্দ্য হয় ও পাকস্থলী দুর্ব্বল হয়।

এদিকে আয়ুর্ব্বেদমতে—

"বিশেষতঃ কোমলনারিকেলং
নিহন্তি পিত্তজ্বরমূত্রদোষান্।
তদেব বৃদ্ধং গুরু পিত্তকারী
বিদাহী বিষ্টম্ভী মতং ভিষগ্‌ভিঃ॥"

সত্য বটে, ডাব পিত্ত, জ্বর, মূত্র-দোষ নাশ করে। কিন্তু পক্ব নারিকেল গুরু, পিত্তকারক, দাহপ্রদ ও মলরোধক। সুতরাং তিথিনিবন্ধন যখন অগ্নিমান্দ্য ও পাকস্থলী দুর্ব্বল হয়, সেই সময় গুরু, পিত্তকারক, দাহপ্রদ ও মলরোধক নারিকেল ভক্ষণ না করাই উচিত। ভোজনে অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হওয়া আশ্চর্য্য নহে। তজ্জন্য অষ্টমীতে নারিকেল-ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

৯। নবমীতে তুম্বী (লাউ) ভক্ষণ নিষেধ। কারণ—

"নবম্যাং কুপিতো বায়ুঃ শ্লেষ্মা তু চোষ্ণতাং গতঃ।"

অর্থাৎ নবমী তিথিতে বায়ু কুপিত হয় ও শ্লেষ্মা উষ্ণ হয়। আর—

"অলাবুঃ শীতলা গুর্ব্বী মধুরা পিত্তনাশিনী।
বাতশ্লেষ্মকরী রুক্ষা দুর্জ্জরা মলভেদিনী॥"—স্মৃতি আহ্নিকতত্ত্ব।

অর্থাৎ লাউ শৈত্য-গুণসম্পন্ন, পাকে গুরু, মধুররসাত্মক, পিত্তনাশিনী। বাতশ্লেষ্মারোগকারিণী, স্নেহন্ত মলের কাঠিন্যনাশিনী এবং অতিকষ্টে ও অধিক বিলম্বে জীর্ণ হয়।

নবমীতে যখন বায়ু কুপিত ও শ্লেষ্মা উষ্ণ হয়, সেই সময়ে শ্লৈষ্মিক রোগকারক লাউ ভোজন কোনমতে বিধেয় নহে, কারণ, উভয়ের পরস্পর সংক্রমণে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ উৎপন্ন হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। তাই নবমীতে লাউ-ভক্ষণ নিষেধ।

১০। দশমী তিথিতে কলম্বী শাক ভোজন নিষেধ। কারণ—

"দশম্যাং ক্রূরপিত্তস্তু অম্লবৃদ্ধির্ভবেত্তদা।
বাত-শ্লৈষ্মিক-সন্তাপ-কফীয়-জ্বরকারকঃ।"

অর্থাৎ—দশমীতে ক্রূর পিত্ত ও অম্ল বৃদ্ধি হয়।

আর—কলম্বী শাকের দোষগুণ লিখিত আছে—

"কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী।
অম্লপিত্তকরী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা মলবর্দ্ধিনী॥"

অর্থাৎ কলম্বীশাক ভোজনে স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ ও পুরুষের শুক্র বৃদ্ধি হয়। ইহা স্নেহযুক্তা। কিন্তু—অম্লপিত্ত রোগ, শ্লেষ্মা আর মলবৃদ্ধিকারিণী।

এক্ষণে দেখা গেল, দশমী তিথি-সংযোগে ক্রূরপিত্ত ও অম্লভাগ বৃদ্ধি হয় —যাহার ফলে কবিরাজগণ বলেন—উভয়ের পরস্পর সংক্রমণে অম্লপিত্ত রোগ জন্মে। আর ঐ অম্ল ও পিত্তের প্রাবল্যসময়ে তাহার উপশম না করিয়া—অম্লপিত্ত-রোগ-কারিণী কলম্বী ভোজন করিলে যে অম্লপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। তাই দশমীতে কলম্বী-ভক্ষণ নিষেধ।

১১। একাদশী তিথিতে—শিম্ব (শিম) ভক্ষণ নিষেধ। এই তিথিতে—

"রসং সংজায়তেহত্রাপি একাদশ্যাং ন সংশয়ঃ।
ক্রূরস্য শ্লেষ্মণো বৃদ্ধী রক্তস্য চ তথৈব হি।"

অর্থাৎ একাদশীতে নাড়ীতে শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরোৎপাদক রসের সঞ্চার হয়। ক্রূরশ্লেষ্মা বৃদ্ধিও হয়, এতদ্ভিন্ন শরীরে রসবৃদ্ধি হয়। আর—

"শিম্বী তু শীতলা গুর্ব্বী মধুরা পিত্তনাশিনী।
কটুরসকৃদ্বৃষ্যা জ্বর-শ্বাস-করী মতা।"

অর্থাৎ শিম্বী (শিম)—শৈত্যগুণসম্পন্ন, পাকে গুরু, মধুরা, পিত্ত-নাশিনী, কটুরস ও বলকরী। কিন্তু জ্বর ও শ্বাসরোগকারিণী।

একদিকে তিথি-সংযোগে নাড়ীতে শ্লৈষ্মিক, বাত-শ্লৈষ্মিক জ্বর-কারক রসের সঞ্চার হয়, অন্যদিকে রস ও জ্বরকারিণী ও শ্বাসকারিণী শিম্বী উপযোগ করিলে জ্বরোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। সেই হেতু—একাদশী তিথিতে শিম্বী-ভক্ষণ নিষেধ।

১২। দ্বাদশী তিথিতে পূতিকা (পুঁইশাক) ভক্ষণ নিষেধ।

তিথি-সংযোগে মানব-দেহে—

"ক্রূরস্য শ্লেষ্মণা বৃদ্ধী রক্তস্য চ তথা পুনঃ।
বায়ুঃ ক্রূরভাবশ্চ দ্বাদশ্যাস্তু ভবেত্তথা॥"

অর্থাৎ দ্বাদশী তিথিতে রক্ত ও ক্রূর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, বায়ুও ক্রূর হয়। আর—

"পূতিকা শ্লেষ্মলা গুর্ব্বী পিত্তপ্রকোপিনী।
দুর্জ্জরা মধুরা রুচ্যা কাসাস্রবাতবর্দ্ধিনী॥"

অর্থাৎ পূতিকা পাকে গুরু, অতি কষ্টে ও অধিক বিলম্বে জীর্ণ হয়, স্বাদে মধুর (স্নিগ্ধ), শ্লেষ্মাকারিণী, রুচিপ্রদা, আর পিত্ত, বায়ু, রক্ত ও কাসবর্দ্ধিনী।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তিথিদোষে মানবদেহে রক্ত ও ক্রূরশ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, এবং বায়ুও ক্রূর হয়।

তাহার উপর বায়ু, পিত্ত ও রক্তকাস-বিবর্দ্ধক পূতিকা ভক্ষণে যে কাস-রোগের সঞ্চার হয়, তাহা সুনিশ্চিত।

অর্থাৎ ক্রূর বায়ু-সঞ্চালিত ক্রূর শ্লেষ্মা ঐ সময়ে কণ্ঠদেশ অধিকার করে, তাহার ফলে কাস-রোগ উৎপন্ন হয়।

তাহার উপর কাসের সঞ্চার কালে যদি রক্তকাস (যক্ষ্মাদি) উৎপাদক দ্রব্য ভোজন করা যায়, তাহার ফল যে ভীষণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?

প্রথমতঃ অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, পরে নানাপচারে ঐ রোগ প্রাবল্য লাভ করে।

বাঙ্গালী পূতিকা-ভক্ষণের জন্য লালায়িত। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ বলেন—

"কুসুম্ভং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পূতিকাস্তথা।
ভক্ষয়ন্ পতিতস্তু স্যাদপি বেদান্তগো দ্বিজঃ॥"

অর্থাৎ কুসুম্ভ শাক, শ্বেত কলম্বী শ্বেত বার্ত্তাকী এবং পূতিকা ভোজনে বেদপারগ ব্রাহ্মণও পতিত হয়।

পুনশ্চ—পূতিকা দ্বাদশ্যামধিকদোষায় শূদ্রবিষয়িকা বা।

অর্থাৎ দ্বাদশী তিথিতে শূদ্রের পক্ষে দোষাবহ, আর ব্রাহ্মণের ত' কথাই নাই। কারণ, একে পূতিকা ত্রিদোষবর্দ্ধিনী, তাহার উপর দ্বাদশী তিথি-সংযোগে শীতোষ্ণক্রূরপ্রকোপাদির কোন না কোন বিকার উৎপাদন করে, ইহা সুনিশ্চিত।

যাহাতে ঐরূপ বিকার উৎপাদন না হয়, তজ্জন্যই দ্বাদশীতে পূতিকাভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

১৩। ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী-ভক্ষণ নিষেধ।

"বার্ত্তাকী পাচনী বৃষ্যা কণ্ডূকৃদ্রক্তপিত্তমুৎ।"

অর্থাৎ বার্ত্তাকী পরিপাককারিণী হইলেও শুক্রদা ও কণ্ডূ-রোগোৎপাদিনী।

আর ত্রয়োদশী তিথিতে—

"ঘনীভূতং ভবেদ্রক্তং বায়ুশ্চ মৃদুতাং গতঃ।
মৃদুনা বায়ুনা রক্তং চালিতং ন যথোচিতম্॥
কুত্রচিৎ-কুত্রচিৎ স্থানে বদ্ধঃ স্যাদ্দূষিতং তথা।
ত্রয়োদশ্যান্তু চৈতানি ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ—ত্রয়োদশী তিথিতে—রক্ত ঘনীভূত, বায়ুর মৃদু গতি হয় এবং বায়ুর গতি মৃদু হওয়ায় রক্তও যথোচিত চালিত হয় না, এমন কি, স্থানে স্থানে বায়ুর দোষে রক্ত বদ্ধ হইয়া দূষিত হয়।

চিকিৎসকগণ বলেন—রক্ত দূষিত হইয়া কণ্ডুরোগ উৎপন্ন করে।

কোথায় ত্রয়োদশীতে এমন দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, যাহাতে বাতোদ্দীপক হয় ও রক্তদোষ বিদূরিত হয়, তাহা না করিয়া যদি বায়ু-প্রকোপনাশিনী, রক্তদোষণী, কণ্ডুকারিণী বার্ত্তাকী ভোজন করা হয়—ফল যে বিষম হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

১৪। চতুর্দ্দশীতে—মাষকলাই ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

মাষকলাই সম্বন্ধে কবিরাজগণ বলেন—

"মাষো বহুমলো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণো মধুরো গুরুঃ।
বাতঘ্নত পিত্তলো বল্যো মেদ-মাংস-কফপ্রদঃ॥"

অর্থাৎ—মাষকলাই অতিরিক্ত মলবৃদ্ধিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নেহযুক্ত, উষ্ণগুণ-সম্পন্ন, স্বাদে মধুর, পাকে গুরু, বায়ুনাশক, বলকর, কফ পিত্ত ও মেদরোগকারক ও মাংসপ্রদ।

আর চতুর্দ্দশী তিথিতে—

"চতুর্দ্দশ্যামপানস্থঃ বায়ুরূর্দ্ধং গতস্তথা।
তেনৈবানাহরোগশ্চ উদরস্তম্ভনস্তথা॥"

চতুর্দ্দশীতে—অপান বায়ু ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় (কোষ্ঠবদ্ধ) আনাহ-রোগ সঞ্চার করে ও উদর স্তম্ভিত হয়।

এই সময়ে—অপান (গুহ্যদেশস্থ) বায়ুর বিকার নাশক দ্রব্য ভোজন না করিয়া যদি বহু মলবর্দ্ধক অতিসার-রোগোৎপাদক গুরুপাক-বিশিষ্ট মাষকলাই ভোজন করা যায়, তখন অতিসারাদি উদরাময়ে পরিণত হইতে পারে। এই জন্যই চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ভোজন নিষিদ্ধ।

১৫। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিদ্বয়ে—মাংস ভক্ষণ অবৈধ।

আজকাল হিন্দুগণ মাংস ভক্ষণে এত পটু হইয়াছেন যে, মাসের মধ্যে দুই-একদিনও বাদ দিতে চাহেন না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে যখন লিখিত আছে—

"মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং কফপিত্তকৃৎ।
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রস-পাকয়োঃ॥"

অর্থাৎ—মাংস বায়ুনাশক, কিন্তু কফকারক ও পিত্তকারক হইলেও পুষ্টিকারক, প্রীতিপ্রদ, গুরু ও হৃদয়ের স্বাস্থ্যসাধক, রসে ও পাকে মধুর।

যাহাতে এতগুলি গুণ আছে, তন্মধ্যে কফ ও পিত্তকারকে কি যায় আসে ? কিন্তু অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বিনা অপচারে কিয়ৎপরিমাণে কফের সঞ্চার হয় এবং কফের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে শরীর উষ্ণ হয় পাচিকা শক্তি দুর্ব্বল হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জ্বরোৎপত্তির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

ইহা স্পষ্ট করিয়া হিন্দুর শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"পৌর্ণমাস্যাং ভবেৎ শৈত্যগুণস্য চাতিবর্দ্ধনম্।
সুধাংশোঃ পূর্ণরূপত্বাদিতি বেদবিদো বিদুঃ।
কুহ্বাং চন্দ্রকলানষ্টাদুষ্মনশ্চাতিবর্দ্ধনম্।
পাকশক্তের্দুর্ব্বলত্বং কফোৎপত্তেশ্চ কারণম্॥"

অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় চন্দ্রের ষোড়শ কলার ক্রিয়াকাল পূর্ণ হওয়ায় শৈত্যের পর উষ্ণতা এবং উষ্ণতার পর শৈত্যের সঞ্চার হয়। তন্মধ্যে শুক্লপক্ষে শৈত্য এবং কৃষ্ণপক্ষে উষ্ণতার বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শৈত্যবৃদ্ধি হয়, আর কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্রের কলার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে শৈত্য হ্রাস ও উষ্ণতার বৃদ্ধি হয়। এইরূপ শীতোষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি হেতু অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায়—বিনা অপচারেও কফের সঞ্চার হয়। তাহার ফলে নাড়ীতে কফ-সংক্রমণে শরীর উষ্ণ, পাচিকা শক্তি দুর্ব্বল এবং তদ্ধেতু কফোৎপত্তির লক্ষণও আংশিক প্রকাশ পায়।

সত্য বটে, মাংস পরিপাক হইলে—উপকারক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, পাচিকা শক্তি দুর্ব্বল থাকা কালে মাংস আহার করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হয়, আর পরিপাকের ব্যতিক্রমে পাকস্থলী দূষিত হওয়ায় বিষময় ফল ফলে। এতদ্ভিন্ন যে সময় নাড়ী কফের বিকারাপন্ন, সে সময়ে মাংস-ভোজনে ঐ নাড়ীস্থ কফ মাংসস্থ কফপিত্ত-রস-সংযুক্ত হইয়া আরও প্রকুপিত হয় এবং তন্নিবন্ধন শ্লৈষ্মিক, পিত্ত-শ্লৈষ্মিক পীড়া উৎপাদন করে। ঐ সময়ে কেবল যে মানবদেহের অবস্থা ঐরূপ হয়, তাহা নহে। যে জীবের মাংস ভোজন করিবে, তাহার দেহের অবস্থাও তদ্রূপ থাকে। অতএব উভয়ে মিলিয়া কিরূপ দোষোৎপাদন করে, তাহা বলা যায় না।

কোন এক বিচক্ষণ ডাক্তার সম্প্রতি একখানি আমেরিকার পত্রিকায় লিখিয়াছেন (Elmer Galis K. S. A.)

"Meat is a stimulant, due to the waste animal poison it contains."

অর্থাৎ মাংস উত্তেজক ; কারণ, উহাতে একপ্রকার জৈব বিষ জন্মে।

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল—মানবকে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন করা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শরীর যাহাতে নীরোগ হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা। এক্ষণে দেখা গেল—

প্রতিপদে	কুষ্মাণ্ড	ভোজন করিলে	ব্রণাদি ক্লেদ রোগ জন্মে।
দ্বিতীয়ায়	বৃহতী		অর্ব্বুদ রোগ হয়।
তৃতীয়ায়	পটোল		বাতরক্ত হয়।
চতুর্থীতে	মূলা		আমবাত হয়।
পঞ্চমীতে	বেল		পিত্তসম্বন্ধীয় ব্যাধি জন্মে।
ষষ্ঠীতে	নিম		কুরণ্ড, গলগণ্ড ইত্যাদি রোগ হয়।
সপ্তমীতে	তাল		রক্তপিত্ত হয়।
অষ্টমীতে	নারিকেল		অজীর্ণ ও উদরাময় হয়।
নবমীতে	লাউ		বাতশ্লেষ্মা হয়।
দশমীতে	কল্মী শাক		অম্লপিত্ত হয়।
একাদশীতে	শিম		জ্বর হয়।
দ্বাদশীতে	পুঁইশাক		যক্ষ্মারোগ হয়।
	বেগুন		চুলকণা, কণ্ডু, আদি রোগ হয়।
চতুর্দ্দশীতে	মাষকলাই	”	অতিসার বা উদরাময় হয়।
পূর্ণিমা অমাবস্যায়	মাংস	”	শ্লেষ্মাজনিত পীড়া হয়

সুতরাং গৃহস্থাশ্রমবাসী সাত্ত্বিক-খাদ্যভোজী মানবগণ পূর্ব্বোক্ত বিধিগুলি পালন করিলে উপকার হাতে হাতে পাইবেন, যাহা প্রমাণ করিবার জন্য অন্য কোথাও যাইতে হইবে না। আগে বাঙ্গালী ঐ সকল বিধি ও নিষেধ পালন করিয়া সুস্থ ও সবল থাকিয়া দীর্ঘজীবী ছিলেন, না আজকালকার পাশ্চাত্য আচার-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কয় জন সুস্থ ও নীরোগ আছেন, অথবা দীর্ঘজীবন লাভ করেন?

এখনও পর্য্যন্ত দেখা যায় যে সকল ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান ঐরূপ বিধি ও নিষেধবাক্য মানিয়া চলিতেছেন, তাঁহারা যে অন্যান্য বাঙ্গালী অপেক্ষা সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া আছেন, তাহা অতীব সত্য।

এই সকল কারণে যে সকল বিচক্ষণ ডাক্তার এই বঙ্গদেশে চিকিৎসা-কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় মানবশরীরের এমন অবস্থা হয় যে, ঐ সকল তিথিতে স্বল্পাহার বা উপবাস করিলে অনেক ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ কেবল যে পূর্ব্বোক্ত নিষেধবাক্য দ্বারা আমাদিগকে তিথিভেদে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হইতে বলিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহারা ঋতুভেদেও আমাদিগকে কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার করিতে হইবে, তাহারও বিধিব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এবং কি কি কারণে ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—

আমাদের দেশ ষড়্‌ঋতুর লীলাস্থল—হেমন্ত, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ। অগ্রহায়ণ হইতে ক্রমে দুই দুই মাস এক এক ঋতুর ভোগকাল। অর্থাৎ—

ফাল্গুন, চৈত্র—বসন্ত
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ—গ্রীষ্ম
আষাঢ়, শ্রাবণ—বর্ষা
ভাদ্র, আশ্বিন—শরৎ
কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ—হেমন্ত
পৌষ, মাঘ—শীত

১। বসন্তে—শ্লেষ্মা কুপিত হয়। শ্লেষ্মার প্রকোপে মন্দাগ্নি জন্মে, সুতরাং এই সময়ে পুরাতন যব-গোধূমজাত খাদ্য, মধুর অন্ন, লঘু সুপথ্য—পেঁপে, ডাব, মাখন, বেল, নেবু প্রভৃতি আহার করিবেন।

আর অত্যুষ্ণ, অতি স্নিগ্ধ, অতি মধুর ভক্ষ্য দ্রব্য ও দিবানিদ্রা বর্জ্জন করা উচিত।

২। গ্রীষ্মকালেও শ্লেষ্মা কুপিত হয়। সুতরাং এ ঋতুতেও বসন্তের নির্দ্দিষ্ট আহার ব্যবস্থা করা উচিত, এবং চিনির পানা, ঘৃত, দুগ্ধ, শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন, আর অম্ল, কটু ও উষ্ণস্বভাব দ্রব্য নিষেধ এবং মধ্যাহ্নসময়ে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

৩। বর্ষায়—বায়ু, পিত্ত, কফ—ত্রিবিধ দোষই যুগপৎ কুপিত হয়। অর্থাৎ ভূমি হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ু, মেঘ হইতে বারিপতন জন্য পিত্ত এবং বর্ষার জলে শ্লেষ্মা প্রাবল্য লাভ করে। ঐ ত্রিদোষ-জনিত জঠরাগ্নি দুর্ব্বল হয়।

সুতরাং এই ঋতুতে পুরাতন অথচ লঘু তণ্ডুলের অন্ন; জাঙ্গল মাংস, মুগের দাল প্রভৃতি অগ্নিবর্দ্ধক রসাল দ্রব্য ভোজন করিবে আর তিন্তিড়ী-সঞ্জাত অম্ল, লবণ, নদীর জল পান ও দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ।

৪। শরতে—পিত্ত কুপিত হওয়ায় রক্ত-বিরেচক (রক্তামাশয় প্রভৃতি) ব্যাধির সঞ্চার হয়। এই সময়ে কষায়-গুণ-সম্পন্ন স্বাদু দ্রব্য, তিক্ত, ইক্ষু শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মুগের দাল, সরসীজল, ক্ষার লবণাদি হিতকর।

আর দধি, তৈল, সূর্য্যকিরণ, তীক্ষ্ন অম্ল, দিবানিদ্রা ও পূর্ব্বদিকের বায়ু সেবন নিষেধ।

আজকাল চা পান করা অনেকের অভ্যাস, কিন্তু এই সময়ে পিত্ত কুপিত হওয়ায়, চা-পানে পিত্তরোগ উৎপন্ন হয়।

৫। হেমন্ত—এই সময়ে বায়ু কুপিত হয়। তজ্জন্য ঘৃতাক্ত দ্রব্য, মিষ্ট, অম্ল, ক্ষীর, ছানা, নূতন চাউলের পরমান্ন, নূতন গুড়, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার হিতকর।

আর দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে সহসা ঠাণ্ডা না লাগে, তজ্জন্য উপযুক্ত গাত্রবসন ব্যবহার করিবে। পদদ্বয় আবৃত রাখিলে ভাল হয়।

৬। শীত বা শিশির—এই সময়েও বায়ু কুপিত হয়। অতএব হেমন্ত-রূপ নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য আহার—উপযুক্ত শীতবস্ত্রাদি ব্যবহার করিবে। এই সময়ে সুস্বাদু শাক, মাংস ও পিষ্টকাদি দ্রব্য, লবণ ও মিষ্টরসযুক্ত দ্রব্যাদি আহার করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

ঋতুর গুণাদি ও ঋতুগত বৈধাবৈধ আহার-ব্যবহার সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রে—আহ্নিকতত্ত্ব নামক পুস্তকে বিশেষভাবে লিখিত আছে।

তন্মধ্যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপন করিব।

১। বসন্তে কুপিতঃ শ্লেষ্মা হ্যগ্নিমান্দ্যং করোত্যতঃ।

২। ঘৃতং পায়সশাল্যন্নং ভুঞ্জন গ্রীষ্মে ন সীদতি।

৩। বর্ষাস্বগ্নিবলে হীনে কুপ্যন্তে পবনাদয়ঃ।

৪। শরদি কুপিতে পিত্তে বিরেচকং রক্তমোক্ষণম্।

৫। হেমন্তে কুপিতাদ্বায়োঃ স্বাদ্বম্ললবণান্নসান্।

৬। অয়মেব বিধিঃ কার্য্যঃ শিশিরেঽপি বিশেষতঃ।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থাৎ বসন্তকালে শ্লেষ্মা কুপিত হয় ও অগ্নিমান্দ্য হয়।

গ্রীষ্মকালে—ঘৃত, পায়স, শালি অন্ন ভোজনে কষ্ট দূর হয়, অবসন্ন হইতে হয় না।

বর্ষাকালে—অগ্নিবল মন্দ হয় এবং বায়ু প্রবল হয়।

শরৎকালে—পিত্ত কুপিত হয় ও মলনিঃসরণকালে রক্তমোক্ষণ হয়।

হেমন্তে—বায়ু ও পিত্ত উভয় কুপিত হয় এবং অম্ল, লবণ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য।

শিশিরেও—ঐরূপ হইয়া থাকে।

অতএব আমরা কোন্ বুদ্ধিবলে যে পূর্ব্বোক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় বাক্যগুলি উপেক্ষা করিয়া আপনাদের বিপদ্ আপনারাই ডাকিয়া আনি—তাহা বুঝিতে পারি না।

লবঙ্গ

আমাদের দেশে "লবঙ্গলতা" কথাটি এতদূর প্রচলিত আছে যে, লোকে মনে করে, লবঙ্গ বুঝি কোন লতার ফুল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। 'লবঙ্গলতা' এক প্রকার ফুলের নাম। ইংরেজীতে তাহাকে Limovia Sceanderes বলে আর লবঙ্গকে ইংরেজীতে Cloves বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Caryophyllus Aromaticus। ইহা এক প্রকার বৃক্ষে জন্মে। ইহা ঠিক ফুল নহে, ফুলের বোঁটা মাত্র। যে বৃক্ষে ইহা জন্মে, তাহার নাম লবঙ্গবৃক্ষ। এই বৃক্ষ মালাকাস্ প্রভৃতি ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। ৯।১০ বৎসরের বৃক্ষে লবঙ্গ-কুসুম ফুটে। ইহা আম্রাদি বৃক্ষের ন্যায় চিরহরিৎবর্ণ, ইহার পাতা একত্র শুকাইয়া যায় না। মাঝে মাঝে দুই একটি পাতা শুকায় মাত্র। লবঙ্গের উপরিভাগে যে গোলাকার পদার্থ থাকে, তাহা লবঙ্গপুষ্পের শুকান অবস্থা মাত্র। ইহাতে ৪টি দল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে যেখানে লবঙ্গ জন্মায়, সেখানকার অধিবাসীরা লবঙ্গ-পুষ্পকে ঝরিতে দেয় না। "ফুলের" বোঁটাটি যখন লাল বর্ণাকার ধারণ করে, (শেফালিকা পুষ্পের বোঁটার মত) তখন আস্তে আস্তে ফুলসহ বোঁটাগুলি পাড়িয়া লয়; ২।৪ দিন মাত্র মাদুরের উপর রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লয়। তাহার পর বস্তাবন্দী করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। লবঙ্গের পুং-স্ত্রী-ভেদ আছে। তবে উহাতে একটিমাত্র গর্ভতন্তু থাকে।

অধুনা কবিরাজগণ যে সকল ঔষধে লবঙ্গ ব্যবহার করেন, তাহা তত ফলপ্রদ হয় না; কারণ, এখন ধূর্ত্ত ব্যবসায়িগণ উহা হইতে তৈল বাহির করিয়া লয় এবং তাহার পর শুকাইয়া বিক্রয় করে: কিন্তু এই ব্যবসা

যখন গন্ধবণিকগণের হস্তে ছিল, তখন তাঁহারা ভারত দ্বীপপুঞ্জ হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্যই আনয়ন করিতেন, কবিরাজগণও ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া বেশ উপকার পাইতেন। তাঁহাদেরই মুখে কবিরাজগণ শুনিতে পাইতেন যে, লবঙ্গ-বৃক্ষ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মায়, তাই বোধ হয়, লবঙ্গের অন্যান্য নামমধ্যে একটি নাম "বারিসম্ভব"। এখানে বারিসম্ভব অর্থে জলজ নহে, বারিবেষ্টিত দ্বীপজাত। ধন্বন্তরি লবঙ্গের আর একটি নাম লিখিয়াছেন "চন্দনপুষ্প"। বাস্তবিক লবঙ্গপুষ্পের এক প্রকার চন্দনের মত সুগন্ধও আছে।

তাহার উপর পুষ্ট না হইলে অথবা অধিক দিনে পুরাতন হইলে ইহার সব গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

লবঙ্গের ভাষাভেদে নাম—

বাঙ্গালায়—লবঙ্গ	কর্ণাটে—লবঙ্গকলিকা
ইংরেজীতে—Cloves	তৈলঙ্গে—লবঙ্গ লুতা কিরবের
হিন্দীতে—লোঙ্গ	ফার্সীতে—মেহক
মহারাষ্ট্রে—লবঙ্গ	সংস্কৃতে—করণফুল
গুজরাটীতে—লবীঙ্গ	

লবঙ্গের গুণাবলী—

"লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিমম্।
দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্রনাশকৃৎ॥
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথোদ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্॥" ভাবপ্রকাশ॥

লঘু—অর্থে হালকা নহে।

বৈদ্যশাস্ত্রে গুরু বলিলে বুঝায়—উহা অঙ্গগ্লানিজনক, মলবৃদ্ধিকারী, বলকর, তৃপ্তিজনক, দেহবৃদ্ধিকর।

লঘু তাহার বিপরীত অর্থাৎ উপরি-উক্ত গুণবিহীন এবং লেখন অর্থাৎ শরীরের ধাতু ও মল শোষণ করিয়া কৃশ করে। যেমন বচ, উষ্ণ জল ইত্যাদি হিমশীত অর্থাৎ হ্লাদন বা সুখকরী দাহ ও ঘর্ম প্রশমন করে। দীপন— হঠাৎ মৌরির মত পাচকাগ্নি দীপ্ত করে, কিন্তু আম পরিপাক করে না। পাচন—দীপনের বিপরীত গুণবিশিষ্ট। বাতপিত্ত কফ আম পরিপাক করে। রুক্ষ—রুক্ষতা ও কাঠিন্যজনক বলবর্ণহ্রাসকারী, বায়ুজনক কিন্তু কফ হয়। আধ্মানং-স্ফীতম্। ক্ষিতাস্র—রক্তপিত্ত।

রাজনির্ঘণ্টুকার বলেন—

"লবঙ্গং শীতলং শ্রেয়ং চক্ষুষ্যং ভুক্তরোচনম্।
বাতপিত্তকফঘ্নঞ্চ তীক্ষ্ণং মূর্দ্ধরুজাপহম্॥

চক্ষুষ্যং—চক্ষুর হিতকর। তীক্ষ্ণং—দাহকর ব্রণাদিপাককর, লালা ও রসাদি স্রাবকারক। রোচন—রুচিকারক।

ধন্বন্তরির নির্ঘণ্টুতে আছে—

"লবঙ্গকুসুমং হৃদ্যং শীতলং পিত্তনাশনম্।
চক্ষুষ্যং বিষহৃদ্ধৃষ্যং মাঙ্গল্যং মূর্দ্ধরোগহৃৎ॥"

এখানে "লবঙ্গ-কুসুম" বলা হইয়াছে। কারণ, লবঙ্গ-ফুলের বোঁটা এবং উহার মস্তকে পুষ্প শুষ্কাবস্থায় থাকে।

ডাক্তারগণ বলেন—সৈন্ধবলবণসহ লেহন করিলে—লবঙ্গ দ্বারা শূল, অজীর্ণ, বমন এবং তৃষ্ণারোগে উপকার হয়।

গ্রাবসী (Scietica), কটিশূল (Lumbago), দন্তশূল ও শিরঃশূলে লবঙ্গের প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

দীপশিখায় লবঙ্গ পোড়াইয়া মুখে রাখিলে কাসি সর্দ্দির উপশম হয়।

লবঙ্গচূর্ণ অন্যান্য চূর্ণসহ মিশাইয়া দন্তধাবন করিলে দন্তের মাড়ী সুদৃঢ় হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে।

এই কলিকাতা নগরীতে বৎসর বৎসর কত টাকার লবঙ্গ আমদানী হয়—

১৯১৯-২০	১৯২০-২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩
১,১৮,৭১০৲	২,৪৬,২৪০৲	৩,৫১,৭৬৯৲	৯,২৪,৭৩১৲

এতদ্ভিন্ন Cloves Oil লবঙ্গতৈলও কত টাকার আমদানী হয়, তাহার পৃথক্ তালিকা পাওয়া যায় নাই।

তবে উদ্ভিজ্জ-তৈলাদির আমদানী এইরূপ—

৮৮,৫৫০৲	২২,৪৫০৲	১,০২,৪৫৯৲	১২,৭৫০৲

ইহার দুই আনা অংশ বা এক আনা অংশও লবঙ্গ-তৈল হয়, তবে বড় কম টাকার লবঙ্গ-তৈল আসে না॥

অথচ আমাদের দেশে লবঙ্গ-তৈল প্রস্তুত খুব কম হয়। এখন আমাদের দেশে যে লবঙ্গ-তৈলরূপে বাজারে বিক্রী হয়, তাহা ঠিক লবঙ্গের তৈল নহে। লবঙ্গকে সুইট অয়েলে ভিজাইয়া বঙ্গ-তৈলরূপে বিক্রীত হয় মাত্র।

লবঙ্গ-তৈল সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে আছে—

"দেবপুষ্পোদ্ভবং তৈলং অগ্নিকৃৎ বাতনাশনম্।
দন্তবেষ্টকফাঘ্নিঘ্নং গর্ভিণ্যাঃ বমনাপহম্॥

লবঙ্গের আর একটি নাম দেবকুসুম বা দেবপুষ্প।

লবঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটি জনশ্রুতি আছে—

পদ্মমধুতে লবঙ্গ ঘষিয়া চক্ষুতে দিলে চক্ষুর ছানি ভাল হয়, কিন্তু এখন না পাওয়া যায় বিশুদ্ধ পদ্মমধু, না পাওয়া যায় উৎকৃষ্ট লবঙ্গ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখানে যে লবঙ্গ বিক্রয় হয়, তাহা বিশুদ্ধ ও পরিপক্ক নহে; সুতরাং ছানি আরোগ্য হওয়া দুর্ঘট।

লবঙ্গবৃক্ষ চিরসবুজ ও নয়নতৃপ্তিকর। লবঙ্গলতিকা বলিলে লবঙ্গ-বৃক্ষকে লতার মধ্যে স্থান দিয়া থাকি, বাস্তবিক তাহা নহে—ইহা বৃক্ষমধ্যে গণনীয়, বারো মাসই ইহা সবুজ পত্রে এরূপভাবে পরিশোভিত থাকে যে, কবিগণ ইহাকে লতার মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন।

আট নয় বৎসরের বৃক্ষে প্রথম ফুল দেখা দেয় এবং ফল ধরে। আমরা যাহাকে লবঙ্গ বলি, উহা লবঙ্গপুষ্পের কলিকা মাত্র, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। লবঙ্গের মাথার দিকে যে গোলাকার পদার্থ থাকে, উহা লবঙ্গ-ফুলের চারিটি দল মাত্র।

যেগুলি অর্দ্ধ ইঞ্চির কিঞ্চিৎ অধিক লম্বা এবং রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ ও ওজনে ভারী, সেইগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার গন্ধ কিছু তীক্ষ্ণ, আস্বাদ ঈষৎ তিক্ত।

ইহার গুণাবলী কি হকিমী, কি ডাক্তারী, কি কবিরাজী সকল গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরাজী মত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

হকিমী মতে—ইহা মনের প্রফুল্লতা উৎপাদক, পরিপাকশক্তি-বর্দ্ধক এবং পাকস্থলীর বেদনা-নাশক। ইহার ব্যবহারে শ্বাস রোগ ও শ্লেষ্মার কাসিতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা সর্দ্দি দূর হয়; ভয়, অবসাদ, দন্তবেদনা ও মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। মস্তিষ্ক, অন্তঃ-করণ, হৃৎপিণ্ড, চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি ও রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, দাঁতের মাড়ি সবল হয়, শৈত্যজনিত শিরোবেদনা দূর হয়। পক্ষাঘাত, লাকোয়া ও নাজ্‌লা রোগে উপকার পাওয়া যায়। ইহা মস্তিষ্কের সর্ব্বপ্রকার শৈত্যজনিত রোগে উপকারী।

লবঙ্গের বিষনাশক গুণ আছে। লবঙ্গ দ্বারা সুরমা প্রস্তুত করিয়া চক্ষে ব্যবহার করিলে চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি হয় এবং নানাবিধ চক্ষুরোগে উপকার দর্শে। (প্রত্যহ একটি করিয়া লবঙ্গ গিলিয়া খাইলে স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হয় না)।

ইহার রুহ্ (নির্য্যাস) অত্যন্ত সুগন্ধি ও সুস্বাদু। ইহা হিক্কা ও বমনেচ্ছা ও বমন নিবারণজন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা এস্‌ড্রেমখা (পাণ্ডু) ও তকৃতিঘোল্ রোগেও উপকারী।

ইহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা ও ফুলা নিবারণ হয়। প্রদীপে ইহার সূক্ষ্মভাগ প্রজ্বালিত করিয়া মুখে রাখিয়া দিলে কাসি রোগ বিদূরিত হয়।

ডাক্তারী মতে—মারটেসী জাতীয় ক্যারিয়ফাইলস য়্যারোমেটিকস নামক বৃক্ষের শুষ্ক কলিকা। ইহাতে ক্যারিয়োসাইলিন নামক বীর্য্য আছে। ইহাকে নখর দ্বারা চাপিলে তৈল নিঃসৃত হয়। আর যেগুলি হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না, সেগুলি হইতে পূর্ব্বেই তৈল বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে জানিবে।

মালক্কা প্রভৃতি ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ জলের সহিত চুয়াইয়া বায়ী তৈল বাহির করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত লবঙ্গমধ্যে ট্যানিক এসিড, ধুনা ও সার পদার্থ পাওয়া যায়।

ইহা উত্তেজক, বায়ুনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা উদরাধ্মান দূর করে ও পরিপাকক্রিয়াকে সবল করে। ইহা তিক্ত ও বলকারক। ঔষধের সাহায্যার্থে এবং বিরেচক ঔষধের দোষ নাশের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহার উদ্বায়ী তৈল সুগন্ধের জন্য দন্তচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় বমন ও বিরেচন নিবারণার্থে ইহার ফাণ্ট ব্যবহার করা হয়।

অগ্নিমান্দ্য ও জ্বরাদি রোগের পরে দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য চিরতা-মিশ্রিত লবঙ্গের ফাণ্ট ব্যবহৃত হয়।

ইহা পচননিবারক, সুগন্ধি, বায়ুনাশক এবং বমন ও আক্ষেপ-নিবারক।

যে কোন স্থানে ইহার প্রলেপ দিলে তত্তৎস্থানের স্পর্শজ্ঞান লোপ পায়। ইহা বাহ্যপ্রয়োগে ত্বক্ লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং সেই স্থানে ফোস্কা হয়।

ইহা আমাশয় ও অন্ত্রের শূল নিবারণ করে। অন্যান্য মশলা ও সৈন্ধব লবণের সহিত ইহা সেবিত হইলে—শূল, অজীর্ণ, বমন ও তৃষ্ণা রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা বাতের বেদনা, গৃধ্রসী (Sciatica), কটিশূল (Lumbago), শিরঃশূল ও দন্তশূলে প্রলেপাদিরূপে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে দন্তের মাড়ি দৃঢ় হয়।

লবঙ্গের চাষ

লবঙ্গ, বৃক্ষ উত্তম সারযুক্ত মৃত্তিকায় রোপণ করিতে হয়। প্রথমে যথারীতি মৃত্তিকার পাট করিয়া ১০।১২ হাত অন্তর এক একটি ফল পুঁতিতে হয়।

৫।৬ সপ্তাহের মধ্যে ফল হইতে গাছের কল বাহির হয়। এই সময়ে যাহাতে উক্ত গাছের উপর আতপতাপ না লাগে, তজ্জন্য তাহার উপরে হোগলাদি বা লতাপুঞ্জ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

তৎপর হইতে সময়মত মাঝে মাঝে জল দিতে হয়। এই গাছ—৫।৬ ফিট আন্দাজ বড় হয়। তজ্জন্য পুঁতিবার সময় ৩০ ফিট আন্দাজ অন্তর পুঁতিতে হয়।

বালুকাময় স্থানে রোপণ করিলে ফল ও ফুল অধিক পাওয়া যায়। ছয় বৎসর পরে ফল হইতে আরম্ভ হয় এবং ১২ বৎসরকাল লবঙ্গ উৎপন্ন হয়।

বৎসরে /৩ সের হইতে /৩॥ সের পর্য্যন্ত প্রত্যেক গাছে ফল পাওয়া যায়। তাহার পর ক্রমশঃ ফল কম দিতে থাকে।

সুমাত্রা দ্বীপে প্রায় ১ বৎসর অন্তর ফুল হয় এবং ২৪।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই গাছ বাঁচে। ৮ বৎসর অন্তর চাষ হয়।

আম্বয়ান দ্বীপে ১২।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত গাছে ফুল ধরে না—তাহার পর প্রচুর পরিমাণে ফুল দেয় এবং ৭৫।১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ফুল দিয়া থাকে।

পিনাং, জাঞ্জিবর, বেনকুলেনজাত লবঙ্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তজ্জন্য অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

কবিরাজগণ লবঙ্গ মিশ্রিত করিয়া নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করেন; তন্মধ্যে—

গ্রহণী রোগের জন্য—লবঙ্গাদি চূর্ণ

গ্রহণী অতিসার ও প্রদর রোগের জন্য—বৃহল্লবঙ্গাদি চূর্ণ

অগ্নিমান্দ্যে—লবঙ্গাদি মোদক

অজীর্ণ রোগে—লবঙ্গাদি বটী সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই লবঙ্গাদি ব্যবসা এক্ষণে ভারতীয় অন্যান্য জাতির হস্তগত। বিশেষতঃ তাহারা জানে যে, বাঙ্গালী ত' আর সমুদ্রে গিয়া লবঙ্গাদি আনয়ন করিতে পারিবে না।

স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দনের আদেশ অমান্য করে—এমন বাঙ্গালী কে আছে? সে ধনপতি নাই বা তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত নাই যে—

বদল আনে নানা ধন লয়ে দিজবরা

অন্যদিক্ হৈতে দ্রব্য আনে বাহি ধরা

কুরঙ্গ বদলে ভুরঙ্গ পাব

নারিকেল বদলে শঙ্খ

বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব

শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক।

এতদ্দেশীয় দ্রব্যাদির বদলে তাঁহারা ভারতীয় সাগরদ্বীপপুঞ্জজাত দ্রব্যাদি আনয়ন করিতেন।

সে পথ নবদ্বীপের উজ্জ্বলতম রত্ন (?) বন্ধ করিয়া দেশের ও বণিক-জাতির কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

ইহার পরও শ্রীশ্রীজীবাদি অপূর্ব্ব জীবগণ বলেন, রঘুনন্দনকে বুঝিবার আমাদের শক্তি নাই। শ্রীশ্রীর ন্যায় কুশ্রী ও বিশ্রী জীবগণের মুখেই ঐরূপ বাক্য শোভা পায়।

সাধে কি তুলসীদাস বলিয়াছেন—

সাচ্চা কহত ত মারে লাঠ্‌ঠা ঝুটা জগত ভুলায়।
গোসর ফিরে গলি গলি সুরা বৈঠকে বিকায়॥
গো ছোড়কে কুত্তা পালে বাছার রহে ভুখা।
শালেকো তদ্বির বেহেস্তার পিতা না পায় রুখা॥
ঘরকা মেহেরী মান্নাভাওয়ে জেলসে তাওয়ে দাসী।
ধন্য কলিযুগ তেরা তামাসা দুখ লাগে আর হাসি॥

খদির বা খয়ের

আমরা পানের সহিত যে সকল মশলা ব্যবহার করি, তন্মধ্যে খদির অন্যতম। কিন্তু বৈদ্যক গ্রন্থাবলীতে পানের মশলায় যত প্রকার দ্রব্যের নাম আছে, তাহাতে খদিরের নামোল্লেখ নাই। সুতরাং সে সময় বোধ হয় পানে খদির ব্যবহৃত হইত না।

"পূগকঙ্কোল-কর্পূরলবঙ্গ-সুমনঃফলৈঃ।
কটুতিক্তকষায়ৈর্বা মুখবৈশদ্যকারকৈঃ।
তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্বা বিচক্ষণঃ।"—সুশ্রুত।

আবার চরকেও দেখি—

"জাতীকটুকপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ।
কক্কোলকফলং পত্রং তাম্বূলস্য শুভং তথা।
তথা কর্পূর-নির্য্যাসঃ সূক্ষ্মৈলায়াঃ ফলানি চ॥"

তখন বোধ হয়, কেবল ঔষধেই ব্যবহৃত হইত, তাই গুণাবলীতে কেবল খদিরের উল্লেখ দেখা যায়। তবে খদির স্বাদে তিক্ত এবং গুণে পিত্তহারক বলিয়া ক্রমে পানের সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন্ সময় হইতে যে পানের সহিত খদির ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বলা সুকঠিন। হেমচন্দ্র-প্রণীত অভিধানচিন্তামণি গ্রন্থে খদির শব্দের উল্লেখ নাই। অথচ পানের উল্লেখ আছে।

তবে কেহ কেহ বলেন যে, রাজনির্ঘণ্টুতেই আমরা পানের সহিত চূণ-খয়েরের ব্যবহার দেখিতে পাই। এই গ্রন্থে "অমরকোষের" উল্লেখ আছে, সুতরাং ইহা অমরকোষের পরে লিখিত। "অমরকোষ" অমরসিংহের

লিখিত এবং ইনি রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম পণ্ডিত। বিক্রমাদিত্য নিজ নামে এক অব্দ প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, উহার নাম সংবৎ। উহা খৃঃ-পূর্ব্ব ৫৬ অব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই বৎসরে তিনি হুন্ বা শক্ জাতিকে পরাভূত ও দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া 'শকারি' উপাধি গ্রহণ এবং সংবৎ অব্দ প্রচলিত করেন। অতএব অনুমান করা যায় যে, প্রায় ২ হাজার বৎসর যাবৎ ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

খদির শব্দটি (খদ্+কির) খদ্‌ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং খদ্ অর্থে স্থির থাকা, বধ করা। খদিরের বং বহুকাল স্থায়ী এবং গুণেও পিত্তাদিরোগ দমন করে। সেই জন্য ইহার নাম খদির হইয়াছে।

রাজনির্ঘণ্টকার মতে খদির পাঁচ প্রকার—

(১) খদির, (২) সোমবল্ক, (৩) তাম্রকণ্টক, (৪) বিট্‌খদির, (৫) অরি এবং তিনি প্রত্যেকের গুণাবলীও বর্ণনা করিয়াছেন।

খয়েরের সংস্কৃত নাম খাদির, এবং খাদির অর্থে তন্নামক বৃক্ষ। উহার সারকে খাদির বলে।

"কটুকঃ খাদিরঃ সারস্তিক্তোষ্ণঃ কফবাতহৃৎ।
ব্রণকণ্ঠাময়ঘ্নশ্চ রুচিকৃদ্দীপনঃ পরঃ ॥"—রাজনির্ঘণ্টঃ।

খদিরবৃক্ষ শমী ও বাবলা গাছের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট। বিট্‌-খদিরকে লোকে 'গুয়ে বাবলা' বলিয়া থাকে।

শুনা যায়, খদিরবৃক্ষ কোচবিহার প্রদেশে প্রচুর জন্মে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদ্দেশবাসিগণ খয়ের প্রস্তুত করিতে জানে না; উক্ত বৃক্ষকে জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করে মাত্র।

ইহার পত্র বকুলপত্রের মত। শাখা ও কাষ্ঠ কণ্টকিত, কণ্টকগুলি ক্ষুদ্র ও বক্র। গ্রীষ্মের শেষে এবং বর্ষার প্রথমেই খদির-বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। ইহাতে লম্বা লম্বা সরু শুটি জন্মে। প্রত্যেক শুটিমধ্যে ৬।৭টি

বীজ থাকে। বিট্‌খদিরের কাঁটা অসংখ্যক দেখা যায়। ইহার ত্বক্ ও পত্রে বিষ্ঠার ন্যায় গন্ধ-বিশিষ্ট, সেই জন্য ইহাকে লোকে গুয়ে খয়ের বলে।

খদিরবৃক্ষের সার, পুষ্পমূলের ত্বক্ ও কাষ্ঠ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

সার—অর্দ্ধ আনা হইতে দুই আনা ওজন পর্য্যন্ত।

পুষ্পের চূর্ণ—১ হইতে ৪ আনা এবং ত্বক্ ও কাষ্ঠের ক্বাথ—৫ হইতে ১০ তোলা।

রাজনির্ঘণ্টুতে আছে—

"পর্ণাধিক্যে খাদিরে রঙ্গদাত্রী চূর্ণাধিক্যে রুক্ষদা কৃচ্ছ্রদাত্রী।
সারাধিকে দীপনী শোষদাত্রী চূর্ণাধিক্যে পিত্তকৃৎ পূতিগন্ধা॥"

দীপনী অর্থে যে বস্তু পাচকাগ্নি-দীপ্তকর, কিন্তু আম পরিপাক করে না আর যাহা আম পরিপাক করে, অথচ পাচকাগ্নি উদ্দীপ্ত করে না, তাহাকে পাচন বলে।

কলিকাতার বাজারে ৫ প্রকার খদির পাওয়া যায়।

(১) পাপড়ি, (২) তানকপুরী, (৩) পেগু, (৪) তিলি, (৫) বেলগুটী।

ওয়াট সাহেব বলেন—অতিসারে—খয়ের গুঁড়া ১ হইতে ২ আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেব্য।

আমাতিসারে—৫ আনা পর্য্যন্ত সেবনীয়।

আলজিভ বড় হইলে—খয়েরের টুকরা মুখে রাখিলে উপকার হয়।

প্রদরে—খয়ের-ভিজান জলের পিচকারী দিলে উপকার হয়।

দাঁতের মাড়ী ফুলিলে—খয়েরে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

আরক্কোরি বলেন—গ্রহণী রোগে যখন পাকস্থলীর বেদনা থাকে এবং জলবৎ প্রচুর মল নির্গত হইতে থাকে, সেই সময়ে খয়ের বিশেষ উপকারী।

বিভিন্ন প্রকার খদিরের লেটিন নাম—

[১] খদির—Acacia Catechu

[২] সোমবল্ক—Acacia Polycantha

[৩] বিট্‌খদির—Acacia Femesiana

[৪] বল্লীখদির—Mimosa Dumosa

[৫] খাদির—Catechu

বৈদ্যশাস্ত্রে—চরকমতে—কুষ্ঠে—খদিরসারঃ বহুকষায়যোগঃ কুষ্ঠঘ্নঃ।

ক্রিমিকুষ্ঠে—খদিরত্বক্ পানাহারবিধানে প্রসেচনে ধূপনে প্রদাহে চ বিশিষ্যতে কুষ্ঠঘ্নং খদিরঃ।

বাতজকাসে—পিবেৎ খদিরসারং।

সুশ্রুতমতে—সর্ব্বেষু কুষ্ঠেষু খদিরত্বক্ কাষ্ঠং সর্ব্বথৈব প্রযুঞ্জীত স্নানপানাশনাদিষু।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে—পুষ্পচূর্ণন্তু মধুনা পীত্বা চারোগমশ্নুতে।

স্বরভঙ্গে—তৈলাক্তং স্বরভেদে বা খদিরং ধারয়েৎ মুখে।

বিস্ফোটে—খদিরেন্দ্রবারু।

হারীত—দন্তরোগে—খদিরস্য কাথঃ দন্তরোগনিবারণঃ।

বৈদ্যকগণের মতে খদির দ্বিবিধ;—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম।

কৃত্রিম—খদিরবৃক্ষের শাখা ও পত্র সিদ্ধ করিয়া যে খয়ের প্রস্তুত হয়, তাহা কৃত্রিম।

অকৃত্রিম—আর যাহা কাষ্ঠের ভিতর নির্য্যাসরূপে আপনা আপনি সঞ্চিত হয়, তাহা অকৃত্রিম।

খদিরবৃক্ষ প্রায় ১০।১২ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। এই গাছ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। তবে পার্ব্বত্য প্রদেশের বৃক্ষই উৎকৃষ্ট। ইহার কাষ্ঠ বড় শক্ত ও বহুকাল স্থায়ী হয়। ইহাতে শীঘ্র ঘুণ ধরে না।

তজ্জন্য ইহার কাষ্ঠে ঢাল-তরবারির হাতল, লাঙ্গল ও তুলার কল এবং সুন্দর সুন্দর শকট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

শীতকালে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে খদির-বৃক্ষে ফুল ধরে।

এই বৃক্ষের কাথ হইতে খয়ের পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ সার লইয়া একটি মাটির পাত্রে রাখিয়া সিদ্ধ করিলে একরূপ পরিষ্কার সুরা বাহির হয়, উহা জমাট বাঁধিতে থাকিলে মাটির ছাঁচে ঢালিয়া দেওয়া হয়।

সিংহলবাসীদিগের বিশ্বাস, ইহার নির্য্যাসে রক্ত পরিষ্কার করে এবং রাখিলে বর্ণ উজ্জ্বল হয়। এই জন্যই বোধ হয়, কোন এক রসিক কবি লিখিয়াছেন—

"বিনা খদিরক্ষারেণ হারেণ হরিণীদৃশাম্।
নাধরে জায়তে রাগো নানুরাগঃ পয়োধরে॥"

শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে :—

"প্রজাপতি নিজ শরীর হইতে প্রাণ ত্যাগ করিলে—তাঁহার অস্থি হইতে খদির উৎপন্ন হইয়াছিল—এই কারণে খদির-বৃক্ষ এত কঠিন।'

খদির দুই প্রকার—১। রক্তসার, ২। শ্বেতসার।

রক্তসার খয়ের অপেক্ষা শ্বেতসার খয়ের অধিক উপকারী। শ্বেতসার খয়েরকে পাপড়ী খয়ের বলে। ইহার গুণ—বর্ণপরিষ্কারক, মুখরোগ, রক্তদোষ ও কফনাশক।—(ভাবপ্রকাশ)।

রক্তসার খয়ের দ্বারা বস্ত্রাদি রঙ করা হয়।

ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের মতে ইহার গুণ—সংকোচক, ব্রণ, উপদংশ ও ক্ষত রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। শ্বেতপ্রদর হইলে ইহার রস পিচকারী করিয়া দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। জোলাপ, হর্ম্মবারী ও ক্লকেজর

প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ডাক্তারগণের মতে—ভারতবাসিগণ যে পানের সহিত খয়ের ব্যবহার করিয়া আহারান্তে চর্ব্বণ করিয়া থাকে, তাহাতে মুখরোগ অনেক পরিমাণে বিদূরিত হয়। তবে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত নহে। আবার চূণের সহিত খয়ের ব্যবহারে উহার গুণবৃদ্ধি হয় এবং তৎসহ কোন সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিলে মুখের দুর্গন্ধও বিদূরিত হয়। আলজিহ্বার শিথিলতা ও তালুর পার্শ্বগ্রন্থির বিবৃদ্ধি রোগেও উপকারী।

কোন কোন প্রদেশে কেয়া-ফুলের পাতায় খয়ের সহ কতকগুলি মসলা মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে, উহাকে কেয়া-খয়ের বলে। এই খয়ের বিনা পান কেবল মুখশুদ্ধি জন্য ব্যবহৃত হয়।

যদিও ভারতের নানা প্রদেশেই খদির-বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, কিন্তু অনেক স্থানেই ইহার রস বস্ত্রাদি রঙের জন্য ব্যবহৃত করিবার জন্য প্রস্তুত করে। ইহার ক্বাথ বিশুদ্ধ করিয়া কিরূপে পান সহ খাইতে পারা যায়, তাহা অনেকেই জানে না। বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে এখনকার দিনে জনকপুরী খয়েরের বিশেষ আদর দেখা যায়—আর ইহার কাষ্ঠ কেবল রন্ধনের ইন্ধনস্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

তবে এই ভারতের খদির বৃক্ষ অপেক্ষা ভারত দ্বীপপুঞ্জের খদির-বৃক্ষের ক্বাথ হইতে যে খয়ের প্রস্তুত হয়, তাহার গুণ অনেক অধিক। তজ্জন্য ঐ সকল দ্বীপপুঞ্জ হইতে বৎসরে বহু সহস্র টাকার খয়ের আমদানী হয়।

এমন একদিন ছিল—তখন ঐ সকল দ্বীপপুঞ্জ হইতে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য আনয়ন করিয়া এই গন্ধবণিক জাতিই ভারতের নানা স্থানে সরবরাহ করিতেন; কিন্তু স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দনের আশীর্ব্বাদে যে দিন হইতে এই গন্ধবণিকগণের সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হইল—সেই দিন হইতে অন্যান্য প্রদেশীয় বণিকগণের হস্তে সকল ব্যবসাই নিপতিত হইয়াছে। তাঁহার নাম যে অক্ষয় হইয়াছে, সম্ভবতঃ ইহাও অন্যতম কারণ।

ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল খদির-বৃক্ষ জন্মে, তাহা উচ্চেও যেমন বড়, রসেও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট। তজ্জন্য এক দিকে যেমন সুপারী যারা, সিংহল, চীন, পূর্ব্বোপদ্বীপ হইতে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানী হয়, খয়েরও তদ্রূপ বড় কম পরিমাণে এই বঙ্গদেশে আনীত হয় না। তবে ইহার ব্যবসায়ে যে লাভ, তাহা বঙ্গবাসীর অদৃষ্টে নাই।

খদির শব্দের সংস্কৃত পর্য্যায়—গায়ত্রী, বালতনয়, দন্তধাবন, তিক্তসার, কণ্টকীদ্রুম, বালপত্র, খদ্যপত্রী, ক্ষিতিক্ষম, বক্রকাষ্ঠ, জিহ্বাশল্য, কষ্ঠী, সারদ্রুম, কুষ্ঠারি বহুসার, বালপুত্র, বক্তসার, কর্কটী, মেধ্য।

হিন্দী—কট, কিৎর

পাঞ্জাব—খরেচ

তৈলঙ্গ—খদিরমু, পোদলামন

তামিল—বোধলয়

সিংহলী—কিহিরি

ব্রহ্মে—শবিন

ইংরাজী—Acacia Catechu



হিঙ্গু বা হিং

অনেকের বিশ্বাস, হিং দ্রব্যটা ভারতে অজানিত ছিল, মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। সেই কারণে উচ্চ শ্রেণীর অনেক হিন্দু এখন পর্য্যন্ত হিং দিয়া কোন দ্রব্য রন্ধন করেন না। এমন কি, ইহার ঘ্রাণ তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য। এ বিশ্বাস ভ্রমমূলক। কারণ, আমরা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে হিং সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত আছে দেখিতে পাই।

ইহা একজাতীয় বৃক্ষের রস বা আঠা, এই বৃক্ষের উৎপত্তিস্থান পাঞ্জাব, আফগানিস্থান, মূলতান, ইরান, তুর্কিস্থান, সিন্ধু এবং পারস্য। হিং-বৃক্ষকে পারসী ভাষায় আঞ্জাদান বলে আর সংস্কৃত ভাষায় হিঙ্গু বলে।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দুই প্রকার হিঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়;—

(১) বাহ্লীক, (২) রামঠ।

(১) বাহ্লীক—পারস্য দেশজাত বা Balk দেশজাত। (২) রামঠ—পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশজাত। উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের যে কোন অংশ জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঘর্ষণ করিলে দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ রস নির্গত হইয়া থাকে। এই রস সংগ্রহ করিয়া হিং বা হিংগ্রা নামে বিক্রীত হয়। উৎকৃষ্ট হিং আকারে চাকৃতির ন্যায়। ইহার বহির্ভাগ পীতবর্ণ, কিন্তু ভাঙ্গিলে ইহার ভিতর মুক্তার ন্যায় শুভ্রবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহাতে প্রায় বালুকা মিশ্রিত থাকে।

কখন কখন পারস্য দেশ হইতে অতি শুভ্রবর্ণের হিংয়ের আমদানী হয়; কিন্তু বাতাস লাগিলে উহা গোলাপীবর্ণ ধারণ করে।

ইহার গন্ধ প্রায় রসুনের মত এবং আস্বাদ তিক্ত ও কটু।

হিঙ্গু-লাল মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া মুলতানা বা কান্দাহারী হিং নামে বিক্রীত হয়।

পিণ্ড হিং—যদিও হিং প্রথম অবস্থায় তরল থাকে—ঐ নির্য্যাস সহিত বালুকা মিশ্রিত করিয়া পিণ্ডাকারে বাজারে আনীত হয়। ইহাকে ইংরাজীতে Stone Asafoetida বলে।

তজ্জন্য ঔষধার্থে যে হিং ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে বালি বা মাটি প্রভৃতি দূর করিয়া গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লওয়া উচিত।

বৈদ্যেরা বলেন—

ভারতীয় হিং—উত্তম, কান্দাহারী হিং—মধ্যম, আর পিণ্ড হিং অধম বলিয়া জানিবে।

ভাষাভেদে নামভেদ

বাঙ্গালা—হিং
সংস্কৃত—হিঙ্গু
কাশ্মীর—ইয়াং
তৈলঙ্গী—ইঙ্গুভা
মালয়—হিঙ্গু
ইংরাজী—Asafoetida
আরবী—হালতিৎ
ফার্সী—আঙ্গুজা
হিন্দী—হিং, হিংড়া
তামিল—পেরুঙ্গারম্
উর্দ্দু—হিং, হিংড়া

প্রাচীন রোমীয়গণ এই বৃক্ষকে Sylphium নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের মতে হিং দুই প্রকার।

(১) মোস্তিন বা অঙ্গুজা বদবু
হিন্দীতে ইহাকে হিংড়া বলে।

(২) হালতিং তাইয়ার বা আঙ্গুজারে গোশবু। ইহা খোরাসান প্রভৃতি দেশজাত। হিন্দীতে ইহাকে হীরা হিং বলে।

এ সম্বন্ধে যাঁহারা অধিক জানিতে চান, তাঁহারা ফার্মাকো-গ্রাফিয়া ইণ্ডিকা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিবেন।

উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, হিং-বৃক্ষের বয়স চারি বৎসর হইলে তবে উহা হইতে রস বাহির করা কর্ত্তব্য।

ঐ সময় ভূমির নিকটবর্ত্তী গুঁড়ির অংশকে আড়ভাবে কাটিয়া উহা হইতে আঠা বা রস বাহির করা হয়।

উহা নির্গত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায় এইং উহা কর্ত্তন করিবার দুই দিবস পরে ঐ রস চাঁচিয়া লইবে। পরে আবার ঐ স্থান কর্ত্তন করিলে নূতন রস বা আঠা পাওয়া যায়। প্রত্যক বৃক্ষ হইতে ২।৩ ছটাক হইতে আরম্ভ করিয়া এক সের বা দেড় সের পর্য্যন্ত হিং পাওয়া যায়।

ইহা দুই প্রকার—

১। যাহা সাদা—তাহাকে হীরা হিং বলে, হকিমী গ্রন্থে ইহাকে হালতিৎ তাইয়ার বলে।

এই বৃক্ষের ফল ও ফুল সাদা হয়।

২। যাহা গাঢ় লালবর্ণ, তাহাকে হিংড়া বলে।

হকিমীমতে—ইহাকে 'মোস্তিন' বলে।

ইহার ফুল কালো রঙ্গের হয়। এই জন্য ইহাকে সিয়াহ বলে।

পূর্ব্বোক্ত দুয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট আর দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যেগুলি পরিষ্কার স্বচ্ছ, ঈষৎ লালবর্ণ ও তীব্র গন্ধবিশিষ্ট এবং জলে মিশাইলে দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ধারণ করে, এগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উহার আদর অধিক।

ভেজাল—যে হিং কৃত্রিম বা ভেজাল, উহার বর্ণ সবুজ ও গন্ধ রসুনের ন্যায়।

বাজারে হিংএর সহিত আলু বা কচুর আঠা ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া হিং পোড়াইলে শতকরা ১০ ভাগ ছাই পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে বাজারে চারি প্রকার হিংএর চলন দেখা যায় :—

১। কান্দাহারী হিং
২। হিংগ্রা (ইউরোপীয়)
৩। ভারতীয় হিং
৪। পিণ্ড হিং

খোরাসানে পার্ব্বতীয় অঞ্চলে প্রচুর হিং বৃক্ষ বিনা যত্নে উৎপন্ন হয়; তথাকার পার্ব্বতীয় অধিবাসিগণ বসন্তকালে এই বৃক্ষ হইতে নির্য্যাস সংগ্রহ করিয়া বণিক্‌গণের নিকট বিক্রয় করে।

ইহাতে পার্ব্বতীয় অধিবাসিগণ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। তজ্জন্য উহারা আজকাল প্রত্যেক বৃক্ষের মূলের চারিদিকে ক্ষুদ্র প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া বৃক্ষটিকে বেষ্টন করিয়া রাখে এবং বৃক্ষের মূলের উপরিভাগস্থ মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিয়া গোলাকার গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে।

বসন্তকালে যখন এই বৃক্ষের শাখা বাড়িতে থাকে, তখন উহা কাটিয়া ফেলে ও মূলের উপরিভাগ কর্ত্তন করে, সুতরাং উহা হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহাই প্রকৃত উৎকৃষ্ট হিং।

কিন্তু বাজারে উহার সহিত নানা প্রকার ভেজাল মিশ্রিত করিয়া এখানে আসে। ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশীয়েরা এক্ষণে উহার সহিত পাতা লতা মাটি মিশ্রিত করিয়া একত্র চামড়ায় মুড়িয়া বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে। আর আমরা তাহাই উৎকৃষ্ট জ্ঞানে ক্রয় করি। বোম্বাই সহরে ইহার আমদানী অধিক। সেখানে ইহার সহিত আরবীয় গঁদ মিশ্রিত করিয়া অথবা আলু মিশ্রিত করিয়া কলিকাতায় চালান দেয়।

হিং বহুদিন যাবৎ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার মাত্রা ১ রতি হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত।

ডাক্তারীমতে--

ইহা উত্তেজক, প্রবল আক্ষেপনিবারক, ঈষৎ রোচক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক, কফনিবারক, ক্রিমিনাশক, রজোনিঃসারক।

ইহা তিক্ত, উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, ইহা পরিস্রুত সুরাতে দ্রব হয়।

হিষ্টিরিয়া বা অন্যান্য প্রকার স্নায়বীয় পীড়া, শ্বাস, কাস বা ফুসফুস ইত্যাদির প্রদাহ রোগে প্রযোজ্য।

ইহা বটিকাকারে বা মিশ্ররূপে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

১॥ তোলা হিং উষ্ণ জল ১০ ছটাক একত্র খলে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মাত্রা—১-২ কাঁচ্চা বটিকাকারে ব্যবহার করিতে হইলে হিং ১-৫ রতি মাত্রায় ব্যবহার্য্য। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার কালীন আক্ষেপ এবং ক্রিমিরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ডাক্তারগণ ইহার অরিষ্ট ও বটিকা করিয়া ব্যবহার করেন, কখন কখন হিং-এর পিচকারীও দেন।

১। হিঙ্গের অরিষ্ট—

সুরা—১০ ছটাক, হিং—৫ কাঁচ্চা, সপ্তাহকাল ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিতে হয়। মাত্রা—অর্দ্ধ ড্রাম হইতে ১ ড্রাম।

২। হিঙ্গ্বাদি বটিকা—

হিং—১ ছটাক, গন্ধসেন—১ ছটাক, মুসব্বর—১ ছটাক, গুড় অর্দ্ধ ছটাক, একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। মাত্রা—২—৫ রতি।

ইহা স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছাগত বায়ুরোগ অথবা অজীর্ণ থাকিলে ব্যবহার্য্য।

৩। হিঙ্গুর পিচকারী

হিং—৫ রতি, জল—২ ছটাক একত্র মর্দ্দন করিবে। ইহার মাত্রা রোগীর অবস্থানুসারে স্থির করা হয়।

ডাক্তারগণ বলেন—এইরূপে ব্যবহার করিলে ফুসফুস, পাকস্থলী, যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ড প্রভৃতিকে কার্য্যক্ষম করে।

হিং—স্নায়বিক পীড়া ও মূর্চ্ছা রোগে ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া যায়।

কোন কোন ডাক্তার বলেন—ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবকালে খাদ্যের সহিত প্রত্যহ অল্প পরিমাণে হিং সেবন করিলে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধ রোগে হিং অত্যন্ত উপকারী।

গুগ্‌গুল ও এমোনিয়াকের সহিত হিং টাইফয়েড রোগে প্রযোজ্য।

যে-সকল স্ত্রীলোকের বারবার গর্ভস্রাব হয়, তাহাদের পক্ষে হিং উত্তম ঔষধ।

বায়ুনাশক ও আধ্মানিবারক বলিয়া গ্রহণী, শূল প্রভৃতি রোগে ও ক্রিমি নিঃসরণার্থে ইহা প্রয়োগ করা হয়।

হকিমীমতে—

হিং সেবনে শিরোরোগ ও স্নায়বিক রোগসমূহ যথা—কালেজ রাশা—লাক্‌ওয়াহ-বোক, নজ্‌লা উন্মুখ সিবহীয়ান ও কাজ্জাজ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, কণ্ঠ, বক্ষ, পাকস্থলী, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগেও হিং বিশেষ উপকারী।

গোলমরিচ ও তেতলীচ্ছ ব্যবহারে কাকঙ্গাজ রোগে উপকার পাওয়া যায়।

স্নায়বিক রোগে মস্তের সহিত ব্যবহার্য্য। ইহার অঞ্জন ব্যবহারে চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি হয়, ছানি ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগেও ইহা বিশেষ উপকারী।

পোকাধরা দাঁতে লাগাইলে বেদনার উপশম হয়।

ডিম্বের হরিদ্রাংশের সহিত সেবনে শুষ্ক কাসি ও পার্শ্ববেদনার উপশম হয়।

জলের সহিত ব্যবহার করিলে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও পেটের বায়ু বিনষ্ট করে।

প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডুরোগে হিং বিশেষ উপকারী।

মোরমাক্ক ও গোলমরিচের সহিত ব্যবহারে প্রস্রাব ও ঋতু পরিষ্কার করে। ইহা গৃহে রাখিলে দূষিত বায়ুজনিত ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকা যায়।

মাড়ীর বেদনাতে চোয়ালের উপরিভাগে হিঙ্গের প্রলেপ দিলে বেদনার উপশম হয়।

অল্পপরিমাণে হিং—কাঁজির ও জুয়ার সহিত জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে কুলি করিলে দাঁতের পোকাজনিত ও শ্লেষ্মাবেদনা বিদূরিত হয়।

পুরাতন ইমারতে—বট প্রভৃতি আগাছা জন্মিলে উহা সহজে মরে না, কিন্তু ঐ সকল গাছ কাটিয়া উহার মূলদেশে হিং পূরিয়া দিলে ঐ সকল আগাছা মরিয়া যায়, পুনরায় জন্মায় না। তবে প্রথমবারে যদি তেমন ফল পাওয়া না যায়, দ্বিতীয়বারে নিশ্চয় ফল পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদীয়মতে—

ইহা—পাচন, উষ্ণ, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, বাতনাশক, শূল, গুল্ম ও ক্রিমিনাশক।

হিং, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, যবক্ষার, সৈন্ধবচূর্ণ লেবুর রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

হিং সৈন্ধব ও শঠীসহ পরিষ্কার তৈলে পাক করিয়া কানে দিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়।

দাঁতে পোকা লাগিলে হিং ভাজিয়া গরম গরম দাঁতের উপর দিলে পোকা নষ্ট হয়।

ভাবপ্রকাশমতে—

হিং, সচল লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বচ ও আতিস প্রভৃতির চূর্ণ উষ্ণ জলসহ পান করিলে শ্লেষ্মাজনিত অতিসার রোগ বিনষ্ট হয়।

গুল্মাদিরোগে—

হিং, পিপুলমূল, ধনে, জীরা, বচ, চই, চিতা আকনাদি, শঠী, তেঁতুল লবণত্রয় শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সজ্জিকাক্ষার, দাড়িম হরীতকী, কুড়, অম্লবেতস, হবুষা, কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে আদার রস ও নেবুর রসে ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে গুল্মাদিরোগ বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গুষ্টক—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কালজীরা ও হিং—সমভাগে লইয়া উহার চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

———

অনন্ত-মূল

ইহা এক প্রকার লতা। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র জন্মে। তবে সকল প্রদেশের লতা সমান নহে—কি আকৃতিতে কি প্রকৃতিতে। এই লতা সচরাচর বৃহৎ বৃক্ষ আশ্রয় লইয়া বর্দ্ধিত হয়। আশ্রয় না পাইলে কখনও কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া যায়। কিন্তু সে লতা তেমন বাড়িতে পারে না।

ইহার মূল শীঘ্র নষ্ট হয় না, সুতরাং যে স্থানে একবার এই লতা বর্দ্ধিত হয়, তাহা শুকাইয়া গেলেও বর্ষার প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন মূল হইতে নূতন লতা বাহির হয়।

যে অনন্তমূলের পাতা গাঢ় সবুজবর্ণ, সরু ও লম্বা, যাহার পাতার মধ্যস্থ শিরা হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্ম রেখা আছে, পাতায় কোন প্রকার রোম নাই, লতা ক্ষুদ্র, ডাঁটা সরু এবং মূলে ছারপোকার মত গন্ধ থাকে, তাহাকে লোকে গ্রাম্য-অনন্তমূল বলে।

মধুপুর অঞ্চলে অনন্তমূল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এক্ষণে মাড়োয়ারীগণ ঐ সকল স্থান হইতে বৎসর বৎসর হাজার হাজার টাকার অনন্তমূল কলিকাতা ও অন্যান্য প্রদেশে প্রেরণ করে।

মধুপুর অঞ্চলে যে অনন্তমূল জন্মে, তাহার পাতা অপেক্ষাকৃত চওড়া, লতা ক্ষুদ্র, মোটা ও দীর্ঘ হয়। বর্ষাকালে ইহার ফুল হয়। ইহার সরস মূল সুস্বাদু।

ইহা শুষ্ক হইলে মূলের ছাল স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়া অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহা শুষ্ক হইলেও ইহার গন্ধ দূর হয় না।

অনেকে শ্যাম লতা ও অনন্তমূলের পাতা একই বলেন। কিন্তু শ্যামা লতার পাতা অনন্তমূলের পাতা অপেক্ষা অনেক চওড়া, ঐ লতা অতি দীর্ঘ

ও মোটা। ছিন্ন করিলে উহা হইতে ক্ষীর বিনির্গত হয়। ইহারফুল গুচ্ছাকার, ফুলের বর্ণ সাদা। ইহার ফুল আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে প্রস্ফুটিত হয়।

ভাষাভেদে নামভেদ—

বাঙ্গালা—অনন্তমূল
ইংরেজী—Indian Sarsa Parilla
লাটিন—Hemidesmus Indicus
গুজরাটী—উপলসরী
তামেলি—নপ্পাবী
তেলেগু—সুগন্ধিপাল
কর্ণাটী—সারিবা
উৎকল—গুপালানমূল
হিন্দী—ওশবাতুল
ফার্সি—ওশ্‌বায়ে
উর্দ্দু—কালীসব, গৌরীসব, সালসা।
মহারাষ্ট্রী—কুকিউপলসরী

ইহার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সচরাচর ডাক্তার, কবিরাজ ও হকিমগণ ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং উহা সালসার মত উপকারী বলিয়া ইংরাজগণ উহাকে ইণ্ডিয়ান সালসাপ্যারিলা বলিয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদীয়মতে—

সংস্কৃত পর্য্যায় :—ধবলা, শারিক, গোপী, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোটা, শ্যামা লতা, অস্ফোতা, চন্দনা ইত্যাদি।

ইহার গুণ—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, ত্রিদোষ-নাশক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য ও রসায়ন।

অগ্নিমান্দ্য অরুচি, শ্বাস, কাস, আমজরোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বরাতিসার, উপদংশ, বিষজাত বিবিধ প্রকার বিকার, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, আমবাত, বাতরক্ত ও অবিধি পারদসেবনজনিত রোগসমূহ ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

ইহার মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা।

শ্যামালতার মূল পেষণ করিয়া মৃৎকলসীর অভ্যন্তরে ভাল করিয়া প্রলিপ্ত করিবে। পরে ঐ কলসীতে ঘোল রাখিলে, সেই ঘোল টক হউক বা না হউক, উহা অর্শরোগীকে পান করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

শ্যামালতার মূলের ক্বাথ পান করিলে ও উহা দ্বারা ব্রণ ধৌত করিলে ব্রণ আরোগ্য হয়।

শ্যামালতার মূলের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে মূষিক দংশনজনিত বিষ নষ্ট হয়।

ঘৃতের দ্বিগুণ মাত্রায় অনন্তমূলের ক্বাথ সহ একত্র পান করিলে শ্বাস প্রশমিত হয়।

সংগ্রাহক ও রক্তপিত্তনাশক যত কিছু দ্রব্য আছে, তন্মধ্যে অনন্তমূল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কবিরাজগণ ঘোষণা করেন।

শ্যামালতার মূলের ক্বাথ চক্ষুতে সেচন করিলে কুসুম নামক চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

বাসকলতার সহিত শ্যামালতার মূল বাটিয়া দুধের সহিত পান করিলে ঊর্দ্ধবাত আরোগ্য হয়।

ব্রণশুক্র নামক চক্ষুরোগে শ্যামালতার মূলের রস বা উহার ক্বাথ বিন্দু বিন্দু দিলে সত্বর আরোগ্য হয়।

ইহার মূল এক ছটাক কুটিয়া দেড়পোয়া পর্য্যন্ত ফুটন্ত জলে দুই ঘণ্টা-কাল ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইলে যে ক্বাথ বাহির হয়, উহা ৭॥ মাষা

মাত্রায় সেবন করিলে চুলকণা, কুষ্ঠ ও জ্বর নিবারণ হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়।

ইহা হইতে কবিরাজগণ যে সমস্ত তৈল প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে—

১। পিণ্ড তৈল—বাতরোগে প্রযোজ্য।

অনন্তমূল, ধূম, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মোম ও দুগ্ধসিদ্ধ তৈল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

২। মহাপিণ্ড তৈল—পামা, চর্ম্মদল ও বাতরক্ত প্রভৃতি বিনাশক।

অনন্তমূল, নিম, কুষ্মাণ্ড, পুঁইশাক—ইহাদের ক্ষারজল, গুলঞ্চের রস বা ক্বাথ, গব্যদুগ্ধ, কামরাঙ্গার রস, কাকোলী, জীবক, মেদ, মহামেদ, শলুফা, ক্ষীরনীবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, মোম, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধূনা, সৈন্ধব ও রক্তচন্দন দিয়া তিলতৈল পাক করিলে মহাপিণ্ড তৈল হয়।

৩। সারিবাদি কল্ক। জ্বরনাশক।

অনন্তমূল, বালা, মুথা, শুণ্ঠি, কটকী, একত্র পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ জলসহ সেবন করিলে স্বল্পকালমধ্যে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

মাত্রা—১।২ তোলা।

হকিমীমতে—

ইহা (অনন্তমূল) বলকারক। সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ—যাহা কিছু উপদংশ হেতু উৎপন্ন হয়, তৎসমুদয় হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

ইহা ওশক্ মগরেবীর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা তদপেক্ষাও উপকারী।

ইহাতে পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি করে ও ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং ইহা মূত্রকর।

ইহার ক্বাথ—অপরিপাক ও শ্বাসরোগে বিশেষ উপকারী।

ডাক্তারীমতে—

ইহা সালসাপ্যারিলার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে একপ্রকার উদ্বায়ী তৈল ও হেমিডিস্মিল্ নামক বীর্য্য আছে।

ইহা বিশেষ বলকারক, পরিবর্ত্তক, মূত্রকারক, স্বেদজনক, আগ্নেয় ও স্নিগ্ধকারক।

সর্ব্বাঙ্গের দুর্ব্বলতা, সর্ব্বপ্রকার উপদংশ, উপদংশের ক্ষত, পুরাতন বাত, জ্বর ও চর্ম্মপীড়ায় ইহা প্রযোজ্য।

অনন্তমূলের ফাণ্ট

অনন্তমূল কুটিয়া ২॥ তোলা পরিমাণ, ৫ ছটাক আন্দাজ ফুটন্ত জলে আবৃত পাত্রে এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ জল অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক মাত্রায় সেবনীয়।

অনন্তমূলের ক্বাথ

অনন্তমূল—২ ছটাক ও জল দেড় সের আবৃত পাত্রে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া পরে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক।

অনন্তমূলের পাক

অনন্তমূল কুটিয়া—২ ছটাক, পরিস্কৃত চিনি—১৪ ছটাক, ফুটন্ত জল—১০ ছটাক।

অনন্তমূল এবং জল একত্র একটি পাত্রে ৪ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়, পরে নীচে অপরিস্কৃত পদার্থগুলি জমিয়া

গেলে উপরিস্থিত স্বচ্ছ জল ঢালিয়া চিনির সহিত মিশাইয়া পাক প্রস্তুত করিবে। সমুদয়ে এক সের ৫ ছটাক ওজন হইবে। মাত্রা—১-৪ ড্রাম।

ইহার অন্যান্য ব্যবহার সম্বন্ধে ডাক্তারগণ বলেন—অনন্তমূল রসায়ন, ঘর্ম্ম ও মূত্রকারক এবং বলপ্রদ। ইহার চূর্ণ মাখনের সহিত ব্যবহৃত।

হামরোগে—অনন্তমূল—ইহার চূর্ণ মাখনের সহিত ভাজিয়া ব্যবহৃত হয়।

বাতরোগে—মধুর সহিত ব্যবহার করা হয়।

পাথরীরোগে—ইহার শীতল কষায় গোদুগ্ধ সহিত ব্যবহৃত হয়।

জ্বর ক্ষুধামান্দ্যে—ইহার ক্বাথ উপকারী।

অর্শরোগে—নারিকেলতৈল সহিত পান করান হয়।

ডাক্তার ওশনেসী বলেন—মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে এক পাইন্ট উষ্ণ জলে ২ আউন্স কুট্টিত অনন্তমূল ভিজাইয়া পান করিলে রোগীর মূত্রের পরিমাণ দ্বিগুণ ত্রিগুণ বাড়িয়া যায়।

ইহা বলকারক ও ঘর্ম্মদায়ক। ইহা সেবনে রোগীর ক্ষুধা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

তিনি যখন এখানে হাঁসপাতালে ছিলেন অনেক সময়ে নানা রোগে অনন্তমূল ব্যবহার করিতেন এবং ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। এমন কি, তিনি এই ঔষধ আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করিতেন ও অন্যান্য সকলকে ব্যবহার জন্য উপদেশ দিতেন।

পরিচয়—শ্যামালতার অপর নাম কৃষ্ণ অনন্তমূল।

কৃষ্ণ অনন্তমূল—

"ইয়ং জম্বুকবৎপত্রা সুগন্ধা কলঘণ্টিকা।
কৃষ্ণা তু শারিবা শ্যামা গোপী গোপবধূস্তথা॥"

শুক্ল অনন্তমূল--

ইয়মপি জম্বুকবৎপত্রা দুগ্ধবর্ণা ব্রততীর্ভবতি।
ধবলা শারিবা গোপী গোপকন্যা কৃশোদরী॥

অর্থাৎ ইহার অপর নাম ধবলা, শারিবা, গোপী, গোপকন্যা, কৃশোদরী।

ইহার গুণ—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, ত্রিদোষ-নাশক, ঘর্ম্মকারক ইত্যাদি।

উক্ত দ্বিবিধ লতাই অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, উপদংশ প্রভৃতি ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়।

আর্দ্রক (আদা)

দেশভেদে আর্দ্রকের নাম

সংস্কৃত—আর্দ্রক, শৃঙ্গবের	কর্ণাটী—অল্ল
বাঙ্গালা—আদা	তামিল—অল্লং
হিন্দী—আদরক	আরবী—জিঞ্জিবিল্‌তর
মহারাষ্ট্রী—আলং	ফার্সী—জিঞ্জি
গুজরাতি—আদু	ইংরাজী—জিঞ্জার

আদা শুষ্ক হইলে তাহাকে শুঁঠ বলা হয়।

হিন্দী—সোঁঠ	ফার্সী—জজবীল
গুজরাতি—শুন্ঠ্য	ইংরাজী—ড্রায়েড জিঞ্জার
কর্ণাটী—শুন্ঠি	সংস্কৃত—বিশ্বৌষধ, নাগর
তৈলঙ্গ—শোঠী	বিশ্বভেষজ

আদা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য, সুতরাং ইহা সকলের নিকট সুপরিচিত। ইহার গাছ প্রায় হলুদ গাছের মত। উভয়ের চাষও প্রায় একরূপ ভাবে হইয়া থাকে। ইহা গাছের কন্দ মাত্র।

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে—"আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবর কেন?" বাস্তবিক কিন্তু আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের খবর রাখা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে। কারণ, আদা জাহাজে করিয়া বিদেশে রপ্তানী হয় এবং নানা দেশ হইতে ইহার আমদানীও হইয়া থাকে।

আমদানী-রপ্তানীর যে বার্ষিক (রিপোর্ট) বিবরণী বাহির হয়, তাহাতে প্রকাশ যে, কেবল বাঙ্গালা দেশ হইতে বৎসর বৎসর নিম্নলিখিত তালিকামত রপ্তানী হইয়া থাকে।

আদার রপ্তানী

১৯১৯-২০	১৯২০-২১	১০২১-২২	১৯২১-২২
ওজন ১৯২ হন্দর,	৪৪২ হন্দর,	১৭৬ হন্দর,	৬৮৭ হন্দর,
মূল্য ৭, ২০০৲ টাকা,	১২,৩৭০৲	৬,০১৮৲	১৯,৬৮২৲

সমস্ত ভারতে আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী—

১৯১৯-২০	১৯২০-২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩
ওজন ৪৩৮ হন্দর,	২৯৪ হন্দর,	১৮৪৫ হন্দর,	৩৭২৮ হন্দর,
মূল্য ২০,৮১০৲	১৩,৫৭০৲	৪০,৩২০৲	৯৯,৫৪৬৲

সুতরাং উক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বৎসরে বৎসরে ক্রমেই ইহার আমদানী ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতেছে।

যে দ্রব্যের এইরূপ ভাবে আমদানী ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতেছে, সে দ্রব্যের জন্য জাহাজের খবর লওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন কি? তথাপি আমরা বণিক্ হইয়াও বলি—"আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবর রাখা কেন ?" ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মুখে এ সকল কথা শোভা পায়, কিন্তু আমরা বণিক, আমরা কোন্ লজ্জায় যে এরূপ বলি তাহা বুঝি না।

এতদ্ভিন্ন আমাদের দেশে আদা এত অধিক পরিমাণে ঔষধে, তরকারী ও অন্যান্য খাদ্যের সহিত ব্যবহৃত হয় যে আদার চাষ যত অধিক হউক না কেন, পড়িয়া থাকিতে পায় না। সুতরাং ইহার চাষ সম্বন্ধে সকলেরই কিয়ৎপরিমাণে জানা উচিত। আর রপ্তানী করিতে হইলে, আদা ও শুঁঠ এমন উৎপন্ন করিতে হইবে যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশজাত আদা ও শুঁঠ অপেক্ষা যেন অধিক আদরণীয় হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশ-জাত শুঁঠের বড় আদর নাই। আদর আছে মাদ্রাজের অন্তর্গত শার্ণদ জিলার শুঁঠের। একে ঐ প্রদেশের মৃত্তিকা আদার চাষের বিশেষ উপযোগী,

তাহার উপর মাদ্রজীদের চাষের পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকার। আর জ্যামেকা দ্বীপের আদার আদর সর্ব্বত্র অধিক। তবে ঐ দেশে আদা এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না যে, পৃথিবীর সকল লোকের অভাব বিমোচন করিতে পারে। কাজেই বাঙ্গালার শুঁঠ মাঝে মাঝে রপ্তানী হইয়া থাকে। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে রপ্তানী হয় যে, মাদ্রাজের সহিত তুলনা করিলে অতি সামান্য বলিলেও চলে। তবে আশা করা যায় যে, প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ইহার চাষ করিলে এবং সুন্দর ভাবে শুঁঠ প্রস্তুত করিতে পারিলে বঙ্গের আদার ও শুঁঠের অন্যত্র আদর হইতে পারে।

বলা বাহুল্য যে, উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হইলে খরিদ্দারের অভাব হয় না। বিশেষ য়ুরোপ খণ্ডে যে শুঁঠ রপ্তানী হয়, তাহা উৎকৃষ্ট না হইলে কেহ ক্রয় করে না। সেই জন্যই আদার চাষ-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতেছি। আশা করি, আমাদের যুবকগণ নিজ নিজ জমিতে কিছু কিছু পরিমাণে আদার চাষ করিয়া যেন পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, বাজারে বিক্রীত আদা ও শুঁঠ অপেক্ষা তাঁহাদের আদা ও শুঁঠ উৎকৃষ্ট হয় কি না।

বলা বাহুল্য, সকল প্রদেশে এবং সকল প্রকার ভূমিতে সমানভাবে কোন দ্রব্যই উৎপন্ন হয় না। মাটির তারতম্যানুসারে দ্রব্যের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের মধ্যে রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া প্রভৃতি জিলায় অধিক পরিমাণে আদা জন্মে। যশোহর, খুলনা ও ২৪ পরগণাতেও নিতান্ত অল্প চাষ হয় না।

নিম্ন জলাভূমি, কাঁকরময় বা এঁটেল মৃত্তিকাতে আদা ভাল উৎপন্ন হয় না। যাহাও বা হয়, তাহা হইতে শুঁঠ প্রস্তুত করিলে আদৌ ভাল হয় না। এতদ্ভিন্ন সকল প্রকার ভূমিতেই আদা জন্মে; তবে উচ্চ সরস দোআঁস মৃত্তিকায় যে আদা উৎপন্ন হয়, তাহা শুকাইয়া শুঁঠ প্রস্তুত করিলে বেশ

উৎকৃষ্ট শুঁঠ হয়। বিশেষতঃ জঙ্গল কাটিয়া যে ভূমির নূতন পত্তন হয়, তাহাতে আদা সুন্দর জন্মে। ইহার চাষে যথেষ্ট জলের আবশ্যক। এই জন্য সরস ও সচ্ছিদ্র স্থান দেখিয়া চাষ করিলে ভাল হয়। তবে এমন অধিক জল দিবে না, বা জমি এমন ভাবে প্রস্তুত করিবে, যাহাতে ইহার মূলে আদৌ জল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারে। জল দাঁড়াইলে মূল পচিয়া যায়।

যে কোন দ্রব্যের চাষ করা হউক,—চাষ করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া বা না হওয়া, নয়টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :—

(১) মৃত্তিকা, (২) জলবায়ু, দেশের আবহাওয়া, (৩) জলসেচনের ব্যবস্থা, (৪) আলোক বা সূর্য্যের কিরণ, (৫) চাষ দেওয়া মৃত্তিকা-খনন, হল চালন ইত্যাদি (৬) সারপ্রদান, (৭) বৃষ্টিপাত, (৮) তাহার উপর যত্ন ও সতর্কতা নিতান্ত আবশ্যক। আবার (৯) বীজনির্ব্বাচন ও বীজরোপণ-প্রণালী বিষয়ে দক্ষ হওয়া চাই।

সাধারণ বিঘা প্রতি ৫/ মণ হইতে ১৫/ মণ পর্য্যন্ত আদা উৎপন্ন হয়। আর সুদক্ষ লোকের হস্তে প্রতি বিঘায় ২৫/ মণ হইতে ৪০/ মণ পর্য্যন্ত ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। তাহার উপর বৈজ্ঞানিগণের আদেশমতে উন্নত প্রণালীতে চাষ করিতে পারিলে ১৫ বিঘা জমিতে ৭৫০/ মণ হইতে ১০০০/ মণ পর্য্যন্ত ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। সাধারণতঃ আদার বাজার ৬৲ হইতে ৮৲ টাকা; সুতরাং ২৫ বিঘায় ৭৫০/ × ৬৲ = ৪৫০০৲ হইতে ১০০০/ × ৮৲ = ৮০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে পারে। তাহার উপর নিজে চাষ করিতে পারিলে লাভের সীমা থাকিবে না। এতদ্ব্যতীত বিদেশে রপ্তানী নিজে করিতে পারিলে, ব্যবসার চূড়ান্ত হয়। কারণ, বিলাতে এক হন্দর (অর্থাৎ এক মণ৲৪সের) আদার মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেখা যায়। বলা বাহুল্য, য়ুরোপে যে আদা রপ্তানী হয়, তাহা শুঁঠ—কাঁচা আদা নহে।

গত বৎসর Planters Gazetteএ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আদার চাষে নিম্নলিখিত তালিকামত খরচ পড়ে—

বাবদ	খরচ	বাবদ	খরচ
১। ১০ খানা হাল	২॥০	৫। নিড়ান প্রভৃতিতে	৮৲
২। সারাদিন জমি প্রস্তুত করিতে	৮৲	৬। ফসল সংগ্রহ করিতে	৩৲
৩। ২০ জন মজুর	৫৲	৭। জল-সেচন	৬৲
৪। রোপণ ব্যয়	২॥০	৮। জমির খাজনা	২৶০
		একুনে	৩৭৶০

আরে যদি নিতান্ত কম উৎপন্ন হয় তবে ধর—১০/০মণ, এবং প্রতি মণের মূল্য যদি খুব কম হয়, তবে ৬৲ করিয়া মণ। সুতরাং আয় অন্ততঃ ৬০৲ হইবেই। তবে নিট মুনাফা হইল—২২৷৶ বিঘা প্রতি।

আর যদি উৎকৃষ্ট উপায়ে চাষ করা যায়, তবে নিম্নলিখিত ফর্দ্দমত খরচ হওয়া সম্ভব।

১। খাজনা	২।০	১০। সর্ষপ খইল ১/	৫৲
২। জমি পরিষ্কার	৭৲	১১। রেড়ীর খইল ১/	৪৲
৩। রোপণ	১৲	১২। সার পচান	১।০
৪। বীজের মূল্য	৪৮৲	১৩। রোপণের পর শুশ্রূষা	৫॥০
৮৲ হিঃ ৬/০ মণ		১৪। জল সেচন	৫৲
৫। খনন কর্ম্মে	২॥০	১৫। সংগ্রহে	২॥০
৬। সার প্রদানে	১৮৲	১৬। শুষ্ককরণে	২॥০
৭। গোময়		১৭। রপ্তানীর জন্য	১৲
৩০/০ মণ	৬৲	১৮। অন্যান্য ব্যয়	২॥০
৮। ধোলাই খরচ	১॥০		
৯। তদারক জন্য	২॥০	মোট—	১১৮৲

বীজ নির্ব্বাচন ও বীজ বপন

সচরাচর বাজারে যে সকল আদার বীজ বলিয়া বিক্রীত হয়, তাহা প্রায় শুষ্ক অবস্থায় থাকে; সুতরাং এই বীজ ক্রয় করিয়া আনিয়াই সদ্য সদ্য পুঁতিলে গাছ ভাল হয় না, কন্দও তেমন পরিপুষ্ট হয় না। সুতরাং এইরূপ বীজকে ২।৩ ইঞ্চি ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটিয়া তিন সপ্তাহ-কাল মাত্র এক অন্ধকারময় স্থানে পোয়াল চাপা দিয়া রাখিতে হয় কিম্বা স্বল্প গভীর খাদমধ্যে ২।৩ ইঞ্চি ছাই ছিটাইয়া তাহার উপরে ২।৩ ইঞ্চি দলভাবে বীজের টুকরাগুলি রাখিয়া তদুপরি ছাই চাপা দিবে। এইরূপে সাজাইয়া সাজাইয়া খাদটি পূর্ণ করিবে এবং তাহার উপর পোয়াল চাপা দিয়া একটা আচ্ছাদন দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবে। ১০।১৫ দিনের মধ্যেই নূতন নূতন কল বাহির হইয়া পড়িবে। তখন আস্তে আস্তে সেইগুলি তুলিয়া লইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। রোপণ করিবার পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টি পাইলেই সমস্ত ক্ষেত্রটা কোদাল দ্বারা বেশ করিয়া লম্বা লম্বা ভাবে একহাত অন্তর ৫।৬ ইঞ্চি গভীর নালা কাটিয়া, তাহার মধ্যে একহাত অন্তর আদার বীজগুলি বসাইয়া দিবে। যখন গাছ বাহির হইয়া তেজ করিয়া উঠিবে, অমনি উভয় পংক্তির মধ্যস্থ মাটি কোদাল দিয়া উঠাইয়া গাছের গোড়ায় সাজাইয়া দিবে (ইহাকে দাঁড় বাধা বলে)। যদি বর্ষা অতিরিক্ত হয়, উক্ত নালা দিয়া জল বাহির হইয়া যাইবে। আর বৃষ্টি তেমন না হইলে ঐ নালার মুখ বন্ধ করিয়া দিলে জল বাহির হইতে না পারিয়া, গাছের গোড়া ভিজাইয়া রাখিবে। বৃষ্টি আদৌ না হইলে আবশ্যক-মত জল সেচন করিতে হইবে। মনে থাকে যেন, অধিক বৃষ্টির জলে যেমন পচিয়া যায়, তেমনি উপযুক্ত জল না পাইলে শুকাইয়া যায়। সেই জন্য প্রত্যহ গাছের গোড়ার দিকে নজর রাখিতে হইবে। যাহাতে গাছের গোড়া সরস থাকে, অথচ জল না বসে, এইটি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

আবার বর্ষার জলে জমিতে প্রায় ঘাস গজাইয়া উঠে, সেই জন্য উহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই সময় ঘাস তোলা, আইল মেরামত করা বা গাছের গোড়ায় মাটি ধরান ভিন্ন অন্য কোন পাট করিবার আবশ্যক নাই।

আর বীজ যদি ক্ষেত্র হইতে সদ্য উত্তোলন করিয়া বসান হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বীজের পাটের জন্য পৃথক কষ্ট লইবার আবশ্যকতা নাই। সদ্য পুঁতিলেই গাছ বাহির হইবে।

চাষ ও সার

বীজ রোপণ করিবার পূর্ব্বে জমিতে উত্তমরূপে চাষ দিতে হইবে। চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস উপর্য্যুপরি পুনঃ পুনঃ চাষ দিয়া মাটি বেশ আলগা করিয়া লইবে। পরে উহাতে গোবর-সার বা খইল-সার মিশাইয়া বেশ করিয়া মই দিয়া জমি সরল করিয়া ফেলিবে। দিন কতক রৌদ্রে শুষ্ক হইলে বৈশাখের শেষে যেদিন বৃষ্টি হইবে, তাহার পরেই আইল কাটিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ শুষ্ক ও পচা গোময়-সার এবং অল্প পরিমাণে খইল দিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করাই চাষের একমাত্র উদ্দেশ্য। জমি উর্ব্বর হইলে কন্দ পুষ্ট হয়।

আদার ক্ষেত্রে চারিদিকে বেড়া দেওয়াও আবশ্যক; নচেৎ গরু বাছুর প্রভৃতি জন্তু গাছ নষ্ট করিয়া ফেলিলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

ক্ষেত্র এইরূপে উর্ব্বর করিয়া তাহার পর বীজ বপন করিলে আশ্বিনের মধ্যেই সমস্ত ক্ষেত্রটা দেড় বা দুই হাত উচ্চ গাছে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। এই সময় মাটি গাছের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলে, যাহাতে তৃণাদি দ্বারা কোন অপকার না হয়, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। নিড়ান দেওয়া একমাত্র পাট।

আদা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে প্রায়ই মাটি চটিয়া যায় এবং পৌষের শেষ বরাবর বা মাঘ মাসের প্রথমেই গাছগুলি শুষ্ক হইয়া যায়। গাছগুলি বেশ শুষ্ক হইলে অর্থাৎ পাতাগুলি শুকাইয়া পড়িয়া যাইলে ১০।১২ দিন পরে দাড়াগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া আদার কন্দগুলি বাহির করিয়া লইতে হয়।

শুঁঠ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আদা শুষ্ক করিয়া লইলে শুঁঠ প্রস্তুত হয়। তবে ইহা শুষ্ক করিবার একটু কায়দা আছে। কারণ, শুঁঠ মলিন বা বিবর্ণ হইয়া গেলে ভাল দাম পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বিলাতে মলিন শুঁঠ আদৌ পছন্দ করে না।

সুতরাং আদাগুলি মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার জলে ধৌত করিতে হয়। তাহার পর ছুরি দ্বারা আদার উপরিভাগটা আস্তে আস্তে চাঁচিয়া ফেলিতে হয়, যাহাতে শিকড়গুলি ও ত্বক্‌অংশ গাত্র হইতে উঠিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার পর একখানি পরিষ্কার শণের চটে ভাল করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া লইতে হইবে। তৎপরে আবার পরিষ্কার জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া লইলে শুঁঠ বেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। যতই উত্তমরূপে ধৌত হইবে, ততই শুঁঠ শুভ্র দেখাইবে।

তবে রাত্রে শিশিরে বা মেঘাচ্ছন্ন দিবসে বাহিরে রাখিলে শুঁঠ একটু বিবর্ণ হইয়া যায়। এই জন্য দিনের বেলায় রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া রাত্রে গৃহমধ্যে উঠাইয়া রাখিলে ভাল হয়।

একসপ্তাহ কাল বা দশ দিন যাবৎ এইরূপে শুকাইয়া লইয়া আর একবার শণের চটে ঘসিয়া লইলে এবং পুনরায় পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া পুনরায় শুকাইয়া লইলে ভাল হয়।

এইরূপে কন্দগুলি বেশ শুষ্ক হইলে বস্তাবন্দী করিয়া গৃহমধ্যে রাখিয়া দিবে। তাহার পর বিক্রয় জন্য বাজারে প্রেরণ করিবে। বস্তাবন্দী করিবার পূর্ব্বে যে মূলগুলি হালকা বা অপুষ্ট, সেইগুলি পৃথক্ করিয়া

লইয়া তাহার পর বস্তাবন্দী করা উচিত। কারণ, ঐরূপ অপুষ্ট শুঁঠে শীঘ্র কীট জন্মায় এবং ভালর সঙ্গে মন্দ থাকায় ভালগুলি পর্য্যন্ত কীটদষ্ট হইয়া সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়।

শুঁঠ যত উত্তমরূপ শুষ্ক, শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট ও মসৃণ হয়, ততই উহার দাম অধিক হয়। সেই জন্য শুঁঠ প্রস্তুত কবিবার সময় বিশেষ যত্ন সহকারে ধৌত ও শুষ্ক করিতে হয়।

এই বিষয়ে যত্ন লওয়াই আসল কাজ। নচেৎ সমস্ত পরিশ্রমই নষ্ট হইয়া যায়। জ্যামেকা শুঁঠ অতি শুভ্র, মসৃণ ও উজ্জ্বল। মাদ্রাজেব শার্ণদ জেলার শুঁঠও অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু জ্যামেকা শুঁঠের মত তত শুভ্র বা উজ্জ্বল নহে। তবে ভারতের মধ্যে শার্ণদ শুঁঠের মত উৎকৃষ্ট শুঁঠ আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেই জন্য ভারত হইতে যত পরিমাণ শুঁঠ য়ুরোপে রপ্তানী হয়, সে সমুদায়ের মধ্যে বারো আনা ভাগ শার্ণদ শুঁঠ, অবশিষ্ট সিকি অংশ মাত্র বঙ্গদেশ ও অন্যান্য প্রদেশজাত।

শার্ণদ শুঁঠ দেখিলে বোধ হয় যেন সে শুঁঠগুলি অন্য জাতীয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উক্ত প্রদেশের মাটি আদার পক্ষে অতি উত্তম এবং মাদ্রাজীরা উহার চাষও একটু বিভিন্নরূপে করিয়া থাকে।

শার্ণদবাসীরা প্রথমে জমি প্রস্তুত করিয়া পরে এক একটি চৌকা করিয়া লয়। তাহার মধ্যে ৯।১০ ইঞ্চি অন্তর ছোট ছোট গর্ত্ত কাটিয়া সার মিশাইতে থাকে। তাহার পর বৃষ্টির জল পাইলেই ২।৩টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া এক একটি বীজ বসাইয়া দেয়। তৎপরে তাহার উপর একপ্রকার গাছের পাতা দিয়া পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তগুলি আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। এই পাতা পচিয়া উত্তম সারের কাজ করে। সে গাছ আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, সুতরাং অন্য কোন গাছের পাতা দিয়া গর্ত্ত আচ্ছাদিত করিয়া দিলে একপ্রকার পোকা জন্মে, তাহারা আদার বীজগুলি

একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। হিতে বিপরীত হয়। ইহাই উক্ত প্রদেশে চাষের বিশেষত্ব।

শ্রীহট্ট প্রদেশে যে শুঁঠ হয়, তাহা বেশ উত্তম। সময়ে সময়ে এই আদার মূল্য জ্যামেকা আদার অপেক্ষা অধিকও হয়। শ্রীহট্টবাসীরা আদার মূল উত্তোলন করিয়া প্রথমে জলে ধৌত করে। তাহার পর গোবরমিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখে। জল হইতে তুলিয়া লইয়া শুষ্ক করিবার জন্য ঝাঁকায় রাখিয়া তাহাতে ধূম দেয়। তাহার পর চূণ-মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখে। একরাত্রিমাত্র এইরূপ ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে তুলিয়া লয় এবং পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া লয়। তাহার পর ইহা উনানের উপর অল্প উত্তাপে রাখিয়া দেয়। এইরূপে শুষ্ক-হওয়া শুঁঠ অতি শুভ্র ও উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে।

বোম্বাই প্রদেশে মূল উত্তপ্ত করিয়া তাহা ইষ্টকে ঘষিয়া লয়। তাহার পর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। অন্যান্য বিষয়ে বঙ্গদেশের মতই ইহার চাষ করিয়া থাকে।

বিহার জেলায় পাটনাতেও বেশ উৎকৃষ্ট শুঁঠ প্রস্তুত হয়। কিন্তু তথায় ঠিক বঙ্গদেশের মতই চাষ দেয়। তবে মাটির গুণে পাটনাই আদা একটু শুভ্র ও উজ্জ্বল হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে যে সকল শুঁঠ প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় মলিন ও কর্কশ; সেই জন্য উক্ত প্রদেশের আদা বা শুঁঠ আদৌ রপ্তানী হয় না। খান্দেশ প্রভৃতি প্রদেশে চূণের জলে আদা ভিজাইয়া তাহার পর শুকাইয়া লয়। কিন্তু তৎপ্রদেশজাত শুঁঠ তেমন উজ্জ্বল বা শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট হয় না।

জ্যামেকা দ্বীপে ঠিক বঙ্গদেশের মত আদার চাষ করা হয়। তবে বীজরোপণ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক গর্ত্ত এক মাস যাবৎ উত্তম সার দিয়া ফেলিয়া রাখে। তাহার পর বৃষ্টির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বীজ রোপণ

করে, এবং তাহার উপর ইক্ষুপত্র চাপা দিয়া রাখে। তাহারা যে কি উপায়ে এমন উজ্জ্বল ও শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট শুঁঠ প্রস্তুত করে, তাহা অন্য কোন দেশীয় বণিক বা চাষীকে দেখিতে দেয় না।

গুণাগুণ

শুঁঠের গুণাবলী-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ডাক্তারগণের মত এইরূপ—

শুঁঠ—সুগন্ধি, উষ্ণ ও বায়ুনাশক। ইহা সেবনে পেট গরম হয় ও পেট জ্বালা করে। ইহা উদরস্থ সঞ্চিত বায়ু নিঃসারিত করিয়া উদরাধ্মান প্রশমিত করে। বায়ুনাশক বলিয়া শূলরোগে বেশ উপকার করে। আর্দ্রক চর্ব্বণ করিয়া খাইলে হজম হয়। গরমজলে শুঁঠ-চূর্ণ মিশাইয়া ললাটে দিলে শিরঃপীড়ায় উপকার হয়। তিক্ত ভেষজদ্রব্যকে সুগন্ধি করিবার জন্য শুঁঠ ব্যবহৃত হয়। রেড়ির তেলের সহিত আদার রস দিয়া সেবন করিলে জোলাপের কাজ করে। রসুন ও মধুর সহিত শুঁঠের গুঁড়াতে কাসশ্বাসে উপকার পাওয়া যায়। Kairy's "Materia Medica."

বৈদ্যকগণের মত

ভাবপ্রকাশ—

বিষম জ্বরে—পীতপুষ্প, বেড়েলার মূলের ছাল ও শুণ্ঠী বা শুঁঠ সমান ভাগে লইয়া ক্কাথ করিবে। ২।৩ দিন এই ক্কাথ পান করিলে শীত ও কম্পদাহ-সমন্বিত বিষমজ্বর দূর হয়।

বিসূচিকায়—বেলশুঁঠ ও শুণ্ঠীর ক্কাথ পান করিলে বমন ও বিসূচিকা প্রশমিত হয়।

অজীর্ণে—খেজুর ও পানিফলের অতিভোজন জন্য অজীর্ণ রোগে শুঁঠ উপকারক; এবং ছাগীদুগ্ধ দ্বারা ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া শুণ্ঠীর ক্কাথ হিক্কা-নাশক।

শীত-পিত্তরোগে—পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস বিশেষ উপকারক।

চক্রদত্ত বলেন—**উরুস্তম্ভে**—গোমূত্র বা দশমূলের ক্বাথের সহিত শুঠচূর্ণ পান করিবে।

আমবাতে—রোগী কাঁজির সহিত শুঁঠচূর্ণ পান করিবে।

হৃদ্‌রোগে—শুঁঠের ক্বাথ গরম গরম পান করিলে হৃদ্‌রোগ ও কাসাদির পক্ষে হিতকর।

শিরোরোগে—গব্যদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে তীব্র শিরোবেদনা প্রশমিত হয়।

সুশ্রুতে আছে—

কর্ণশূলে—তিলতৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে বিন্দু বিন্দু করিয়া দিলে কানের ভিতরের বেদনা নিবৃত্তি হয়।

চরকে আছে—

শোথে—পুরাতন গুড় ও আদা তুল্য ভাগে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া এক মাস সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ বা মাংসের যূসের সহিত অন্ন পথ্য দিবেন।

অর্শে—চিতামূল ও শুঁঠচূর্ণ সমভাগে সীধু নামক মদ্যের সহিত সেবন করিলে উপকার হয়।

আর্দ্রকের গুণাগুণ সম্বন্ধে ধন্বন্তরির ও রাজনিঘণ্টুর মত—

"কটুকমার্দ্রকং হৃদ্যং বিপাকে শীতলং লঘু।
দীপনং রুচিদং শোফকফকণ্ঠাময়াপহম্‌॥
কফানিলহরং স্বর্য্যং বিবন্ধানাহশূলজিৎ।
কটূষ্ণং রোচনং বৃষ্যং স্নিগ্ধং চৈবাহর্দ্রকং স্মৃতম্‌॥"

এবং শুণ্ঠী সম্বন্ধে রাজনিঘণ্টুতে আছে—

"শুণ্ঠী কটূষ্ণা স্নিগ্ধা চ কফরোগানিলাপহা।
শূল-বিবন্ধোদরাধ্মান-শ্বাসশ্লীপদহারিণী॥"

শুনা যায়, আমাদের পূজনীয় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় আদা ও শুঁঠের সর্ব্বদাই শতমুখে প্রশংসা করিতেন এবং কি ছেলে, কি বুড়া সকলকে বলিতেন—"আদা-জল খেয়ে লেগে যাও, কৃতকার্য্য হইবেই হইবে।"

কাহারও অরুচি হইলে বলিতেন—

"প্রত্যহ সকালে একটু একটু নুন-আদা খেও, অরুচি সেরে যাবে।"

আবার কাহাকেও শূলরোগে ভুগিতে দেখিলে তিনি স্বয়ং শূলের প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সে ব্যবস্থাটি এই—

মূলতানী হিং ।।৵০ আনা আন্দাজ ওজনের লইয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইবে। পরে ঐ হিং সাজিনামূলের ছালের রসে মাড়িবে। আরও বলিতেন —দেখ বাপু, যেন ভুলিয়া জল দিও না; এবং ক্রমশঃ উহাতে সোহাগার খৈ ২।০ তোলা ওজনে ও শুঁঠচূর্ণ ৫তোলা এবং ২।।০ তোলা বিট্‌লবণ দিয়া একে একে মাড়িয়া লইবে। মাড়িতে মাড়িতে যখন জমাট বাঁধিয়া আসিবে, তখন ঐ সমস্তটা হইতে ৪৫টি মাত্র বটিকা প্রস্তুত করিবে। এবং প্রত্যহ প্রাতে গরম জলসহ একটি করিয়া বটিকা সেবন করিও। ২০।২৫ দিন-মধ্যেই তোমার শূলরোগ একেবারে সারিয়া যাইবে। আর কখনও শূলের বেদনায় কষ্ট পাইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার আদেশমত যে যে রোগী উক্ত বটিকা সেবন করিয়াছিলেন, সকলকেই শূলরোগমুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট চিরবাধিত হইয়াছিলেন।

চীনবাসীরা আদা মিশাইয়া অনেক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করে। বারো মাস আদা সরস থাকে না বলিয়া, তাহারা টিনের কৌটা-মধ্যে চিনির রসে

ভিজাইয়া রাখে। অবশ্য এরূপভাবে রাখে, যাহাতে হাওয়া প্রবেশ করিতে না পারে; এবং বাজারে যে আদা টিনে করিয়া বিক্রয় হয়, তাহার মুখ ঝালা থাকে। সুতরাং উক্ত আদা বহুদিন যাবৎ বিশুদ্ধভাবে সরস থাকে। কলিকাতার চীনবাসীরা ঐ টিনের আদা ব্যবহার করে।

Confucius নামক চীনের সুবিখ্যাত ধর্ম্মপাল ও দার্শনিক প্রত্যহ আহারের সময় আদা দিয়া কি অন্ন, কি ব্যঞ্জন, কি ফলফুলারী আহার করিতেন। এমন কি, যদি কোথাও নিমন্ত্রণে গিয়া দেখিতেন, ইহাতে আদা দেওয়া হয় নাই, আর তাঁহার ভোজন করা হইত না। তিনি বলিতেন, যিনি প্রত্যহ আদা বা আদার রস সেবন করেন, তাঁহাকে কোন ব্যাধিই আক্রমণ করিতে পারে না।

———

হরিদ্রা

:বণেতি মসলার মধ্যে হরিদ্রা অন্যতম। গন্ধবণিক্‌গণ বহুকাল হইতেই এই হরিদ্রার ব্যবসায়ে লাভবান্‌ হইয়া আসিতেছেন, তাই আমরা মনসার ভাসানে দেখিতে পাই, যে সময়ে চাঁদ সদাগর সিংহলে বাণিজ্যার্থ গমনের উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময়—

"চাঁদ বলে শুন ওহে গোবিন্দ ভাণ্ডারী
যুক্তি দেহ কি কি বস্তু নিমু ভরা ভরি।
গোবিন্দ কহিলা তবে শুন সদাগর
সিংহলেতে হরিদ্রার বড়ই আদর।
যত পার নায় ভরি হরিদ্রা লইবা
ধামায় মাপিয়া সোনা বদলে পাইবা।"

বাস্তবিকই একটা প্রবাদ আছে—লঙ্কায় সোনা সস্তা, আর সেথায় হলুদ জন্মে না। তাহার উপর হলুদ যেমন বঙ্গদেশে জন্মে, সেরূপ হলুদ আর কোথাও পাওয়া যায় না; না ভারতের দাক্ষিণাত্যে, না পশ্চিম প্রদেশে। বাঙ্গালার মাটি হলুদ চাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ পাবনা জেলার হলুদের সর্ব্বত্রই সমান আদর। সেই জন্য বাজারে পাবনার হলুদের দাম অন্যান্য হলুদের দাম অপেক্ষা অনেক বেশী।

আজকাল বাজারে পাবনা হরিদ্রার দাম ১৪৲ টাকা মণ, আর অন্যান্য হরিদ্রার মূল্য ১২॥ টাকা ১৩৲ মাত্র। শুদ্ধ তাহাই নহে, গত চৈত্র মাসে পাবনা হরিদ্রার মণ ৩২৲ টাকা অবধি বিক্রয় হইয়াছিল। এইরূপ মূল্যের তারতম্যেই বণিকের লাভ। বাজারে ক্রয় করিয়া বিক্রয়ে অতি অল্পই

লাভ হয়, আর নিজের জমিতে চাষ করিলে অধিক লাভবান্ হওয়া যায়। এই জন্য হলুদের চাষ করিতে জানা অতি আবশ্যক। তাই আজ আমরা হরিদ্রা-চাষ-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। ইহা পাঠ করিয়া যদি একজনও উপকৃত হন, তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে। নচেৎ কেবল মুখে বলিব,—অমুক কর, অমুক কর, আর কাজের বেলায় পিছাইয়া যাইব, তাহাতে কোন কালেই উপকার হয় নাই—হইবে না। সমুদ্রগমন ত' বন্ধ হইয়াছে, এখন ঘরে বসিয়া চাষ করাও বন্ধ হইলেই চূড়ান্ত হয়।

অনেকের বিশ্বাস যে, হরিদ্রা কেবল ভারতবাসী ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপ-সমূহের অধিবাসিগণের আদরের বস্তু, কিন্তু তাহা সত্য নহে। কমার্শিয়াল গেজেটে আমরা দেখিতে পাই, এই বঙ্গদেশ হইতেই উত্তরোত্তর বহুল পরিমাণ হরিদ্রা য়ুরোপ খণ্ডে বৎসর বৎসর রপ্তানী হইতেছে।

১৯১৯-২০ সনে—৭০,৮২০৲ টাকা মূল্যের হরিদ্রা রপ্তানী হইয়াছিল।
১৯২০-২১ সনে—৪৪,৯৩০৲ " " "
১৯২১-২২ সনে—৭১,৫২২৲ " " "
১৯২২-২৩ সনে—১,৭৪,২৬০৲ " " "
১৯২৩-২৪ সনে—২,০৫,১০২৲ " " "

উক্ত কারণবশতঃই হরিদ্রার মূল্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। সুতরাং হরিদ্রার চাষ দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হওয়া উচিত।

হরিদ্রার চাষ কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানিবার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ দেশে এবং কোন্ কোন্ ভাষায় হরিদ্রার কি নাম, তাহা জানা আবশ্যক।

সংস্কৃত ভাষায় হরিদ্রা শব্দের পর্য্যায় :—

"হরিদ্রা কাঞ্চনী পীতা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী।
ক্রিমিঘ্না হলদী যোষিৎপ্রিয়া হরবিলাসিনী॥"

অর্থাৎ :—হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, নিশা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্না, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া ও হরবিলাসিনী, এতদ্ভিন্ন রাত্রিকালের সমস্ত শব্দই হরিদ্রার নাম।

দেশভেদে হরিদ্রার নামভেদ :—

বাঙ্গালায়—হলুদ
মহারাষ্ট্রে—হলদি, হল্লদ
কর্ণাটে—অরসিন
তৈলঙ্গে—পাস্থপু
দাক্ষিণাত্যে—হলদ
গুজরাটে—হলদব
আসামে—হালধি
হিন্দীতে—হর্দ্দী বা হল্‌দী
ফার্সীতে—জরদতোব
আরবী—উরুকুস্ সুফর

ইংরেজীতে—টার্মারিক (Turmeric)।

ডাক্তারী নাম—কুরকিউমা লঙ্গা (Curcuma Longa)

সচরাচর বাজারে আমরা চারিপ্রকার হরিদ্রা দেখিতে পাই—(১) কাজলা, (২) হুক্‌মো, (৩) বাঘহাতা, (৪) পাকালিয়া। তন্মধ্যে কাজলাই সর্বোৎকৃষ্ট, তাহারই পর পাকালিয়া।

এতদ্ভিন্ন দেশভেদে হলুদ নানা জাতীয় দেখা যায়—ছাঁচি, আদা গেঁটে, খেজুরছড়ি, বাঘনালী, বয়াববাট ইত্যাদি। আবার কাছাড় প্রদেশে এক-প্রকার হলুদ জন্মে, তাহা দেখিতে বেশ মোটা বটে, কিন্তু তাহাতে ভাল শুঁঠ হয় না। এই জন্য লোকে ইহাকে কামরাঙ্গা বলে ; কাঁচা অবস্থায় চীনে সিন্দূরের মত লালবর্ণ, কিন্তু সিদ্ধ করিলেই উহা বিবর্ণ হইয়া যায়। তাই বাজারে ইহার আদর আদৌ নাই বলিলেই চলে।

আবার বৈদ্যশাস্ত্র মতেও হরিদ্রা চারিপ্রকার।

(১) আম্রহরিদ্রা—যাহাকে আমরা আম আদা বলি।

(২) বনহরিদ্রা—ইহার অপর নাম জংলী হলুদ।

(৩) কর্পূরহরিদ্রা—ইহার গন্ধ ঈষৎ কর্পূরের মত।

(৪) দারুহরিদ্রা—ইহা নেত্ররোগে ও কর্ণরোগেও ব্যবহৃত হয়।

হরিদ্রার গুণ-সম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

সাধারণ হরিদ্রা বা হলুদ—

"হরিদ্রা কটুতিক্তোষ্ণা কফবাতাস্রকুষ্ঠনুৎ।
মেহ-কুণ্ডব্রণান্ হন্তি দেহবর্ণবিধায়িনী॥" রাজনিঘণ্টুঃ।

ভাবপ্রকাশমতে—

"হরিদ্রা কটুকা তিক্তা দেহবর্ণ-বিধায়িকা।
উষ্ণঃ রুক্ষা শোধনী চ স্ত্রীণাস্তু ভূষণী মতা॥"

আর আময়িক প্রয়োগ সম্বন্ধে আছে—

"কফং বাতং রক্তদোষং কুষ্ঠং কণ্ডুং প্রমেহকম্।
ত্বগ্‌দোষঞ্চ ব্রণং শোথং পাণ্ডুরোগং ক্রিমীন্ বিষম্।
পীনসং চারুচিং পিত্তমপচীং চৈব নাশয়েৎ॥"

সচরাচর ইহার ব্যবহারের মাত্রা অর্দ্ধতোলা মাত্র।

আম্রগন্ধ হরিদ্রার গুণ ও নামাবলী—

"আম্রনাম্নী হরিদ্রা তু তিক্তা চাম্লা রুচিপ্রদা।
লঘ্ব্যগ্নিদীপনী চোষ্ণা তুবরা চ সরা মতা।
কফং চোগ্রব্রণং কাসং শ্বাসং হিক্কাং জ্বরং তথা।
মুখরোগং রক্তদোষং বাতং শূলঞ্চ নাশয়েৎ॥"

প্রয়োগে ইহার মাত্রা দুই আনা মাত্র।

দেশভেদে নামভেদ—

বাঙ্গালায়—আমাদা	তৈলঙ্গে—কারুপাসুপু
হিন্দীতে—আম্বায়া হলদ	মহারাষ্ট্রে—আম্বেহল্লদ
গুজরাটী—আম্বীহলদর	ইংরেজীতে—Mangoginger.
কর্ণাটে—হুলী অরসিন্	ডাক্তারী নাম—Curcuma Amadia.

বনহরিদ্রার গুণ ও নামাবলী—

"আরণ্যকহরিদ্রা তু কটুকা মধুরা মতা।
রুচ্যগ্নিদীপনী তিক্তা কুষ্ঠবাতত্রিদোষহা।
রক্তদোষং বিষং শ্বাসং কাসং হিক্কাঞ্চ নাশয়েৎ॥"

প্রয়োগে মাত্রা দুই আনা।

দেশভেদে নামভেদ—

হিন্দুস্থানী—জংলী হলদী
বোম্বায়ে—রাণ হলদ ও কাচোরা
কোঙ্কণে—অরিসিন
তামিলে—কস্তূরী মঞ্জল
তৈলঙ্গে—অড়বিপশুপু
আসামে—কেটুরী;
মহারাষ্ট্রে—শোলী বানহল্লদ ও অড়িবিষকা;
ডাক্তারী নাম—Wild Turmeric.

কর্পূর-হরিদ্রার গুণ ও নামভেদ—

"কর্পূরনাম্নী চ নিশা শীতা তিক্তা চ বাতলা।
স্বাদ্বী বৃষ্যা মধুরসা কণ্ডূপিত্তবিনাশিনী॥"

ইহাকে হিন্দুস্থানে—কর্পূর হলদী ও তৈলঙ্গে কর্পূর হরিদ্র মনেবস্তু বলে। ইহার মাত্রা দুই আনা।

দারুহরিদ্রার গুণ ও নামভেদ—

"দার্ব্বী দারুহরিদ্রা চ পর্জ্জন্যা পর্জ্জনীতি চ।
কটঙ্কটেরী পীতা চ ভবেৎ সৈব পচম্পচা॥
সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালেয়কোঽপি চ।
পীতদ্রুশ্চ হরিদ্রুশ্চ পীতদারু কপীতকম্।
দার্ব্বী নিশাগুণা কিন্তু নেত্রকর্ণাস্যরোগনুৎ॥"

নামভেদ—

হিন্দুস্থানে ও দাক্ষিণাত্যে—দারু হলদী, জারফে হলদী

কর্ণাটে—মরনরিসিন্ মহারাষ্ট্রে—দারুহল্লদ

তৈলঙ্গে—মনিপসুপ্ গুজরাটে—দারুহলদর

তামিলে—মরমজিল ফার্সীতে—দারচোর

আরবীতে—দারহলদ বলে।

ডাক্তারী নাম—Cascinium fenestratum.

মাত্রা এক আনা পর্য্যন্ত।

রসাঞ্জন

আমরা সচরাচর যাহাকে রসাঞ্জন বলি, তাহা অন্য কিছুই নহে, দারু-হরিদ্রার ক্বাথ ও দুগ্ধ সমভাগে একত্র পাক করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইলে যে ঘনীভূত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকেই রসাঞ্জন বলে। ইহার মাত্রা দুই আনা।

বৈদ্যশাস্ত্রে—রসাঞ্জনের অপর নাম তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তার্ক্ষ্যজ।

নামভেদে—

হিন্দুস্থানী—রসোৎ তৈলঙ্গী—রসাঞ্জনমু

গুজরাটী—রসবতী আরবী—হুজুজ

ডাক্তারী নাম—Extract of Indian Berbery

Latin নাম—Axtracum Berberis।

বৈদ্যশাস্ত্রে রসাঞ্জনের গুণ ও প্রস্তুতকরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"দার্ব্বীক্বাথসমং ক্ষীরং পানং ত্যক্ত্বা যদা ঘনম্।
তদা রসাঞ্জনাখ্যং তন্নেত্রয়োঃ পরমং হিতম্॥"

গুণ সম্বন্ধে আরও লিখিত আছে—

"উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষহৃৎ।"

যে দ্রব্যের এতগুলি গুণ আছে, তাহার যে মানব সমাজে আদর হইবে, তাহা আর বিচিত্রতা কি? এতদ্ভিন্ন পীত রং করিবার জন্য হরিদ্রা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবাসীমাত্রেই ব্যঞ্জনাদিতে হরিদ্রা ব্যবহার করে। ইহা এক্ষণে রন্ধনকার্য্যে নিত্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কতকাল যাবৎ যে ঐরূপ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বলা সুকঠিন। তবে হিন্দুরা বহুদিন যাবৎ দেবপূজায় হরিদ্রা ব্যবহার করিতেছেন। এমন কি, ইহার গাছও দেবপূজায় লাগে। যেমন ইতুপূজায় ও দুর্গোৎসবের সময় নবপত্রিকা রচনায় হলুদ গাছ দেওয়া হয়।

আর বিবাহাদি শুভকার্য্যের ত' কথাই নাই। বিবাহে গাত্রহরিদ্রা একটা বিশেষ সংস্কার। বর ও কন্যার গাত্র হরিদ্রা দ্বারা মার্জ্জনা করিতেই হইবে। তাহার উপর গাঁটছড়া প্রভৃতি শুভ সংস্কারে হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড চাই। অনেক স্থলে বর ও কন্যার বস্ত্রও হরিদ্রা দ্বারা রঞ্জিত করা হয়। এতদ্ভিন্ন এই মঙ্গলকর্ম্মে যে-সকল এয়োস্ত্রীলোক শুভকর্ম্ম সম্পাদনে যোগদান করেন, তাঁহারাও পরস্পর পরস্পরকে হরিদ্রারঞ্জিত করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। এইরূপ দশসংস্কারমধ্যে সকল সংস্কারেই হরিদ্রা ব্যবহৃত হয়।

কেহ কেহ বলেন, ইহার কারণ, স্ত্রীগণেরা জানেন যে, হরিদ্রা বর্ণ উজ্জ্বল করে এবং সকল প্রকার চর্ম্মরোগ দূর করে। ইহার বর্ণও নয়নতৃপ্তিকর।

আমাদের দেশের গাত্রহরিদ্রায় সময় কোন বিশেষ মন্ত্র পাঠ বা ছড়া গান করা হয় না, কিন্তু উড়িষ্যা প্রভৃতি অনেক প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা গাত্রহরিদ্রার সময় একটা সুললিত ছড়া পাঠ করে। তাহার অর্থ এই—

"হে হরিদ্রে, তোমার বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ও মনোমুগ্ধকর, তুমি তদ্রূপ আমাদের এই বর ও কন্যাকে উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট কর। তোমার আশীর্ব্বাদে যেন এই বরকন্যা সকল প্রকার চর্ম্মরোগ হইতে পরিত্রাণ পায়; এবং এই বিবাহ শুভকর কর।" ইত্যাদি।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা কোন প্রকার ছড়া গান করেন না বটে, কিন্তু বোধ হয়, তাঁহাদের মনোভাব এইরূপই হইবে এবং হুলুধ্বনি দ্বারা তাঁহারা মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

মনসার ভাসানে লক্ষীন্দ্রের বিবাহের সময় কবি লিখিয়াছেন,—

* * * *

কনক আসনে বসে সাধুর কুমার॥
পূর্ণঘট হাতে করি আর দধি ধান।
কৌতুকে নারীগণ করে মঙ্গল গান॥
তিল তৈল আমলকী হরিদ্রা পিটালী।
লিপিয়া লখাইর গায় কৌতুকে জল ঢালি॥

এখানেও "মঙ্গল গান" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সে গীত কি, তাহা আমরা জানি না। কেবলমাত্র একখানি পুস্তকে এই গানটি লিখিত আছে:—

"দুর্গাকে ডেকে আন গঙ্গাকে ডেকে আন
রাম স্নান করাই।
সুমিত্রাকে ডেকে আন সাবিত্রীকে ডেকে আন
রাম স্নান করাই।
যার পতি ভালবাসে সে যেন হরিদ্রা বাটে
নিৎকাম যেন করে সে।

* * * *

তৈল হরিদ্রা আন গঙ্গার জল আন
রাম স্নান করাই।
বরণ কুলা আন বাদ্যকার ডেকে আন
রাম স্নান করাই।"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই শুভকর্ম্মে যে-সে স্ত্রীলোক হলুদ বাটিলে চলিবে না।

"যার পতি ভালবাসে সে যেন হরিদ্রা বাটে।"

এই জন্যই বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় হরিদ্রার অন্যতম নাম "যোষিৎপ্রিয়া।"

আর উড়িষ্যা প্রদেশের ত' কথাই নাই। গাত্রে হরিদ্রা লেপন করা তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম। এমন কি, পরিধানবস্ত্রও হরিদ্রা রংয়ে রঞ্জিত করে। অনেকে বলেন, সমুদ্রের লোণা জলে নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হয়। হরিদ্রা গাত্রে লেপন করিলে কোন প্রকার চর্ম্মরোগ হয় না। সুতরাং চর্ম্মরোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই এত হরিদ্রা লেপনের ছড়াছড়ি।

আবার শুনা যায়, গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিলে কুম্ভীরাদি জলজন্তুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, কারণ, তাহারা হরিদ্রার ঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না।

আরও দেখা যায় যে, চর্ম্মকারগণ চামড়ার কাজ করিবার সময় প্রভূত পরিমাণে হরিদ্রা ব্যবহার করে; উদ্দেশ্য একই, চর্ম্মরোগ যাহাতে না হয়।

কৃষকেরা বলে, চারা রোপণের পূর্ব্বে হলুদমিশ্রিত জলের ছিটা দিলে চারা গাছে আর পোকা ধরে না।

হরিদ্রার চাষ

বিশেষ যত্নসহকারে হলুদ চাষ করিলে প্রতি বিঘায় খরচ-খরচা বাদে একশত টাকারও অধিক লাভ হইয়া থাকে। তবে হলুদ চাষ অপেক্ষা হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া উহার পাট করায় বিশেষ দক্ষতা চাই। এই দক্ষতার উপরই দামের তারতম্য নির্ভর করে এবং তৎসঙ্গে লাভালাভ হইয়া থাকে।

ক্ষেত্র—দো-আঁশ মাটিই হলুদের পক্ষে ভাল; কিন্তু বেলেমাটির ভাগ বেশী হইলে আরও ভাল হয়। তবে একেবারে বেলে মাটি বা এঁটেল মাটিতে হলুদ ভাল জন্মে না।

যে-সকল জমি অনেক দিন যাবৎ পতিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, সেই সব জমিতে হলুদের চাষ করিলে হলুদ উৎকৃষ্ট জন্মিয়া থাকে। কিন্তু যে-সকল জমি, বর্ষার জলে ডুবিয়া যায় অথবা যে স্থানে বৃষ্টির জল বাঁধিয়া থাকে, সে জমিতে হলুদ আদৌ জন্মায় না। এই জন্যই কৃষকেরা একটু উচ্চ জমিতে হলুদের চাষ করিয়া থাকে। বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন বর্ষার জল জমিয়া উহার শিকড়গুলি পচিয়া না যায়।

সার—অধিক দিনের পতিত জমিতে সারের বিশেষ আবশ্যকতা হয় না। অন্যান্য ক্ষেত্রে পচা পাতা, ওলামাটি ও পচা খড় প্রভৃতি হরিদ্রা-ক্ষেত্রের পক্ষে অতি উত্তম সার। কিন্তু কোনমতে গোবর-সার দিবে না, কারণ, গোবর-সারে পোকা ধরে; ঐ পোকা লাগিয়া সব হলুদের শিকড় একেবারে নষ্ট করিয়া দেয় এবং হলুদ জন্মিলেও পোকা লাগিয়া সব নষ্ট করে। সেই জন্য হলুদ-ক্ষেত্রে গোবর-সার দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।

সময়—বৈশাখের মাঝামাঝি সময়েই হলুদ রোপণ করিয়া থাকে, তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্দ্ধেক দিন পর্য্যন্ত বীজ রোপণ করা যাইতে পারে, তাহার পর রোপণ করিলে হলুদ ভাল জন্মে না। কারণ, জ্যৈষ্ঠের তেজে

গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তবে বৃষ্টি পাইলে রোপণ-কর্ম্ম আরম্ভ করা যাইতে পারে। সেই জন্য রোপণ করিবার পূর্ব্বে বৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

বীজ—হলুদের মোথা ও মুখী দুই হইতেই বীজ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু মোথা হইতে যে বীজ হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট। সেই জন্য লোকে হলুদের মোথাকেই বীজরূপে ব্যবহার করে। মুখীর বীজে হলুদ ভাল জন্মায় না এবং পরিমাণেও কম হয়। আবার মুখী হইতে বীজ করিতে গেলে বড় মুখীই ব্যবহার করা ভাল। উহার গাত্রে যে-সকল ছোট ছোট মুখী থাকে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়।

চাষ—কোন কোন স্থানে হলুদ চাষের জন্য লাঙ্গল দিয়া জমি খনন করে, কিন্তু তাহাতে হলুদ ভাল জন্মে না। কেবল কোদাল দিয়া জমি কর্ষণ করিলেই যথেষ্ট।

সেই জন্য কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে কোদাল দ্বারা জমি একবার কোপাইয়া লইবে। তাহার পর চৈত্র মাসে দো-কোপা করিয়া লইবে। তাহার পর ২ বা ৩ বার মই দিয়া জমি সমান করিয়া লইবে। তবে ঢেলা ভাঙ্গিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, ঢেলা থাকিলে জমিতে ফাঁপ থাকে, ঐ ফাঁপের জন্য হলুদ গাছের শিকড় বৃদ্ধি পাইয়া হলুদ ভালই জন্মায়।

রোপণ—জমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ৫ বা ৬ অঙ্গুলি গভীর করিয়া একহাত অন্তর সোজাসুজি জুলি কাটিয়া লইবে। তাহার পর উহাতে ১৫।১৬ অঙ্গুলি অন্তর এক একটি বীজ বসাইয়া যাইবে। প্রত্যেক বীজের উপর ৩।৪ অঙ্গুলি পরিমিত আল্গা মাটি দিয়া চাপা দিবে।

হলুদ-ক্ষেত্র যত শুষ্ক থাকে, ততই ভাল। এই জন্য যাহাতে জল বসিতে না পায়, তাহার উপায় করিতে হয়। এই জন্য দৈর্ঘে ও প্রস্থে একটি

নালা কাটিয়া রাখিবে ; ঐ নালা দিয়া জল যেন সব বাহির হইয়া যায়। কোথাও কোথাও বা চতুষ্কোণ নির্ম্মাণ করিয়া এক একটি নালা দ্বারা জমি বিভক্ত করিয়া দিয়া থাকে, তাহাতে সুবিধা বই অসুবিধা হয় না।

কোন কোন স্থানে আধ হাত বা একহাত অন্তর বীজ বপন করে। কারণ, গাছগুলি যাহাতে বেশী ঘন না হয়, সে দিকে বিশেষ নজর রাখিতে হয়। আবার হলুদ তুলিবার সময় কোদালের কোপ লাগিয়া হলুদ নষ্ট না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। তজ্জন্য একহাত বা আধ হাত অন্তর বীজ বপন করিলে নষ্ট হইবার তত সম্ভাবনা থাকে না।

গাছগুলি একটু বড় হইলেই দাঁড়া করিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা গাছের গোড়ায় জল বসিবে, তাহাতে গাছ নষ্ট হইয়া যায়।

বীজ হইতে চারা বাহির হইলে একমাসের মধ্যে একবার নিড়াইয়া দিবে। আবার ২০।২৫ দিন পরে আর একবার নিড়াইয়া দিবে।

গাছগুলি বড় হইলে তাহার চারিদিকে যাহাতে ঘাস না জন্মায়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, যাহাতে গবাদি পশুসকল গাছ নষ্ট না করিতে পারে, তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই ক্ষেত্রের চারিদিকে বেড়া দিতে হয়, তাহার পর বীজ রোপণ করা উচিত।

পৌষ মাসের শেষে বা মাঘ মাসের প্রথমেই গাছগুলি আস্তে আস্তে স্থানান্তরিত করা উচিত। কিম্বা সাবধানে পোড়াইয়া ফেলিলেও চলে।

তাহার পর আস্তে আস্তে কোদালী দিয়া হলুদ-গেঁড়গুলি তুলিয়া লইবে। মোথা ও মুখীগুলি সঙ্গে সঙ্গেই পৃথক্ করিয়া লওয়া উচিত। মোথাগুলি বীজের জন্য ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া পরিষ্কার করিয়া বড় বড় বৃক্ষের ছায়ায় গাদা করিয়া খড় দিয়া চাপা দিয়া রাখিবে, নচেৎ বীজ নষ্ট হইয়া যাইবে।

হলুদ প্রস্তুতকরণ :—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হলুদ সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, কিন্তু এইখানেই যত সাবধানতা। প্রথম প্রথম দুই একবার বোধ হয় তত ভাল হইবে না। কিন্তু ২।৩ বার এইরূপ প্রস্তুত করিবার পর এমন দক্ষতা আপনি জন্মিবে যে, আর নষ্ট হইবে না। "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ"। এটুকুই ইহার তাক্‌বাক্।

হলুদ সিদ্ধ করিবার জন্য যেখানে উনান বা চুল্লি প্রস্তুত করিবে, তাহার নিকটেই একটি বা দুইটি নাদা (পেটমোটা জালা) বসাইয়া তাহার উপর তেকেটে বা তেকাটা বসাইয়া রাখিবে। ঐ তেকাটার উপর এক একটি ঝুড়ি বসাইয়া রাখিয়া তারপর উনানের উপর মাটির মাঝারি রকমের তোলো বা হাঁড়ি বসাইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। হাঁড়া বা তোলো উনানে বসাইবার পূর্ব্বে উহাতে কিয়ৎপরিমাণে হলুদ রাখিয়া, যাহাতে তিন ভাগের অধিক না হয়, সে দিকের নজর রাখিবে। তৎপরে উহাতে গোবরমিশ্রিত জল ঢালিয়া দিবে। এরূপ পরিমাণে জল দিবে, যেন হলুদের উপর হইতে তিন অঙ্গুলি নীচে জল থাকে। কারণ, তাহার অধিক জল দিলে হলুদের রং জ্বলিয়া যাইবে।

উক্ত হাঁড়ি উনানে বসাইয়া ধীরে ধীরে জ্বাল দিতে থাক। জ্বাল দিতে দিতে যেমনি জল উৎলাইয়া উঠিবে, অমনি হাঁড়িশুদ্ধ সিদ্ধ হলুদগুলি পূর্ব্বোক্ত ঝুড়ির উপর ঢালিয়া দিবে। প্রায়ই জল একবার উৎলাইয়া উঠিলে সমস্ত হলুদ সিদ্ধ হয় না। সেই জন্য একটু নজর রাখিতে হইবে যে, জলের ভাপ সমস্ত হলুদে লাগিয়াছে কি না। সেই জন্য জল একবার উৎলাইয়া উঠিলে যদি সমস্ত হলুদে ভাপ না লাগে, তবে আর একবার উৎলাইয়া উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিবে। কিন্তু খুব সাবধান, যেন দুইবারের অধিকবার না উৎলায়।

আবার যাহাতে হলুদ অধিক সিদ্ধ না হয়, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবে এবং উনানের উপর হইতে ঝুড়িতে ঢালিতে যেন বিলম্ব না হয়। যেমনই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, অমনি ঢালিয়া ফেলিবে।

ঝুড়ি হইতে যখন জল সমুদয় ঝরিয়া যাইবে, অমনি একখানি চেটাইয়ের উপর গাদা করিয়া ঢালিয়া দিবে। খুব সাবধানে, কারণ, ঢালিবার সময় যাহাতে হলুদগুলি একেবারে থেঁতো না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

তাহার পর ঐ চেটাইয়ের উপর হলুদ রাখিয়া ছালা দিয়া রাখিবে।

পরদিন ঐ হলুদ ঘাসের উপর ৩।৪ অঙ্গুলি পুরু করিয়া বিছাইয়া দিয়া শুকাইতে দিবে। মাঝে মাঝে অর্থাৎ ৩।৪ দিন অন্তর হলুদগুলি উল্টাইয়া পল্টাইয়া দিবে—যাহাতে সমস্ত হলুদগুলি শুষ্ক হইতে পারে।

এইরূপে যখন রস শুকাইয়া আসিবে, তখন হলুদগুলিকে ডলাই-মলাই করিতে হইবে। খুব সাবধানে, অধিক চাপ লাগিলে হলুদগুলি চেপ্টাইয়া যাইবে। নিতান্ত পক্ষে ভাল গোলাকার হইবে না।

একদিনে অধিক ডলাই-মলাই করিবে না। ৩।৪ দিন পরে পরে ডলাই মলাই করিবে। যখন দেখিবে, হলুদগুলি গোলাকার ধারণ করিয়াছে এবং হলুদগুলি বেশ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইয়াছে, তখন স্থানান্তরিত করিবে

তাহার পর উহা কুলোয় করিয়া ঝাড়িয়া লইবে। তাহার পর বস্তাবন্দী করিয়া রাখিয়া দিবে। বস্তাবন্দি করিবার পূর্ব্বে নজর রাখিতে হইবে, যেন অশুষ্ক অবস্থায় না বস্তাবন্দি করা হয়। কারণ, অশুষ্ক হলুদ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায় ; পোকাও ধরে।

মাঘ মাসের মধ্যেই সিদ্ধাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া ফাল্গুনের প্রারম্ভেই বস্তাবন্দি করিতে হইবে।

প্রতি বিঘায় ২০।২১ মণ শুষ্ক হলুদ পাওয়া যায়। আজকাল বাজারে উৎকৃষ্ট হলুদের দাম ১৪৲ টাকা মণ, মাঝারি রকমের হলুদের দাম ১৩৲ টাকা এবং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও অন্ততঃ ১২৲ টাকা মণ।

সুতরাং ২০×১২৲—২৪০ টাকা মূল্য বিক্রীত হইবে, খরচ-খরচা বাবদ ১২০৲ হইতে ১৩০৲ টাকা ব্যয় ; সুতরাং প্রতি বিঘায় ১০০৲ টাকারও অধিক লাভ হয়।

হলুদ তুলিয়া লইবার পর উক্ত জমিতে উত্তমরূপে সার দিয়া তবে অন্য ফসলের ব্যবস্থা করা উচিত—নচেৎ কোন ফসলই ভাল জন্মে না। কারণ, হলুদের চাষে জমির উর্ব্বরতা এত কমিয়া যায় যে, একই জমিতে দুইবারের অধিক হলুদ ভাল জন্মে না। সেই জন্য হলুদ-চাষের জন্য মাঝে মাঝে ক্ষেত্র বদলাইতে হয়।

তবে একবার হলুদ জন্মাইবার পর অন্যান্য ফসলের চাষ দিয়া আবার হলুদের চাষ করা করা যায় ; কিন্তু হলুদ-চাষের পূর্ব্বে উত্তমরূপে সার দিতে হয়।

টোট্‌কা

সুদক্ষ কবিরাজগণ বলেন—হরিদ্রা নানা কঠিন ব্যাধির অমোঘ ঔষধ।

চক্রদত্তমতে—গুড় সংযুক্ত করিয়া হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্লীপদ (গোদ) আরোগ্য হয়।

সুশ্রুতমতে—একমাসকাল উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করিলে কুষ্ঠব্যাধি আরগ্য হয়।

চরকমতে—হরিদ্রা পেষণপূর্ব্বক মধু বা আমলকীরসের সহিত পান করিলে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়।

কাঁচা হলুদ

কাঁচা হলুদ এক তোলা মিছরির সরবত সহ পান করিলে মেহ ও প্রমেহ-জ্বালা দূর হয় এবং পুরাতন মেহরোগে কাঁচাহলুদের গুঁড়া ও আমলকী-চূর্ণ এক সপ্তাহকাল খাইলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

বিস্ফোটকে—হলুদের সহিত গাওয়া ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটকের জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারণ হয় এবং হয় বসিয়া যায়, না হয় শীঘ্র পাকিয়া গিয়া সত্বর রোগ আরোগ্য হয়।

চোখ উঠায়—একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া হলুদ-জলে ডুবাইয়া মাঝে মাঝে চোখে দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয় এবং চোখ-উঠা আরোগ্য হয়।

হিক্কায়—শুক্‌না হলুদ নূতন কলিকায় সাজিয়া হাতে ধরিয়া টান মারিলে হিক্কা বন্ধ হয়।

রোগীর বিছানায় পিপীলিকা—রোগীর বিছানার চারিদিকে হলুদ-গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে পিপীলিকা পলাইয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন—জমি হইতে এক বৎসরের মধ্যে হলুদ না উপ্‌ড়াইয়া প্রায় দুই বৎসর রাখিয়া দিলে যে হলুদ জন্মে, তাহার রং গাঢ় হয় এবং ঔষধের জন্য ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

ইহার গেঁড়ো প্রায়ই বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আমরা হলুদ বাটিয়া লইয়া জলে গুলিয়া ব্যঞ্জনে ব্যবহার করি, কিন্তু মাড়োয়ারীগণ হলুদকে আগে গুঁড়া করিয়া রাখে—এবং ঐ গুঁড়া ব্যঞ্জনে ব্যবহার করে। কিন্তু ঐরূপ গুঁড়া অধিক দিন ভাল থাকে না, এবং ব্যঞ্জনের তেমন সুস্বাদও হয় না।

যাহা হউক, বাজারে আজকাল গুঁড়া হলুদের কাট্‌তি বড় কম নহে। বিশেষতঃ কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে গুঁড়া হলুদ বিক্রয় হয়।

Imperial Gazetteer Vol. III, P. 183 ইম্পিরিয়ল গেজেটিয়রে

প্রকাশ যে, ভারতে প্রায় ৪০০,০০০ বিঘা জমির উপর হরিদ্রার চাষ হয়, কিন্তু আজকাল ফরমোজা দ্বীপেই উৎকৃষ্ট হরিদ্রা উৎপন্ন হয়। সত্য বটে, এক সময়ে কেবল ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশেই উৎকৃষ্ট হরিদ্রা উৎপন্ন হইত, কিন্তু দিন দিন ভারতের হরিদ্রা নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে ৫০৲ টাকা মণে হরিদ্রা বিক্রীত হয়।

বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতেও প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রা য়ুরোপে রপ্তানী হইতেছে এবং ক্রমেই বঙ্গদেশ পশ্চাতে পড়িতেছে। য়ুরোপে যত পরিমাণে রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে অধিক পরিমাণে একা জার্ম্মাণগণই ক্রয় করে, তাহার পরই ফরাসীগণ, কিন্তু রুসিয়াতেও বড় কম রপ্তানী হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডে অতি অল্প পরিমাণেই রপ্তানী হয়।

ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশে কত পরিমাণ জমিতে হলুদ উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায় না। তবে কিছুদিন পূর্ব্বে Imperial Gazetteer নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভারতে এক লক্ষ একর ভূমিতে হলুদের চাষ হয়।*

কিন্তু কটন সাহেব বলেন, উক্ত তালিকা ঠিক নহে। ইহার দ্বিগুণ ভূমিতে এক্ষণে হলুদের চাষ হইতেছে।†

আবার কোন কোন সাহেবের মতে—

বঙ্গদেশে—১ লক্ষ বিঘা, মাদ্রাজে—৫০ হাজার বিঘা, বোম্বাইয়ে—২০ হাজার বিঘা, বেহারে—৮ হাজার বিঘা, পাঞ্জাবে—১০ হাজার বিঘা জমিতে হলুদ উৎপন্ন হয়।

ইহা যদি সত্য হয়, তবে দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা

---

* Imperial Gazetteer Indian Empire, Vol III P. 183.

† Handbook of Commercial Information of India by C. W. E, Cotton, I. C. S. Collector of Customs, Calcutta, P. 256.

অধিক পরিমিত ভূমিতে হলুদ উৎপন্ন হয়। তাহার অর্দ্ধেক মাদ্রাজ প্রদেশে এবং সিকি অপেক্ষাও কম বোম্বাই প্রদেশে হলুদ উৎপন্ন হয়। আর পাঞ্জাব বা বেহারের ত কথাই নাই।

কিন্তু কোন্ প্রদেশ হইতে কত পরিমাণ হলুদ বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা হইতে এক্ষণে বুঝা যায় যে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ হইতে এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণেই হলুদ রপ্তানী হইয়া থাকে।

উক্ত কটন সাহেব বলেন—

১৯১৩—১৪	বোম্বাই	হইতে	৪৯,৭১৯	হন্দর
	মাদ্রাজ	"	২০৮৩০	"
	কলিকাতা	"	১৫,৮৫৪	"
	রেঙ্গুন	"	২,৭৪৯	"
	কোচিন	"	৭,০০৩	"
	টিউটোকোরিন	"	৯,০৮৯	"

মোট ১১৫,০২৭ হন্দর (১ হন্দর = ৫৫ সের)।

হলুদ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। তাহার পর ফরাসী-জর্ম্মাণের যুদ্ধ বাধিল, তৎসঙ্গে হলুদের রপ্তানী কমিয়া গেল। তাই দেখা যায়—

১৯১৪—১৫	খৃষ্টাব্দে মাত্র	৬৪,০০০	হন্দর
১৯১৫—১৬	"	৬৭,০০০	"
১৯১৭—১৮	"	৭৭,০০০	"
১৯১৮—১৯	"	৭৯,০০০	"
১৯১৯—২০	"	৬৬,৯৮৭	"
১৯২০—২১	"	৫৫,৭৬৫	"
১৯২১—২২	"	৪৮,১৮৭	"
১৯২২—২৩	"	৪২,১৩০	"
১৯২৩—২৪	"	৫৯,০৮৩	"

তবে ১৯২৩—২৪ খৃষ্টাব্দের তালিকা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, আবার শনৈঃ শনৈঃ হলুদের রপ্তানী বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তাহা সত্য নয়, কারণ, এক্ষণে বিলাতে ফরমোজাজাত হরিদ্রারই আদর অধিক। বিলাতের লোকেরা উৎকৃষ্ট হলুদকে কোচিন-দেশজাত বলিয়া বিশ্বাস করিত। আর ভারতে যে সকল হলুদ উৎপন্ন হয় তাহা নিকৃষ্ট। কিন্তু ক্রমে তাহাদের সে ধারণা দূরীভূত হইয়া ভারতের হলুদেরও আদর বাড়িতেছে।

ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশ হইতে কত টাকা মূল্যের কত পরিমাণ হরিদ্রা বিগত পাঁচ বৎসরে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার তালিকা

		১৯১৯-২০	১৯২০-২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	
বঙ্গদেশ	ওজন	৩৯৮২	২৯৯২	৪৪৯০	৪৯০২	৫৫৫৭	হন্দর
	মূল্য	৭০,৮২০৲	৪৪,৮৩০৲	৭১,৫২২৲	১,১৪,২৬০৲	১,০৯,০৯৯৲	
বোম্বাই	ওজন	৫২,০৪৭	২১৮৩০	১৭০৯৪	১৬৬৫৫	২৫১৩৯	হন্দর
	মূল্য	৬,৮[illegible],৫৫০৲	৫,৪৭,৩৩২৲	৪,৭৬,৬৮৪৲	৪,৯৩,৬১২৲	৮,৫৩,৩৭৯৲	
মাদ্রাজ	ওজন	২৯৭৯২	২৯৫১২	২২৬৯৫	১৫০৩৩	২২০৭৬	হন্দর
	মূল্য	৪,৭৪,২৭০৲	৩,৬৩;৮৭০৲	৩,১৫,৬৯০৲	২,৮৪,২১২৲	৫,৯৩,৪৬২৲	
সিন্ধুপ্রদেশ	ওজন	৬৯৭	২৯৬	১০৫	১৩৯	১২৩	হন্দর
	মূল্য	১৩,৮৩০৲	৭,০৬০৲	২২১২৲	৩৩৬৭৲	৪৮৮০৲	টাকা
ব্রহ্মদেশ	ওজন	৪২৯	১১৬৫	৩৮০৩	১৪০১	১৮৮	হন্দর
	মূল্য	৬০৮০৲	১৩,৭২০৲	৪,৫,০৮৯৲	২৮,৬৮৩৲	৩৫২৯৲	টাকা
মোট	ওজন	৬৬৯৮৭	৫৫৭৬৫	৪৮১৮৭	৪২১৩০	৫৯০৮৩	হন্দর
মোট		১২৫০৫৫০৲	৯৭৬৭১০৲	৯১১১৪৭৲	৯৮৪১৮৪৲	১৫,৬৪,৩৪৯৲	

পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, বঙ্গদেশ অপেক্ষা বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে হরিদ্রা বহুল পরিমাণে বৎসর বৎসর রপ্তানী হইতেছে এবং মাজাদ্রের হরিদ্রার মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ভারত হইতে কোন্ কোন্ দেশে কি পরিমিত হরিদ্রা রপ্তানী হয়, তাহার তালিকা।

		১৯১৯-২০	১৯২০-২১	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	
বৃটিশ সাম্রাজ্য	ওজন	৪৯৯৭৪	৩৭১৯৪	৪১৪৮০	৩২৩০৯	৩২১৯৬	হন্দর
	মূল্য	৯,২৯১,৬০৲	৬,৪৪,৫০০৲	৭,৭৫,২১৪৲	৭,৯২,১৫৪৲	১০,৯৬,৪৬৯৲	
ফ্রান্স	ওজন	১৩৮৯	৪৫৪৯	৩০০	১৬৫০	৪১৫৪	হন্দর
	মূল্য	২৭,৮৪০৲	৫২,০১০৲	২৪০২৲	১৫,০৮৯৲	৯০,৩৫৪৲	
জার্ম্মাণী	ওজন	…	…	…	৬২	১০০	হন্দর
	মূল্য	…	…	…	৩৭৫৲	১৬০০৲	
অষ্ট্রীয়া	ওজন	৭৮৫	২৮৩	৮৫৮	১০৪১	৮৬৬	হন্দর
	মূল্য	১৩,৬৯০৲	৮০৫০৲	৩৫৩৮২৲	২৬২৩৯৲	৩৩৮৯২৲	
পারস্য	ওজন	১২৫২	১৮৬৪	৬৩৬	১৪৫৮	৪৬৩৭	হন্দর
	মূল্য	৫০৮৯০৲	৩৪৩২০৲	১২৮৯৫৲	৩৩৫৯৫৲	১৫০৩৪৪৲	
ইজিপ্ট	ওজন	২৪২	৩২৫	১৮২	২৪৭	২৭৮	হন্দর
	মূল্য	৫৬৪০৲	৮৮৩০	৪১২৯৲	৮১৯৬৲	৯৯৫৯৲	
এডেন	ওজন	১০৫৩	৩৭৩৫	৩৭০৬	৩৯৭৪	১৯৪৫	হন্দর
	মূল্য	২৩৭২০৲	১০৫৫১০৲	১০৬১২৫৲	৭২০১৪৫৲	৬৪৮৪৯৲	
মেসোপটেমিয়া	ওজন	…		১৩০৫	১৮৪৯	৩৭০৫	হন্দর
	মূল্য	…		২৭৯৯৫৲	৪২৬৬৯৲	১২০৯৪৫৲	
লঙ্কাদ্বীপে	ওজন	৯০৬০	৭৬৬৪	৯৪০০	৭৮৫১	৭৭৭৯	হন্দর
	মূল্য	১৪১৪০৲	৮৩৯১০৲	১৪০৩৬৫৲	১৬৯৬৫১৲	২৮০৬৪৯৲	

বঙ্গদেশে এক্ষণে ধনপতি, শ্রীমন্ত বা চাঁদসদাগর নাই, কাজেই লক্ষ লক্ষ টাকার হরিদ্রা লঙ্কা-দ্বীপবাসীরা মাদ্রাজ হইতে ক্রয় করিতেছে।

মরীচদ্বীপে	১৯৫৭	১৫০৬	২৬৮৩	১৭১৯	২৩২২	হন্দর
টাকা	৪৫৬৭০৲	৩৬৯৫০৲	৭২৬৪০৲	৬১৫৯৭৲	১০৭৫২৪৲	

অবশিষ্ট পরিমিত হরিদ্রা অষ্ট্রীয়া ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়।

কলিকাতা বন্দর হইতে প্রতি বস্তায় ১।২ হন্দর পরিমিত

বোম্বাই	১১।২ বা ১৩।৪ হন্দর
মাদ্রাজ	১১।২ হন্দর
কোচিন	১১।৪ হন্দর

পরিমিত হরিদ্রা থাকে। এক কলিকাতা বাজারে মণ দরে বিক্রীত হয় কিন্তু মাদ্রাজে ২৫০ সের ওজন পরিমিত বস্তার দরে এবং বোম্বাই বাজারে ২১ মণী বস্তা দরে বিক্রীত হয়।

হলুদ চাষের খরচ কত পরিমাণে লাগে, তৎসম্বন্ধে কটন সাহেব বলেন—হুগলী জেলায় প্রতি বিঘায় ৬।৷৹ হিসাবে খরচ পড়ে।

রাজসাহী জেলায় প্রতি বিঘায় ৭৷৹				
মুঙ্গেরে	"	"	"	১০৲
ভাগলপুরে	"	"	"	১৫৲

অর্থাৎ হুগলী জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে হরিদ্রা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু বিলাতের লোকেরা মাদ্রাজী, গোপালপুরী ও মচ্‌লিপট্টনী হলুদ অধিক মূল্যে আজকাল ক্রয় করিতেছে।

আর কলিকাতা বন্দর হইতে যে-সকল হরিদ্রা রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে পাবনা হলুদের দাম অধিক।

আজকাল পাবনা হলুদের দাম কলিকাতায় ১৪৲ টাকা মণ। আর অন্যান্য হরিদ্রার মূল্য ১৩৲ টাকা মণের অধিক নহে।

Colonel Heber Drury সাহেবের মতে—

হরিদ্রায় প্রায় শতাংশের একভাগ তৈল আছে—উহার রং হলদে, ইহার formula $C_{10}H_{10}O_3$ কিংবা $C_{16}H_{16}O_4$; ইহা ১৭২০ ডিগ্রী উত্তাপে গলিত হয়। ইহা গলিয়া যাইলে উহা হইতে একপ্রকার লবণ ও কিঞ্চিৎ ক্ষার নির্গত হয়।

ইহার সহিত Boric বা Sulphuric Acid মিশাইলে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে Rosocyanine বলে। উহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

হলুদ হইতে নানাবিধ রং প্রস্তুত করিবার প্রণালী—

(১) হলুদের সহিত সাজিমাটী (Carbonate of Soda) ও কিঞ্চিৎ লেবুর রস মিশাইলে পাকা বাসন্তী রঙ প্রস্তুত হয়।

(২) হলুদ, হরীতকী ও নীলবড়ী একত্রে মিশাইলে সবুজ রঙ হয়।

(৩) কোন বস্ত্র হলুদে রঙ করিতে হইলে প্রথমে বস্ত্রখানিকে নীল রংয়ে ডুবাইয়া পরে হলুদের রংয়ে বস্ত্র ডুবাইতে হয়।

(৪) হলুদের জলে তেঁতুল মিশাইয়াও বাসন্তী রঙ করা যায়।

(৫) হলুদের বর্ণ উজ্জ্বল করিবার জন্য কুসুমফুল, চূণ, আর আলতা সিংগ্রহার মিশাইয়া থাকে।

(৬) ছিট ছাপিবার জন্য ছাপকরেরা।

হরিদ্রা /২॥০ সের, দাড়িম্বের ছাল /১ সের, ফটকিরি ॥৴০ ছটাক ৪ গ্যালন জলে একত্র পচাইয়া উপরের কতকটা জল ছাঁচিয়া ফেলিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ চিনি ও একপোয়া নীল দেয়। পরে উহাকে উত্তমরূপে চটকাইয়া, উহাতে কিছু পরিমাণ গঁদ, ঘৃত ও ময়দা দিয়া গাঢ় করিয়া লয়। এইরূপে যে রঙ প্রস্তুত হয়, তাহার বর্ণ হরিতাভপীত, কিন্তু তেমন স্থায়ী হয় না।

(৭) হলুদ হইতে যে রঙ নির্গত হয়, তাহাকে ইংরেজীতে Circumin বলে। উহাতে ক্ষার মিশাইলে লাল বর্ণ হয় এবং উহাতে রঙ বেশ উজ্জ্বল হয়।

(৮) হলুদের সহিত টিন মিশ্রিত করিলে কমলা লেবুর রঙ হয়।

(৯) রেশম ও পশম রঙ্ করিবার জন্য হলুদের রঙে Potassium Bichromate ও Ferros Sulphate মিশাইয়া Olive বা ব্রাউন রঙ্ প্রস্তুত করে।

(১০) হলুদের রঙে Boracic Hydrochloric মিশাইয়া লাল রঙ হয়।

(১১) এবং Ammonia সংযোগে নীল বর্ণ হয়।

(১২) উহাতে সুরামিশ্রিত ক্বাথ ও Boracic Acid মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে কমলা লেবুর রঙ হয়।

(১৩) এবং ক্ষার যোগে হরিতাভ ধূসর বর্ণ হয়।

এইরূপে নানা পদার্থ মিশাইয়া বিলাতে নানাপ্রকার রঙ্ প্রস্তুত করিয়া থাকে; সেই জন্যই বিলাতে হলুদের রপ্তানী এবং যত নূতন নূতন রঙ্ প্রস্তুত হইতেছে, ততই হলুদের রপ্তানী বাড়িতেছে।

হলুদ সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি টোটকার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু আজকাল বৈদ্যকেরা বলেন যে, হলুদের গুণ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী এবং তাহাকে বৈদ্যকেরা মুষ্টিযোগ বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহাদের মতে রোগের প্রথমে মুষ্টিযোগ, তার পর পাচন, তাহার পরে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়।

আর যে ঔষধ মুষ্টিমধ্যে লুক্কায়িতভাবে আনিয়া প্রয়োগ করা যায়, তাহাকেই চিকিৎসকগণ মুষ্টিযোগ বলেন।

"উদ্ধৃত্য মুষ্টিনাচ্ছাদ্য সুগুপ্তং যন্নিধারয়েৎ।
তং মুষ্টিযোগমিত্যাহুর্বিবুধা ভিষগীশ্বরাঃ॥"

তাই আমরা গুটিকতক মুষ্টিযোগের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হলুদ সম্বন্ধে কতকগুলি মুষ্টিযোগ

১। যকৃৎ-প্লীহাসংযুক্ত জ্বরে—ঘৃতকুমারীর রসের সহিত ছয় রতি পরিমিত হরিদ্রাচূর্ণ সেবনে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

আকন্দপাতা, হলুদ ও চিতামূল এই কয় দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশাইয়া চারি আনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে যকৃৎ-প্লীহা দূর হয়।

২। শ্বাসরোগে হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপুল, শঠী সমান অংশ লইয়া চূর্ণ করিবে ; পরে মিশ্রিত করিয়া চারিমাষা মাত্রায় কিঞ্চিৎ তৈলসহ লেহনে প্রবল শ্বাসরোগ আরোগ্য হয়। ইহারই নাম হরিদ্রাখণ্ড।

৩। স্বরভেদ রোগে—হরিদ্রা, বনযমানী, আমলকী, যবক্ষার ও চিতা সমভাবে লইয়া চূর্ণ করিবে ; পরে ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয়।

৪। বাতরক্ত রোগে—হরিদ্রা, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, শুঁঠ, কটকী, আমলকী, মুথা এবং পিপুল প্রত্যেকটি আধ তোলা, এক সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবে, পরে আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল করিয়া, এক তোলা মধু প্রক্ষেপ করিয়া সেবন করিলে কফজন্য বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

৫। আমরক্ত রোগে—হলুদপাতার রস ও বাথানিচূর্ণের সমভাগে মিশ্রিত করিয়া একবার বা দুইবার মাত্র সেবনে এক আমরক্ত আরোগ্য হয়। এমন কি, যাহার দিবারাত্রে একশতবারেরও অধিক দাস্ত হইতেছে, তাহারও পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

হরিদ্রার গুঁড়া ও কলিচূর্ণ প্রত্যেকে এক আনা ওজনে মিশ্রিত করিয়া লইলেও বিশেষ উপকার হয়।

খনার বচন—

"বৈশাখে জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রোও।
দাবা পাশা খেলা ফেলিয়ে থোও॥
আষাঢ়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি।
ভাদ্দরে নিড়ায়ে করহ খাঁটি॥
অন্য নিয়মে পুঁতলে হল্‌দি।
পৃথিবী বলে তাতে কি ফল দি॥"

অর্থাৎ হলুদ চাষের সময় দাবা, পাশা সব ফেলিয়া রাখিয়া প্রথমে হলুদ রোও, তাহার পর নিড়ান দাও; সুতরাং বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত দাবা-পাশা খেলিয়া সময় নষ্ট করিতে পারি না। ইহার চাষের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইবে, নচেৎ তেমন দ্রব্য উৎপন্ন হইবে না।

এই জন্যই বোধ হয় আমাদের দেশে ক্রমেই হলুদের চাষ ও উৎকর্ষ হ্রাস পাইতেছে।

অগুরু

আমাদের মধ্যে অনেকেই অগুরুকে চন্দন বলিয়া জানেন; কিন্তু বাস্তবিক অগুরু চন্দন নহে। চন্দনবৃক্ষ জন্মে মহীশূর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যে —আর অগুরু জন্মে শ্রীহট্ট ও আসাম প্রদেশে।

উভয়েই সুগন্ধযুক্ত কাষ্ঠ বটে ; কিন্তু অগুরুবৃক্ষ চন্দনবৃক্ষ অপেক্ষা অধিক উচ্চ হয়।

আমরা কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে পাঠ করিতে পাই, ধনপতি সদাগর চন্দন-কাষ্ঠ আনয়নের জন্য রাজার আদেশে সিংহলযাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সিংহল দ্বীপে চন্দনবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে কালিদাস-প্রণীত রঘুবংশ পাঠ করিলে দেখিতে পাই, রঘু যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন—

"কম্পে চ তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্গানজলতাং প্রাপ্তৈঃ সহকালাগুরুদ্রুমৈঃ॥"

কিন্তু হায়, এক্ষণে শ্রীহট্ট প্রদেশে ও আসাম অঞ্চলে এই কালাগুরু দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, মহীশূরের রাজা যেমন চন্দন বৃক্ষ রোপণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য বহু যত্ন রাখিতেছেন, যেমনি সিংহলবাসিগণ চন্দনবৃক্ষ ও শ্রীহট্টবাসিগণ অগুরুবৃক্ষ ছেদন ও উন্মূলন দ্বারা উভয় বৃক্ষের উচ্ছেদসাধন করিয়া আসিতেছে।

চন্দনবৃক্ষের সমুদয় অংশ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অগুরুবৃক্ষের কেবল সারভাগ নির্য্যাসমাত্র ব্যবহৃত হয়। আবার সকল বৃক্ষ সমান নহে। কোনটি কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি ধূসরবর্ণ, কোনটি কটা নির্য্যাসবিশিষ্ট।

আয়ুর্ব্বেদমতে অগুরু নানা প্রকার, তন্মধ্যে রাজনিঘণ্টুকার মাত্র চারি প্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন—১। কৃষ্ণাগুরু, ২। কাষ্ঠাগুরু, ৩। দাহাগুরু ও ৪। মঙ্গল্যাগুরু।

নিঘণ্টুকারমতে মঙ্গল্যাগুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু অন্য তিন প্রকার হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়, তিনি তাহা দেখান নাই। ভাবপ্রকাশকার অগুরুর প্রকারভেদ স্বীকার করেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অগুরুর সারভাগই ব্যবহৃত হয়, অসার অংশ পরিত্যাগ করা হয়। এইরূপে সংগৃহীত কাষ্ঠকে আগর বলে।

যে অগুরু জলে নিক্ষেপ করিলে জলে ডুবিয়া যায়, চর্ব্বণ করিলে দাঁতে জড়াইয়া যায়, যাহার আস্বাদ কষায় ও তিক্ত, যাহা পেষণ করিলে সহজে চূর্ণ হইয়া যায়, যাহার গন্ধ মনোরম, পোড়াইলে সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হয়, যাহা ওজনে ভারী, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, সেই অগুরুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাকেই কৃষ্ণাগুরু বলে।

আর যে আগর কাষ্ঠ জলে ফেলিলে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যায় না, তাহাকে চলিত ভাষায় নিম্ গারকী বলে।

আর যে কাষ্ঠ জলে ভাসে, তাহাকে বাজারে "সম্লাছ" বলে।

আর যে কাষ্ঠ অধিক কৃষ্ণবর্ণ নয়—অথচ অত্যন্ত সুগন্ধি, তাহাকে "কোয়ারা" বলে।

ভাষাভেদে নামভেদ—

বাঙ্গালায়—আগর

সংস্কৃতে—অগুরুপ্রবর, লোহ, রাজার্হ যোগজ, বংশিক, ক্রিমিজ ও অনার্য্যক।

ইংরাজী বা ল্যাটিন ভাষায়—Apuilaria, Agalloceha

গুজরাটে, কর্ণাটে ও তামিলে—আগর্

তৈলঙ্গে—হর গুহ চেট্রু আরবী—উদ্

হিন্দী ও উর্দ্দু—আগর্ ফার্সি—আগর

এই অগুরু শোধন করিবার জন্য কেহ গোলাপ, কেহ কর্পূর, কেহ গোলাপফুল, কেহ বা সিকিঞ্জিবান ব্যবহার করেন।

ইহার মাত্রা—১ মাষা হইতে ৪॥ মাষা পর্য্যন্ত।

আয়ুর্ব্বেদমতে—

অগুরু—কটুতিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, চর্ম্মের হিতকারক। চক্ষুরোগ, বায়ুরোগ ও বাতরোগে প্রযোজ্য।

চরক বলেন—হিক্কারোগীকে মধুর সহিত কৃষ্ণাগুরুচূর্ণ সেবন করাইবে।

সুশ্রুত বলেন—যাহার লবণমেহ আছে, তাহাকে পাঠা ও অগুরুর কাথ পান করাইবে।

দদ্রু, কুষ্ঠ ও কিট্টিম নামক চর্ম্মরোগে অগুরুর তৈল অভ্যাস করিতে দিবে।

বাগ্‌ভটে লিখিত আছে—

কাসরোগে মধুর সহিত অগুরুচূর্ণ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। হিক্কা ও শ্বাসরোগে উত্তম কৃষ্ণাগুরুর ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করা বিধেয়। উত্তম অগুরু কাষ্ঠ জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া গাত্রে অনুলেপ করিলে বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

কবিরাজমাত্রেই বলেন—অগুরুর সাময়িক প্রয়োগে মনে প্রফুল্লতা আনয়ন করে; তজ্জন্য অগুরুকে চন্দন মধ্যে গণ্য করা হয়।

ইহা পোড়াইয়া দন্তমাজনরূপে ব্যবহার করিলে দাঁত ও মাড়ি সবল হয় এবং দন্ত পরিষ্কার হয়।

হকমীমতে—অগুরুকে উদ বলে। ইহা সেবনে বদ্ধমল (সোদ্দা) বহির্গত হয় এবং মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, পাকস্থলী, মূত্রনালী, জরায়ু, রতিশক্তি ইত্যাদি সমুদয় সবল করে।

ইহা পাচক ও বীর্য্যস্তম্ভনকারী এবং মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে।

ইহা জরায়ুর শীতলতা বিনষ্ট করে, দাস্ত বদ্ধ করে এবং পাকস্থলীর রস ও দুর্গন্ধ দূর করে।

ইহা গর্ভবতী ও গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষক, ইহা শ্বাস-কাস শৈত্যজনিত হৃৎকম্প, পাণ্ডু ও মূর্চ্ছারোগে উপকারী।

ইহার ধূম ব্যবহারে মস্তিষ্কের দূষিত রস নিঃশেষ হয়।

ইহাতে সন্ধিবেদনা দূর হয়। কিঞ্চিৎ অগুরুকাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে উহা হইতে যে ধূম নির্গত হয়, সেই ধুমকে একটা দস্তা-নির্ম্মিত পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে। শিশুদিগের বমনরোগ অন্য কোন উপায়ে আরোগ্য না হইলে উক্ত দস্তা-নির্ম্মিত পাত্রে স্তনদুগ্ধ রাখিয়া সেই দুগ্ধ ২।৩ বার পান করাইলে আরোগ্য লাভ করে।

ইহা আগুনে পোড়াইলে যে ধূম উঠে, তাহা কাপড়ে লাগাইলে—কি রেশমী, কি পশমী, কি তূলার কাপড়,—কোন কাপড়েই পোকা ধরে না।

ডাক্তারীমতে—ইহা উষ্ণবীর্য্য, পিত্তনিঃসারক, পাচক এবং বাত-শ্লেষ্মানাশক ঔষধের অন্যতম উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। আমবাতে ইহা বিশেষ উপকারী, বমননিবারণার্থেও ব্যবহৃত হয়। কফজনিত বেদনা এবং শিরোরোগে ব্রাণ্ডির সহিত প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ডাক্তার এনিস্লী বলেন যে, কোচিন চীনে ইহা শিরোঘূর্ণন, পক্ষাঘাত পীড়া, উদরাময় ও বমনরোগে উত্তেজক ও সঙ্কোচ বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

R. N. Khorn বলেন—

It is used as perfume as well as stimulant cholagogm and also Diobstrucleied.

It is an ingredient in various revervecie tonic, carmination, stimulant properlum.

It is used nigant and Ehematie and it also cheeks vomitting.

In Bronchites of children it is applied to their chest and to the head in headache after mixed the paste with Brandy.

———

পলাশ (Butea frondose) বৃক্ষ

সংস্কৃত পর্য্যায়—কিংশুক, পর্ণ, বাতপোথ, ত্রিপর্ণ, বক্রপুষ্প, পূতদ্রু, ব্রহ্মবৃক্ষ, কাষ্ঠদ্রু।

পদ্মপুরাণমতে—পলাশ-বৃক্ষ ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্মা পার্ব্বতীর শাপে বৃক্ষরূপে পরিণত হন।

"অশ্বত্থরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।
রুদ্ররূপো বটস্তদ্বৎ পলাশো ব্রহ্মরূপধৃক্॥"

অর্থাৎ অশ্বত্থবৃক্ষ বিষ্ণুরূপী, বটবৃক্ষ, রুদ্ররূপী এবং পলাশবৃক্ষ ব্রহ্মরূপী।

"দর্শনস্পর্শসেবাসু তে বৈ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
দুঃখাপদ্ব্যাধিদুষ্টানাং বিনাশকারিণো ধ্রুবম॥"

সুতরাং উহার দর্শন, স্পর্শ ও সেবা করিলে পাপনাশ হয় এবং ইহা দুঃখ, আপদ ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তিগণের দুঃখাদিনাশক।

চাণক্য বলেন—ইহার পুষ্প দেখিতে সুন্দর, কিন্তু সুগন্ধ না থাকায় কেহই ইহার আদর করে না।

"পলাশ কুসুম বটে দেখিতে সুন্দর।
গন্ধ নাই ব'লে তারে কে করে আদর॥"

এই পুষ্পবৃক্ষ ভারতের সর্ব্বত্র এবং ব্রহ্মদেশে ও হিমালয় প্রদেশেই জন্মিয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ মধ্যমাকৃতি হইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ বড় পল্কা, সহজে ভাঙ্গিয়া বৃক্ষকে নষ্টশ্রী করিয়া ফেলে। এই কারণে ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Bastard teak বলে।

ভারতবাসীমাত্রেই ইহার গুণাদি বিষয় অবগত থাকিলেও এবং ইহা পুষ্পভারাবনত হইলে সুন্দর দেখিতে হইলেও কেহই ইহার আদর করে না।

ভাষা ও স্থানভেদে নামভেদ—

সংস্কৃত—পলাশ, কিংশুক।

বাঙ্গালা—পলাশ।

হিন্দী—ধাক্ পলাশ, তেস্থুকাপেড়, চিচ্‌রা।

সাঁওতাল—মুরুপ।

বেহারী—পরস বা ফরস।

নেপালে—পলাশী বুলচেত্র।

লেপ্‌চা—লহোকুঙ্গ।

উড়িয়া—পলাস্থু, মেঠা, পরাস্থু।

গুজরাটী—পলাসা, খাকার খখদো।

কচ্ছ—আকব, পালাস।

মারাঠী—পরস, পলস, ফলাস, চাঝাড়া।

তামিল—পোরসন, পরস, মুঝকল।

তেলেগু—মোদুগ, মোদগ মর্দস্থু, কিংশুকম্।

পারস্য—পলহ।

সিঙ্গাপুর—কালিয়া।

মালয়—মুরুঝকমরম্।

ব্রহ্ম—পৌক পাবপিন্।

ইংরাজী—Butea Gun. Bengal Kins.

বৃক্ষের ব্যবহার—

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ইহার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। তখন উহা কুড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বা ঐ শুষ্কপুষ্প গুঁড়া করিয়া রাখিতে হয়। ঠাণ্ডা

জলে ঐ গুঁড়া নিক্ষেপ করিলে অথবা উত্তপ্ত জলে ফুটাইলে এক প্রকার উৎকৃষ্ট রঙ বাহির হয়। ঐ রঙে অনেকে কাপড় রঙ করে।

কিন্তু ফট্‌কিরি, চুণ অথবা সাজিমাটি দ্বারা কাপড় সিদ্ধ করিয়া পলাশ-পুষ্পের রঙে ডুবাইয়া রাখিলে পাকা রঙ হয়। তবে ইহার বর্ণ অল্পতা-বশতঃ আবশ্যকমত গাঢ় করিয়া কাপড় রঙ করিয়া থাকে।

এই রঙ হিন্দুর বড় আদরের জিনিস। দোল উপলক্ষে হিন্দুরা পলাশরঞ্জিত রক্তাভ হরিদ্রা-বর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাজিমাটি, ফট্‌কিরি প্রভৃতিতে রঙের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

ইহার ফুল হইতে প্রাপ্ত হরিদ্রা-বর্ণের এক প্রকার আবির প্রস্তুত হয়। দোলের সময় ইহা ব্যবহৃত হয়। শৃঙ্গারবীজ ময়দার মত গুঁড়াইয়া তাহাতে গুলেনা রঙ মিশাল দিতে হয়, তখন উহার নাম হয় আবির।

এই বৃক্ষের আঁইসে (Fibres) দড়ি ও কাগজও প্রস্তুত করে।

কাঁচ শিকড় হইতে যে সূতার মত আঁইস পাওয়া যায়, ছোটনাগপুর মধ্যপ্রদেশ, অযোধ্যা, রাজপুতনা ও বোম্বাই প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে উহাতে দড়ি প্রস্তুত করে।

উহার কাষ্ঠ হইতে নকল চন্দনকাষ্ঠও প্রস্তুত করিয়া চন্দনকাষ্ঠ বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয়।

পলাশ-বীজে একরকম নির্ম্মল ও স্বচ্ছ তৈল প্রস্তুত হয়। ঔষধার্থে উহা ব্যবহৃত হয়। কোথাও কোথাও ঐ তৈলকে মুদুগ তৈল বলে।

গুণাগুণ—

এই কাষ্ঠের রস কষায়, উষ্ণ ও কৃমিদোষনাশক।

ইহার পুষ্প—উষ্ণ এবং কণ্ডু ও কুষ্ঠনাশক।

ইহার বীজ—কণ্ডু, দক্র, ত্বক্‌দোষনাশক।

ইহার পুষ্প চারি প্রকার ;—রক্ত, পীত, সিত ও নীল।

"রক্তঃ পীতঃ সিতো নীলঃ কুসুমৈস্ত বিভাব্যতে।
কিংশুকো বৈগুণ্যনাশী সিতা নীলো পীতঃ স্মৃতঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ।

ভাবপ্রকাশমতে—

ইহার রসের গুণ—অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, সারক, কটু, তিক্তরস, কষায়, ভগ্নসন্ধানকারক, ত্রিদোষনাশক এবং ক্রিমি, অর্শ ও গ্রহণী রোগে উপকারক।

পুষ্প—মধুপ, বিপাক, কটু, তিক্ত, কষায় বা বায়ুবর্দ্ধক, ধারক, শীত-বীর্য্য, কফ, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, পিপাসা, দাহ ও বাতকুষ্ঠনাশক।

ফল—লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রুক্ষ, এবং প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি, বায়ু, কফ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও বদরীরোগনাশক।

বীজ—কৃমিনাশক। কেহ কেহ বলেন ইহাতে (Santonine) এর কার্য্য করে। বিশেষতঃ অন্ত্রমধ্যে গোলাকার ক্রিমি (Round worm) দেখা দিলে, উহা সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বীজগুলি প্রথমে জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ছাল জলযোগে ফুলিয়া উঠিলে যত্নপূর্ব্বক ছাড়াইয়া উহার শাঁস উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া গুঁড়াইয়া লইবে।

তিন দিন ক্রমান্বয়ে তিনবার করিয়া বীজ-চূর্ণ ৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিবে।

৪র্থ দিবসে কিয়ৎপরিমাণে এরণ্ড-তৈল (Ca tor oil) সহ সেবনীয়।

Dr. Oswald বলেন—এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা তিনি ক্রিমি রোগে বিশেষ উপকার পাইয়াছেন।

তবে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অতি সাবধানতাসহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ, অতিমাত্রায় সেবন করাইলে বমন ও বিরেচন বিশেষরূপ বৃদ্ধি করে।

নেবুর রসের সহিত ইহার বীজ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কোন স্থানে প্রলেপ দিলে চর্ম্মের প্রদাহ বৃদ্ধি করে এবং সেই স্থানে ব্লিষ্টারের মত লাল হইয়া উঠে।

এইরূপ প্রলেপে দাদ [Ringworm] আরোগ্য হয়।

পুষ্পের গুণ সম্বন্ধে ডাক্তারগণ বলেন—ইহা ধারক, নির্ম্মলতাকারক, মূত্রবৃদ্ধিকর ও কামোদ্দীপক। ইহার পুলটিস দিলে মূত্রস্রাব বা রজঃস্রাব হইয়া পেটের ফুলা কমিয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের উদরাময় হইলে ইহার প্রয়োগে উপকার দর্শে।

কোষপ্রদাহে বাহিরে প্রলেপ দিলে জ্বালার উপশম হয়।

পত্রের গুণ সম্বন্ধে বলেন—

উহা ধারক, বলকারক, কামোদ্দীপক, ব্রণ-ঘামাচি-জন্য ফোড়ায়, উদারাধ্মান জনিত পেটের বেদনায়, ক্রিমি ও অর্শরোগে ইহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

আদার সহিত ইহার ছাল বাটিয়া খাইলে সর্পদংশনজন্য বিষ-জ্বালা দমিত হয়।

Dr. T. N. Sheppard সাহেব বলেন—

অহিফেন হইতে যে মর্ফিয়া [Morphia] প্রস্তুত হয়, উহার শুভ্র বর্ণ করিতে হইলে পলাশ কাষ্ঠের কয়লার বিশেষ আবশ্যক।

অর্শের বলি বা বাগী প্রভৃতি ঘায়ে অনেকে পলাশপত্রের পুলটিশ করিয়া লাগাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন।

বেদাদি গ্রন্থে পলাশ-বৃক্ষের কথা উল্লিখিত আছে, সোম (চন্দ্র) পলাশ-প্রিয়। পলাশ-পুষ্পে দেবাদির পূজা হয়। ইহার কাষ্ঠ নবগ্রহযাগজন্য হোমাদিতে ব্যবহৃত হয়।

বৌদ্ধেরা পলাশবৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন।

ইহার পত্রে তিনটি ফলা থাকে। কেহ কেহ ঐ তিনটিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর অভিহিত করে।

ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন-সংস্কারে পলাশদণ্ডের বিশেষ আবশ্যক।

আমেদাবাদ জেলায় পলাশের পত্রে—থালা-বাটি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে এবং ভোজের সময় আমাদের দেশে কলাপাতা বা শালপাতার মত থালা ও বাটির কার্য্য করে।

ইহা শুকাইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকে।

পলাশপত্র গোমহিষাদি আদরের সহিত খায়।

জমিতে পলাশপত্রের সার দিলে জমি বেশ উর্ব্বর হয়।

এই বৃক্ষের গাত্রে লাক্ষারও চাষ অনেক স্থানে হইয়া থাকে।



ঘৃতকুমারী ও মুসব্বর

ঘৃতকুমারী গাছ এ দেশে প্রচুর পরিমাণেই জন্মিয়া থাকে, সুতরাং অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু মুসব্বর যে এই ঘৃতকুমারী গাছের রস, তাহা বোধ হয়, অনেকেই জানেন না, এমন কি, আমাদের দেশীয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে মুসব্বরের উল্লেখও দেখা যায় না। তবে আধুনিক কয়েকখানি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহার বিশেষ ব্যবহার সম্বন্ধে অল্পস্বল্পই আছে; তেমন কিছু বিশেষরূপে বর্ণিত হয় নাই। অনেকে বলেন যে, মুসব্বর জিনিসটা আরব, আফ্রিকা, জাম্বিরাবাদ প্রভৃতি দেশ হইতে চর্ম্মবদ্ধ হইয়া আসে, সুতরাং হিন্দুরা উহা ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখিয়া আসিতেছেন। তাই আমাদের চরক, সুশ্রুত ও ধন্বন্তরির নিঘণ্টুতে উল্লেখ নাই।

মুসব্বর জিনিসটা ঘৃতকুমারী গাছের সার বটে, তবে আরব ও আফ্রিকা দেশে এই গাছের নিকটস্থ ভূমিতে ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহার উপর ছাগলের চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া রাখে এবং ঘৃতকুমারীর পরিপুষ্ট পাতাগুলি আড়ভাবে কাটিয়া সেই ছাগচর্ম্মের উপর রাখিয়া দেয়, যাহাতে ঘৃতকুমারীর রস তন্মধ্যে আবদ্ধ হয়।

প্রায় ঘণ্টা তিন পরে যখন উহার সমস্ত রস নির্গত হইয়া যায়, তখন ঐরূপে সঞ্চিত রস চামড়ার থলিতে পুরিয়া বিক্রয়ার্থ নানা দেশে প্রেরিত হয়।

এই রস শুষ্ক হইতে প্রায় মাসাধিক কাল লাগে। এমন কি, ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহাকে সাকোট্রাইন মুসব্বর বলে।

এই বৃক্ষকে আরবী ভাষায় সেবারা বলে এবং ডাক্তারীতে Aloes Indica. Aperfolialica A. Vera:. A Chinensis প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। হিন্দীতে গন্দাল বা ঘেকওয়ার বলে। আর আমাদের দেশে বাঙ্গালায় ঘৃতকুমারী নামে খ্যাত। সংস্কৃত ভাষায় ঘৃতকুমারীর নাম—

"কুমারী গৃহকন্যা চ কন্যা ঘৃতকুমারিকা।"

অর্থাৎ কুমারী, গৃহকন্যা, কন্যা, ঘৃতকুমারিকা। গুণ-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"কুমারী ভেদনী শীতা তিক্তা নেত্ররসায়নী।
মধুরা বৃংহণী বল্যা বৃষ্যা বাতবিষপ্রণুৎ॥
গুল্ম-প্লীহা যকৃদ্‌বৃদ্ধি-কফজ্বরহরী তথা।
গ্রন্থ্যগ্নিদগ্ধ বিস্ফোট-পিত্তরক্তত্বগাময়ান॥"—ভাবপ্রকাশ।

অর্থাৎ—ইহা ভেদক, শীতবীর্য্য. তিক্ত, মধুররসযুক্ত, চক্ষুর হিতকর, রসায়ন, পুষ্টিজনক, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক। আর ইহা বায়, বিষ, গুল্ম, প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি, কফজ্বর, গ্রন্থি, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, রক্তপিত্ত ও চর্ম্ম-রোগে বিশেষ উপকারী।

এই ঘৃতকুমারীর শস্যের মাত্রা ১।২ তোলা মাত্র এবং মুসব্বরের মাত্রা সিকি হইতে অর্দ্ধ আনা মাত্র।

স্থানভেদে ঘৃতকুমারীর নামভেদ—

বাঙ্গালায়—ঘৃতকুমারী	আরবী—সেবর
হিন্দীতে—ঘিউকুমার, কুবরেপাট	পার্শী—সবর
গুজরাটী—কুবার	মহারাষ্ট্রে—কোরফড, কোরফান্টা
তৈলঙ্গ—পিণগোরিকণ্টলবন্দ	ইংরাজী—Aloes Indica

মুসব্বরও স্থানভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় এবং বিভিন্ন প্রকারেও প্রস্তুত হয় বলিয়া বিভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট দেখা যায়।

(১) **সকোট্রাইন**—ইহার রস ফিকে পীতবর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ অহৃদ্য—ইহা মস্কট ও আরব দেশে বিক্রিত হয়। চর্ম্মে বদ্ধ সকোট্রাইন মুসব্বর জাঞ্জিবর এবং লোহিতসাগরতীরবর্ত্তী বন্দর হইতে বোম্বাই সহরে আনীত ও বিক্রীত হয়। ইহাতে প্রচুর চর্ম্মখণ্ড এবং প্রস্তরাদি মিশ্রিত থাকে। পরে ইহা কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত করিয়া বাক্স-মধ্যে রাখিয়া য়ুরোপে প্রেরিত হয়। উত্তম সকোট্রাইন মুসব্বর দেখিতে কটা সোনালী রঙের, উপরিভাগ কঠিন, কিন্তু ভিতরটা কোমল ও এক প্রকার বিচিত্র সুগন্ধযুক্ত। ইহার চূর্ণ কটা লেবু রঙের। প্রায় তরলাবস্থাতেই থাকে।

(২) আরব দেশীয় **মুসব্বর**—এই মুসব্বর এডেন নামক বন্দর হইতে আনীত হইয়া নানা দেশে যায়, তজ্জন্য ইহাকে এরেবিয়ান (Arabian) মুসব্বর বলে।

ইহার প্রস্তুত-প্রণালী:—ঘৃতকুমারীর স্থূল পত্রগুলি পেষণপূর্ব্বক পদতলে মর্দ্দন করিতে হয়। কিছুদিন পরে যখন এই রস গাঢ় হয়, তখন উহা চর্ম্মপুটকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হয়।

এই মুসব্বর তাদৃশ উত্তম নহে এবং পদতলে মর্দ্দিত হয় বলিয়া অনেকে লইতে চায় না। এমন কি, আরবীয় ও পারসীয় গ্রন্থকারগণ আরবীয় মুসব্বর অপেক্ষা সাকোট্রাইন মুসব্বরের আদর করে; কিন্তু এই ভারতে আবার দেশীয় মুসব্বরের অধিক প্রচলন। ইহা কৃষ্ণবর্ণ, সচ্ছিদ্র, ইহার ছোট ছোট টুকরা পীতবর্ণ, কটারঙের এবং চিক্কণ ও তীক্ষ্ণগন্ধ বিশিষ্ট। ইহা নাইট্রিক এসিডে মিশাইলে লোহিতবর্ণ হয়।

(৩) জাফিরাবাদ **মুসব্বর**—ইহা বৃত্ত পিষ্টকাকৃতিরূপে জাফিরাবাদ হইতে আনীত হয়। ইহা কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট ও চক্‌চকে। ক্ষুদ্র টুক্‌রাগুলি পীতাভ চক্‌চকে। ইহার চূর্ণ ফিকে পীতবর্ণ-বিশিষ্ট। ইহা নাইটিক এসিডে মিশ্রিত করিলে লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত হয় না; ইহা সকোট্রাইন মুসব্বরের মত গুণ-বিশিষ্ট নহে।

(৪) মহীশূর **মুসব্বর**—ইহা তদ্দেশে শিল্পকার্য্যেই ব্যবহৃত হয়, তেমন গুণ নাই, যাহাতে ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

হকিমীমতে—

মুসব্বর—যকৃৎ ও পাকস্থলীর বদ্ধমল দূর করিয়া বায়ু বিলীন করে।

ইহা কামলা ও পাকস্থলীর পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি, একদিনেই পেটের বেদনা আরোগ্য হয়।

ইহা তীক্ষ্ণ বিরেচক এবং কৃমিনাশক। ইহা ব্যবহারে সন্ধিস্থানের বেদনা দূর করে। পাকস্থলীর দোষে যদি শিরোরোগ হয়, তাহা হইলে মুসব্বরে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ইহা ব্যবহার করিলে নিদ্রা আসে। যে ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয় না—ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ইহা শিশুদের পেটের ক্রিমি নষ্ট করে এবং অল্পমাত্রায় রক্ত পরিষ্কার করে।

সুর্ম্মার মত চক্ষুতে লাগাইলেও চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি করে। চক্ষুর চুলকণা, চক্ষুর ক্ষত, চক্ষুর পাতা ফুলিলে এবং অন্যান্য বিবিধ চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারী দেখা যায়।

নারিকেল-তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে খোস, পাচড়া ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

সোহাগার সহিত ব্যবহার করিলে শিশুদিগের শ্বাস-কষ্ট দূর হয়।

রসওয়াৎ আলক, আফিং, মুসব্বর, আকাকিয়া একত্রে সির্কার সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্লীহাবৃদ্ধি কমিয়া যায়। তবে অত্যন্ত শীত বা গ্রীষ্মের সময় ব্যবহার করা উচিত নহে।

ডাক্তারীমতে—

ইহা বিরেচক। আর তরুণ পত্র হইতে যে রস-নির্গত হয়, তাহা স্নিগ্ধকারক। তজ্জন্য প্রমেহরোগে চিনিসহ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

অল্পমাত্রায় ইহা পাচক, যকৃতের বলবর্দ্ধক এবং ধারক।

মুসব্বর এরণ্ডতৈলসহ শিশুগণের নাভিতে মর্দ্দন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে।

বৃদ্ধবয়সের দুর্ব্বলতা-উৎপাদক পীড়ায় উপকারক। অর্শরোগে আমসংযুক্ত রক্তস্রাবে ইহা ফলপ্রদ। ইহার প্রলেপ চর্ম্মবিকার-নাশক [Materia Indica of India by K. N. Khory]

আয়ুর্ব্বেদীয়মতে—

ভাবপ্রকাশমতে—গুল্মে কুমারী—

"গুল্মী কুমারিকা মাসং কর্ষার্দ্ধং গোঘৃতান্বিতম্।"

ঘৃতকুমারীর শাঁস গব্যঘৃতেরসহ সেবন করিলে কামলা ও গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

"অপহরতি কামলার্ত্তিং নস্যেন কুমারীকাজলং সদ্যঃ।"

ঘৃতকুমারীর রসের নস্য গ্রহণ করিলে কামলারোগ প্রশমিত হয়।

শার্ঙ্গধরমতে—

"নিশাচূর্ণযুতঃ কন্যারসঃ প্লীহাঽপচীহরঃ।"

হরিদ্রা-চূর্ণের সহিত ঘৃতকুমারী রস সেবনে প্লীহা ও অপচী রোগ আরোগ্য হয় এবং ইহার নামে ইহার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

[১] স্থলেরুহা—স্থলে জন্মে।

[২] দীর্ঘপত্রিকা—পাতাগুলি দীর্ঘ।

[৩] স্থূলদলা—একত্রে অনেকগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া জন্মায়।

[৪] কণ্টক-প্রাবৃতা—পত্রে কণ্টকযুক্ত।

[৫] বিপুলস্রবা—ইহা হইতে প্রচুর রস নির্গত হয়।

উপরি-উক্ত পর্য্যায়-শব্দ দ্বারা ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল।

ইহাকে "ভৃঙ্গেষ্টা"ও বলে। ইহাতে যষ্টির মত যে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়, তাহাতে লেবুরঙের ফুল বাহির হয়; এজন্য "ভৃঙ্গেষ্টা" বলে।



টোমাটো

এমনও একদিন ছিল, যখন কবিরাজ মহাশয়েরা দেশীয় গাছগাছড়া ব্যবহারে ও খাদ্যদ্রব্যের তারতম্য অনুসারে রোগের প্রতিকার করিতেন। ঔষধ যে দেশেই প্রস্তুত হউক না কেন, তাহা সেই দেশীয় গাছগাছড়া ও ধাতুদ্রব্য হইতেই প্রস্তুত। যদি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সহস্র সহস্র মাইল দূরে পাঠাইয়া তাহার উপকারিতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে দেশীয় ভৈষজ্য সকল সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিলে তাহার উপকারিতা আরও অধিক হইবে না কেন? টাটকা মাছ যেরূপ সুস্বাদু ও উপকারক হয়, নোণা মাছ বা টিনে রক্ষিত মাছ সেরূপ সুস্বাদু ও উপকারী হইতে পারে না। সকলেই tinned fish জানেন। মাছ ধরিয়া রাসায়নিক উপায়ে টিনে রক্ষিত করিয়া দেশবিদেশে পাঠাইলে সেই সব দ্রব্যের উপকারিতা কি টাটকা জিনিষের ন্যায় থাকে? হাজার হাজার মাইল দূরে থাকিয়া যদি এক দেশের লোক তাহার নিজ দেশের মৎস্য খাইতে ইচ্ছা করেন, তখন রাসায়নিক উপায়ে সংরক্ষিত টিনের মাছ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যখন টাটকা জিনিষ পাইবার উপায় নাই, তখনই শুকাইয়া রাখিয়া বা টিনে রাখিয়া সেই সব জিনিষ ব্যবহার করা হয়। আমাদের ভারতবর্ষেই যে যে স্থানে যে যে মাছ খুব বেশী জন্মায়, তাহা শুকাইয়া রাখিয়া অন্য স্থানে পাঠান হয়। আমরা যেগুলিকে শুঁটকি মাছ বলি, তাহা চিংড়ি ইত্যাদি মাছ শুকাইয়া রাখিয়া অনেক দিন বাদে ব্যবহৃত হয়। নুণ দিয়া রক্ষিত ইলিস মাছ ও ডিম ইত্যাদি, যাহাকে আমরা সচরাচর নোণা মাছ বলি। কই মাছের শুকান ডিম দূরদেশে ব্যবহৃত হয়। এই সকল দ্রব্য যে স্থানে ও যে সময়ে টাটকা পাওয়া যায়, সে সময়ে নোণা, শুকনো ও টিনে রক্ষিত জিনিষ

একেবারেই ভাল লাগে না। আর সে সব জিনিষের উপকারিতাও টাট্‌কা জিনিষের ন্যায় হয় না, হইতেও পারে না। Tinned fruitsও তদ্রূপ। রাসায়নিক উপায়ে টিনে রক্ষিত ফল টাট্‌কা ফলের ন্যায় কখনই সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হইতে পারে না। দুগ্ধও তদ্রূপ। Tinned milk টাট্‌কা দুধের ন্যায় কখনও সুস্বাদু ও উপকারী হইতে পারে না, যদিও সময়ে সময়ে এরূপ লোকও দেখা যায়, যাঁহারা টাট্‌কা দুধ পাইলেও টিনের দুধ দিয়া চা খাইতে ভালবাসেন। বিকৃত আস্বাদই তাহার প্রধান কারণ।

রাসায়নিক উপায়ে সংরক্ষিত জিনিষ টাট্‌কা জিনিষের উপকারিতা পাইতে পারে না। আজ এক জিনিষ চাষ হইতে সংগ্রহ করিয়া রাসায়নিক উপায়ে সংরক্ষিত করিয়া যদি এক বৎসর বাদে ব্যবহার করা যায়, তবে সে টাট্‌কা জিনিষের উপকারিতা রাসায়নিক দ্রব্যে কখনই থাকিতে পারে না। যদি ইহা সত্য হয়, তবে দেশে প্রস্তুত টাট্‌কা ঔষধ বিদেশে প্রস্তুত ঔষধ অপেক্ষা অনেক উপকারী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঔষধরূপে প্রস্তুত না করিয়াও যদি আমরা সেই ভেষজ ও গুণসম্বলিত দ্রব্যগুলি প্রত্যহ ভক্ষ্যবস্তুরূপে ব্যবহার করি, তাহা হইলেও ঔষধ সেবনের উপকার ভক্ষ্যবস্তুতে কেন হইবে না? পূর্ব্বে আমাদের দেশের মনীষীরা এবং কবিরাজেরা প্রত্যেক দ্রব্যের গুণ অনুযায়ী ভক্ষ্যদ্রব্যের তালিকা স্থিরীকৃত করিয়া দিতেন। শুধু তাহাই নয়, চন্দ্রের আকর্ষণ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন্ দিবসে কোন্ দ্রব্য খাওয়া উচিত, তাহার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। আর সেই ব্যবস্থা যাহাতে লোকে পালন করে, সেইজন্য দৈনিক পঞ্জিকাতে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্ষোভের বিষয়, তাহা আমরা পাঠ করি না এবং তদনুরূপ কার্য্যও করি না, ফলে ডাক্তারের সংখ্যা বাড়িতেছে আর গৃহস্থকে কথায় কথায় ডাক্তার ডাকিতে হইতেছে। ছেলের একটু গা গরম হইল, ডাক্তার ডাক। খুকী একটু

কাসিয়াছে, ডাক্তার ডাক। গৃহিণীর মাথা দপ দপ করিতেছে, ডাক্তার ডাক। যত দিন গৃহকর্ত্রী তিথির ও বিভিন্ন দিবসের ও সময়ের তারতম্য অনুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তত দিন ঘন ঘন এত ডাক্তারের প্রয়োজন হইত না। অবশ্য সে সময়ে এত ভেজাল জিনিষ চলিত না, ঘি ভেজাল, তেল ভেজাল, ময়দা ভেজাল, এমন কি, করপোরেশনের জল ভেজাল। এ অবস্থায় যে আমরা বাঁচিয়া আছি, তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সৌভাগ্য। কারণ, পূর্ব্বপুরুষকে ত' পিণ্ড আমরাই দিব, কিন্তু এখন ত' ঘিওয়ালা, তেলওয়ালা, ময়দাওয়ালা ও করপোরেশনের জলের লোকেরা আমাদের প্রত্যহ পিণ্ড দিতেছে। আমার বিশ্বাস, যদি আমরা ঔষধ ব্যবহার কম করিয়া উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের উপর নজর রাখি, তাহা হইলে আমরা ব্যাধির হাত হইতে অনেক সময়ে রক্ষা পাইতে পারি। শাক-প্রবন্ধে আমি প্রমাণের দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, শাক বিশেষ উপকারী। Americaর স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, পালম্‌ শাকের ন্যায় উপকারী জিনিষ পৃথিবীতে অতি স্বল্প পাওয়া যায়। সেইজন্য একজন ডাক্তার সেখানে বলিয়াছেন যে, সোনায় তুল্য ওজনে পালম্‌ শাক বিক্রয় হওয়া উচিত।

টোমাটো শরীরের বিশেষ উপকারী, ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারিলে অনেক সময় রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে। ইহা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জন্মাইত না, এখন ইহা প্রচুর পরিমাণে এই দেশে জন্মায়।

পাশ্চাত্য প্রদেশজাত যে সকল শাকসব্জী ভারতে জন্মে, তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে টোমাটো অধিক পরিমাণে জন্মাইতেছে। উপকারিতা হিসাবে লেবুর পরেই টোমাটোর স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

ডাক্তার Henry C. Sherman কলম্বো ইউনিভার্সিটির খাদ্য-রসায়নের (Food Chemistry) অধ্যাপক তাঁহার "আহার্য্য বস্তু" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, লেটুস বা String beadsএ যে পরিমাণ "A" এবং "B" সংখ্যক ভিটামিন্ [খাদ্যপ্রাণ] থাকে এবং কমলালেবু বা পাতিলেবুতে যে পরিমাণ "C" সংখ্যক ভিটামিন্ থাকে, একা কাঁচা বা সিদ্ধ টোমাটোতে সবগুলিই পরিমাণে তত সংখ্যক ভিটামিন্ পাওয়া যায়। মাখনে যত ভিটামিন্ থাকে, টোমাটোরও শুষ্কশাগ Spinachএ তদপেক্ষা অনেক অধিক ভিটামিন পাওয়া যায়।

চর্ম্মরোগ, কাউর ঘা ইত্যাদি ও Scurvy রোগের ঔষধ

বহুকাল হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া Rickct এবং Scurvy রোগে টোমাটোর রসে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। আজকাল দুর্ব্বল, অথর্ব্ব ও রুগ্ন লোকের ও ছোট ছোট ছেলেদের পক্ষে অম্ল ও পুষ্টিহীনতা রোগে টোমাটোর রস একমাত্র ঔষধ। চিকাগো মেমোরিয়াল হাঁসপাতালের রোগীদিগকে টোমাটোর রস খাওয়ান হয়। ঐ হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত প্রধান চিকিৎসক লিখিয়াছিলেন—শিশু এবং বালকবালিকাদিগকে টোমাটোর রস খাওয়াইয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা স্বপ্নাতীত। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে টোমাটোর রস আশ্চর্য্যরূপ ফলপ্রদ। ভিটামিন্ অভাবে পুষ্টিহীনতার জন্য চক্ষুরোগও জন্মায়, সেই সকল রোগে টোমাটোর রস চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

রোগ হইতে রক্ষা

পৃথিবীতে খাদ্যদ্রব্য হইতে যে কোনও রোগ জন্মায়, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান অস্ত্র টোমাটোর রস; ইহা কোন একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যদিও ইহা অতি সহজে ও অল্প

মূল্যেও পাওয়া যায়, তবুও সাধারণ লোকে বড়ই অল্প ব্যবহার করিয়া থাকে। যে সকল রোগী জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহাদের টোমাটোর রস দেওয়া যাইতে পারে, কারণ, শরীরের উপর ইহার প্রয়োগে অসুস্থতা ও জ্বর-ভাব কাটাইয়া দেয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে রোগের উপশম করে। টোমাটোর রস তৃষ্ণা-নিবারণের একটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পানীয় দ্রব্য; ইহাতে তিনটি বিশেষ অম্লশক্তি আছে;—Malic acid যাহা আপেলে বর্ত্তমান, Citric acid যাহা পাতিলেবু, চুণ ও কমলালেবুতে বর্ত্তমান এবং Phosphoric acid। ইহা ছাড়া টোমাটোর রস দৈনিক আহারের সময় খাইলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। ইহা লালা-নিঃসরণে সাহায্য করে এবং খাদ্য খাইবার ইচ্ছাকে শক্তি-শালী করে। লণ্ডনের Dr. P. J. Cammidge বলেন, বহুমূত্র রোগে সমস্ত ফল এবং শাকসব্জীর ভিতর টোমাটোই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আহার্য্য। এখন ডাক্তারেরা রক্তহীনতা এবং স্থূলতা রোগে টোমাটোর রস সেবন-ব্যবস্থা বহু-পরিমাণে করিতেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে কর্ত্তৃপক্ষেরা এখন শরীরকে লঘু করিতে, টোমাটোকেই সকল আহার্য্যের উপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন।

পাঠকেরা বোধ হয় ইহা জানেন না যে, অধিক পরিমাণে মদ কিম্বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য পানে শরীরের উপর যে ক্ষতি হয় এবং তাহার জন্য toxineএর আবির্ভাব হয়, তাহাতে টোমাটোর রস কিম্বা ঠাণ্ডা টোমাটো আহারে কি ফল পাওয়া যায়। সেই অবস্থায় শরীরের উপর টোমাটো কিম্বা টোমটোর রস পানে শরীরকে বিশেষ উপকারী ও লাভবান্ করে। যাঁহারা অতিশয় মদ্য পান করেন কিম্বা অন্য কোনও ঔষধ ব্যবহার করেন, যাহা মদ্যপানের ফল আনিয়া দেয়, সেই সকল লোককে আজকাল ডাক্তারেরা প্রচুর পরিমাণে টোমাটোর রস খাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ব্যায়ামের অভাবজনিত এবং গুরুপাক ও মশলাদার খাদ্য গ্রহণজনিত যে সকল অসুস্থতা এবং toxine জন্মায়, তাহাও টোমাটোর রস ব্যবহারে

অতি সহজে দূরীভূত হয়। টোমাটো কেবল যে ভিটামিন-প্রধান এবং দেহ-পরিষ্কারক, তাহা নয়, ইহাতে বিশেষ পরিমাণে ধাতব পদার্থ বিদ্যমান। টোমাটোতে Protine. Phosphate, Potash lime, magnesium, Sodium, Sulphur, chlorine, এবং প্রচুর পরিমাণে লৌহ (iron) আছে। মাংসতে লৌহ পদার্থ আছে সত্য, কিন্তু পুষ্টিসাধনের দিক্ দিয়া, ফল এবং শাকসব্জীতে যে ভাবে লৌহ-পদার্থ মিশ্রিত হইয়া থাকে, তাহাতে শরীরকে পুষ্ট করিতে মাংস-ভোজন অপেক্ষা ফল এবং শাক-সব্জী ব্যবহারে অনেক অধিক উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। চিকাগোর ডাক্তার G. W. Waguer বলিয়াছেন—

[১] সকল আহার্য্যের ভিতর টোমাটোই ভিটামিন-প্রধান।

[২] উহা প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যের অগ্নিশক্তির কার্য্যে সকল শাক-সব্জীর ভিতর শ্রেষ্ঠ ; টোমাটো পাকস্থলী এবং অন্ত্রসকল সুস্থ ও সবল করিয়া তোলে।

[৩] রক্ত-পরিষ্কারে বিশেষ সহায়ক।

[৪] টোমাটো মূত্রগ্রন্থি পরিশোধন করে এবং কোন রোগের বিষ থাকিলে শরীর হইতে উহা ধৌত করিয়া বাহির করিতে সাহায্য করে।

[৫] বহুমূত্রে এবং Brights disease [মূত্রের অণ্ডলালাময়ত্বে] ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

যাঁহারা পূর্ব্বে খাদ্য হিসাবে টোমাটোর উপকারিতা উপলব্ধি করেন নাই, এক্ষণে তাঁহারা বহুল পরিমাণে টোমাটো ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্যবান্ হইতেছেন।

অজীর্ণতায়, বাতে, চক্ষুরোগে, স্থূলতায় বা মেদবৃদ্ধিতে, রক্তহীনতায়, কোষ্ঠ-বদ্ধতায়, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে, রক্তদোষে, চর্ম্মরোগে এবং অন্যান্য অনেক প্রকার শারীরিক অসুস্থতায় টোমাটো ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কর্পূর

কর্পূর শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। ইহা কৃপ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। (কৃপ-ঘে-উর), এবং কৃপ্‌ ধাতুর অর্থ মিশ্রণ। ইহা হইতে অনেকে হয়ত' মনে করিতে পারেন যে, কর্পূর মিশ্রিত-পদার্থ। বাস্তবিক তাহা নহে। তবে কর্পূর-বৃক্ষের ডাল ও গুঁড়ির কাষ্ঠগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া কর্পূর্‌ প্রস্তুত করিতে হয় অর্থাৎ ইহা বৃক্ষের নির্য্যাসমাত্র। যে উপায়ে খদিরবৃক্ষ হইতে খদির বাহির করা হয়, ঠিক সেই উপায়েই চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে কর্পূর বাহির করিয়া লয়। বোধ হয়, সেই জন্য ইহার ধাত্বর্থে মিশ্রণ বুঝায় অর্থাৎ জল মিশাইয়া কর্পূর বাহির করা। এতদ্ভিন্ন সুমাত্রা, বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে "বরস্‌" নামক একপ্রকার বৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষের হৃদ্‌মধ্যে স্বভাবতঃই একপ্রকার শুভ্র জমাট পদার্থ জন্মিয়া থাকে, ইহাই স্বভাবজ কর্পূর। এ দেশে কষ্ট করিয়া বৃক্ষের নির্য্যাস বাহির করিতে হয় না। বৃক্ষটি কর্ত্তন করিয়া, উহার অভ্যন্তরে স্বাভাবিক কর্পূর বাহির করিয়া লয়। সুতরাং ইহা মিশ্রিত-পদার্থ নহে। তবে ইহাকে পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান-জলে ধৌত করিতে হয়। এখানেও জল-মিশ্রণ।

এই জন্য আমাদের দেশের বৈদ্যশাস্ত্রে দুই প্রকার কর্পূরের উল্লেখ আছে,—পক্ক ও অপক্ক। অর্থাৎ যাহা জাল দিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়, তাহা পক্ক, আর যাহা বৃক্ষাভ্যন্তরে আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে, তাহা অপক্ক। চীন ও জাপান দেশে পক্ক কর্পূর প্রস্তুত হয়। আর বর্ণিও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে অপক্ক কর্পূর বৃক্ষাভ্যন্তরে স্বাভাবিক অবস্থায়

জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ শেষোক্ত কর্পূরকে "ভীমসেনী" কর্পূর বলিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন হিমালয়-পর্ব্বতে, ব্রহ্মদেশে ও পেগু প্রদেশে একপ্রকার কর্পূরবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আজকাল কেহই ভারতে বা ব্রহ্মদেশে কর্পূর প্রস্তুত করেন না, এমন কি, কিরূপে কর্পূর প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও অধুনা অধিকাংশ লোকেই অবগত নহেন।

ভাষা-ভেদে কর্পূরের নাম-ভেদ

সংস্কৃত ও বাঙ্গালায়—কর্পূর। গুর্জ্জর প্রদেশে—কর্পূর বা কাপুর বলে। হিন্দী—কাপুর, কর্পূর বা মসর। তামিল—সূদন বা কর্পূরম্। সিংহলী ভাষায়—কাপুরা। ব্রহ্মদেশে পারক, পিয়া বা পারুক্ বলে। আরবী—কাফুর বলে। ইংরাজী ভাষায়—কেম্ফর (Camphor) বলে। ফরাসী ভাষায় Kamfer, স্পেন—Alcamfra, ইটালী—Camfra। সুমাত্রাবাসীরা বরস্ বলে।

নানাজাতীয় বৃক্ষ হইতে কর্পূর পাওয়া যায়—তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান।

(১) পক্ব-কর্পূর—Cinnamomum camphora (চীনক)।

(২) অপক্ব-কর্পূর—Dryobealanops Aromatica (সুমাত্রা-জাত)।

(৩) তামাকের পাতা চোয়াইয়া একপ্রকার কর্পূরের মত সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায় (Tobacco Leaf)।

(৪) থাইম্স্ তৈলের সারাংশ চোঁয়াইয়া একরূপ কর্পূর হয় (Thymes)।

(৫) পাঁচুলী গাছ হইতেও কর্পূর উৎপন্ন হয় (Panchuli)।

(৬) নারাঙ্গা নেবু হইতেও কর্পূর প্রস্তুত করা যায় (A kind of orange)।

(৭) বঙ্গদেশে—Nimnophila Gratis Loides নামে একপ্রকার গাছ জন্মে, তাহা চোঁয়াইয়া একপ্রকার কর্পূর প্রস্তুত হয়।

রাসায়নিকেরা বলেন, কর্পূরের Chemical formula $C_{10}H_{16}O$ ইহার Specific gravity ০, ৯৯২, ইহা ৩৫০ ডিক্রী ফারণহিট উত্তাপে গলিয়া যায়। ৫০০ উত্তাপে ফুটিতে থাকে। ইহা জলে অল্পই মিশে, কিন্তু ইহা Ether বা Alcoholতে বেশ মিশিয়া যায়।

কর্পূরের ইতিহাস

রোম ও গ্রীস্ দেশের ইতিহাসাদি গ্রন্থে কর্পূরজাতীয় কোন পদার্থের উল্লেখ নাই, ইহা হইতে য়ুরোপ-নিবাসিগণের বিশ্বাস যে, কর্পূর আধুনিক দ্রব্য অর্থাৎ পুরাকালে কর্পূর নামে কোন পদার্থ যে ছিল, তাহা কোন সুসভ্য জাতিই অবগত ছিল না। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবীয়েরা প্রথম ইহা আবিষ্কার করে। সেই অবধি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা কর্পূরের ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। বহুদিন যাবৎ এইরূপই তাঁহাদের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল। কিন্তু (Marco Pollo) মার্কপলো নামক কোন এক সুপ্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় পরিব্রাজক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে চীন, ভারত, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবগত হন যে, কর্পূর উক্ত সকল স্থানে বহুকাল যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এমন কি, তাঁহার মতে ভারতবাসীরা ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও কর্পূরের গুণাগুণ অবগত ছিলেন। সুতরাং ভারতে ইহা নূতন নহে।

আবার (Dymock) ডিমক্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, আরব্য উপন্যাসে (Arabian Nights Entertainment, Thousand & One Nights) যে সিন্দবাদ নামক পরিব্রাজকের গল্প আছে, তাহাতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, সিন্দবাদ দ্বিতীয়বার যখন সমুদ্রযাত্রা করেন,

তখন তিনি "রিণা" নামক উপদ্বীপে একপ্রকার পদার্থ দেখিয়াছিলেন; তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে উহা মালয় উপদ্বীপ-জাত কর্পূর বলিয়া ধারণা হয়। বৃক্ষচ্ছেদ করিয়া বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে উহা বাহির করিয়া উক্ত উপদ্বীপবাসীরা ব্যবহার করিত। ইহা হইতে ডিমক্ সাহেব অনুমান করেন যে, আরবীয়েরা বহুদিন যাবৎ কর্পূরের ব্যবহার জানিত ও কি উপায়ে কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যাইত, সে সমুদয় আরবীয়েরা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। নহিলে উক্ত গল্পের মধ্যে এরূপ কথার উল্লেখ থাকিত না।

তবে আমাদের ভারতবর্ষে যে কতশত বৎসর যাবৎ কর্পূর ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। সত্য বটে, ঋগ্বেদে কর্পূরের উল্লেখ নাই। কিন্তু আমাদের পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থে ও চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ, সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যক-গ্রন্থে কর্পূর শব্দের বহুস্থানে উল্লেখ আছে; এবং কর্পূরের গুণাগুণ ও প্রকারভেদ প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে লিখিত আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে উক্ত পুরাণাদি গ্রন্থগুলি প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। সুতরাং কর্পূর যে অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, ইহা সুনিশ্চিত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে—"কশ্চিদ্বহতি তাম্বূলম্ কর্পূরাদিসুবাসিতম্।"

বরাহপুরাণে আছে—"তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।"

মহাদেবের ধ্যানে আছে—"কর্পূরকুন্দধবলেন্দু জটাধরায়" ইত্যাদি।

আবার একটি শ্যামাস্তবের নাম—'কর্পূরস্তব'—এবং ইহার প্রথম বাক্য 'কর্পূর'।

"কর্পূরং মধ্যমান্তস্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং,
বীজন্তে মাতরেতৎ ত্রিপুরহরবধূ ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি।" ইত্যাদি।

অর্থ—হে মাতা, হরবধূ, যাঁহারা তোমার বীজমন্ত্র ক্রীঁ শব্দটি তিনবার জপ করে, তাঁহারা ইত্যাদি।

অনেকে হয়ত' বলিবেন—সংস্কৃতন্তবে "কর্পূর" শব্দটি রহিয়াছে—কিন্তু অর্থে "কর্পূর" শব্দ গঠিত হয় নাই—তাহার কারণ কি? কারণ এই—

"কর্পূরং মধ্যমান্তস্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং" এখানে কর্পূর শব্দের মধ্য অন্ত স্বর = অর্থাৎ "প" "রং" এবং অ, উ ও অকার পরিত্যাগ করিলে রহিল "ক্র", উহাতে বামাক্ষি—অর্থাৎ "ঈ" এবং "চন্দ্রবিন্দু" যোগ করিলে হইল "ক্রীঁ"—আর এই "ক্রীঁ" শব্দটি বীজমন্ত্র—তাই লিখিত আছে, হে মাতঃ, যাঁহারা "ক্রীঁ" মন্ত্রটি তিনবার জপ করেন ইত্যাদি। তবে এতদ্ শব্দ থাকিতে কর্পূর-শব্দটি কি হেতু গ্রহণ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু তাহা অবান্তর বলিয়া পরিত্যাগ করা গেল।

অতএব ভারতে যে কর্পূর অনেক শতাব্দী যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে অধুনা বড় একটা মতভেদ দেখা যায় না। এমন কি, (Ain-i-Akbari) আইন-ই আকবরি নামক গ্রন্থে আবল্ ফজল স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে—"কর্পূর ভারতবর্ষীয় বৃক্ষ-বিশেষ, ইহা হইতে উপকারপ্রদ অনেক ঔষধ ভারতে বহুকাল যাবৎ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, ইত্যাদি।

তবে ইহাও সত্য যে, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ ভারতবাসী অপেক্ষা অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে কর্পূরের ব্যবহার অবগত ছিল। কারণ উক্ত দ্বীপে কর্পূরের বন আছে এবং ঐ বন বহুদূর অবধি বিস্তৃত এবং উক্ত দ্বীপে কর্পূর আপনা আপনি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মিলনস্থলে ও ফাটল মধ্যে ও বৃক্ষের ত্বকের ভিতর বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। উহা সংগ্রহের জন্য বড় বেশী কষ্ট পাইতে হয় না; সদ্‌গন্ধযুক্ত, সুতরাং সকলের মন আকর্ষণ করে এবং ক্রমে ক্রমে ইহার গুণাগুণও অবগত হওয়া যায়।

সুমাত্রাবাসিগণ বনমধ্যে কোন একটি পুরাতন—(অর্থাৎ ১০।১৫ বৎসরের) সুবৃহৎ "বরস" বা কর্পূরবৃক্ষ দেখিতে পাইলে উহাকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া কর্ত্তন করে—শির, মধ্য ও তল। ইহার কারণ;

মধ্যভাগের কর্পূর সর্ব্বোৎকৃষ্ট, শিরোদেশজাত কর্পূর মধ্যম এবং তলদেশস্থ কর্পূর সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট।

এতৎসম্বন্ধে রাজনিঘণ্টুতে আছে—

"শিরো মধ্যং তলঞ্চেতি কর্পূরস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ
শিরস্তস্তাভ্রসংজাতং মধ্যং পর্ণতলং তলম্।
ভাস্বদ্বিশদং পুলকং শিরোজাতন্তু মধ্যমম্
সামান্যপুলকং স্বচ্ছং তলে চূর্ণন্তু গৌরকম্।
স্তম্ভগর্ভস্থিতং শ্রেষ্ঠ স্তম্ভবাহ্যে চ মধ্যমম্
স্বচ্ছমীষদ্ধরিদ্রাভং শুভ্রং তন্মধ্যমং স্মৃতম্
সুদৃঢ়ং শুভ্রং রুক্ষঞ্চ পুলকং বাহ্যজং বদেৎ।"

অর্থাৎ—শির, মধ্য ও তলজাত ভেদে কর্পূর তিন প্রকার। মধ্যমভাগের কর্পূর সর্ব্বোৎকৃষ্ট, শিরোভাগ-জাত কর্পূর মধ্যম এবং তলজাত কর্পূর নিকৃষ্টতম ও ঈষৎ হরিদ্রাভ। আবার মধ্যস্থ কর্পূর উজ্জ্বল আভাবিশিষ্ট ও উপকারী। উক্ত গাছের ডালের উপর যে কর্পূর হয়, সেই কর্পূর মধ্যম। তলজাত চূর্ণও অস্বচ্ছ, তেমন সুদৃঢ়ও নহে অর্থাৎ (Evaporates) উড়িয়া যায়, এই কর্পূর জলে ফেলিয়া দিলে ডুবিয়া যায়, সুতরাং জলাপেক্ষা ভারী। আর চীন ও জাপান-জাতীয় কর্পূর জলে ভাসে ও শীঘ্র উড়িয়া যায়। যাঁহাদের গ্রন্থে ইহার গুণাগুণ এমন সুবিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে, তাঁহারা যে কর্পূর বহু শতাব্দী যাবৎ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে, উক্ত গ্রন্থমধ্যে লিখিত আছে—

"চীনকশ্চীনকর্পূরঃ কৃত্রিমো ধবলঃ পটুঃ
মেধসারস্তুষারশ্চ দ্বীপকর্পূরজঃ স্মৃতঃ।
চীনকঃ কটুতিক্তোষ্ণ ঈষচ্ছীতঃ কফাপহঃ
কণ্ঠদোষহরো মেধ্যঃ পাচনঃ ক্রিমিনাশনঃ।"

অর্থাৎ—চীনদেশীয় কৃত্রিম কর্পূর (অর্থাৎ স্বভাবজাত নহে পক্ক) ধবল, উজ্জ্বল, আর দ্বীপজ কর্পূর বৃক্ষাভ্যন্তরস্থ সার তুষারের মত। চীনদেশীয় কর্পূর কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ঈষৎশীত, কফনাশক, কণ্ঠদোষহর, পবিত্র, পাচক ও ক্রিমিনাশক।

ইহা হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, ভারতের বণিক-গণ বর্ণিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে গিয়া কেবল যে কর্পূর ক্রয় করিয়া আনয়ন করিতেন, তাহা নহে, কিরূপে সুমাত্রা দ্বীপে, এবং কিরূপেই বা চীনদেশে (তখন জাপান এরূপ সভ্য হয় নাই) কর্পূর প্রস্তুত করিত, সে সমুদয় এদেশীয় বণিকগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। ভারতের বৈদ্যগণ তাঁহাদেরই মুখে ঐ সকল শ্রবণ করিয়া এরূপ সুন্দর ও পরিষ্কার-ভাবে উক্ত বিষয়গুলি নিজ নিজ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, এমন কি, গুণাগুণ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তখনকার সময়ে বণিকগণ, বাণিজ্যে ও বৈদ্যগণ ভেষজবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। সকলেই জাতীয় বৃত্তিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াই ভারতের উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কর্পূরের গুণাগুণ সম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্রে ও কোষাদি গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে

রাজবল্লভে —"কর্পূরং শীতলং পাকে চক্ষুষ্যং কফনাশনম্।
পক্কাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্কঃ গুণবত্তরম্॥"

অর্থাৎ কর্পূর দ্বিবিধ ;—পক্ক ও অপক্ক। যাহা অপক্ক, তাহা শ্রেষ্ঠতর ; উভয়ই শীতলগুণ বিশিষ্ট, তবে পক্ক কর্পূর চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারী ও কফনাশক। ভাবপ্রকাশেও ঐ কথাই লিখিত আছে।

"কর্পূরো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ পক্কাপক্কপ্রভেদতঃ।
পক্কাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্কং গুণবত্তরম্॥"

তবে রাজনিঘণ্টুকার—গুণ, স্বাদ ও বীর্য্যানুসারে ১৪ প্রকার কর্পূরের নামোল্লেখ করিয়াছেন—

"পোতাসো ভীমসেনস্তদনু সিতকরঃ শঙ্করাবাসসংজ্ঞঃ,
প্রাংশুঃ পিঞ্জোঽব্দসারস্তদনু হিমযুতা বালুকা জুটিকা চ।
পশ্চাদস্যাস্তুষারস্তদুপরি সহিমঃ শীতলঃ পক্কিকাস্যা
কর্পূরস্যেতি ভেদা গুণরসমহসাং বৈদ্যদৃশ্যেন দৃশ্যাঃ॥"

অর্থাৎ পোতাস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্করাবাস, প্রাংশু, পিঞ্জ, অব্দসার, হিমযুতা, বালুকা, জুটিকা, তুষার, হিম, শীতল ও পক্কিকা। গুণ, রস ও বীর্য্যানুসারে বৈদ্যগণ কর্পূরের বিভিন্নতা দেখেন।

বলা বাহুল্য, কর্পূর বালুকণার মত দানাবিশিষ্ট, সেইজন্য ইহার নাম বালুকা।

ইহা দেখিতে শুভ্র—সেই জন্য তুষার, সিতকর, হিম, শঙ্করাবাস, প্রাংশু, নাম হইয়াছে; আবার শীতল-গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া শীতল, হিমযুতা, হিম প্রভৃতি নাম।

অন্যান্য কোষে চন্দ্রের যতগুলি নাম আছে, কর্পূরের নামও ততপ্রকার; কারণ, ইহা দেখিতে চন্দ্রের মত। যথা—"কর্পূরমস্ত্রিয়াং ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ সিতাভ্রো হিমবালুকা" ইতি—অমরকোষঃ।

আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও কর্পূরকে দুই প্রকার বলিয়া গণ্য করেন।

১ম। চীন ও জাপানজাত কর্পূর।

২য়। বর্ণিও ও সুমাত্রাদি দ্বীপজাত কর্পূর।

ডিমক্ সাহেব বলেন, চীন ও জাপানজাতীয় কর্পূর—"সিন্‌মোমাম্ কেম্ফোরা" নামক বৃক্ষসার মাত্র; আর সুমাত্রা ও বর্ণিও দ্বীপজাত কর্পূর "ড্রাইও বোলানপ্স এরোমেটিকা" নামক বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন। ইহা

বৃক্ষের মজ্জামধ্যে আপনিই জন্মে। সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন মতে পক্ক ও অপক্ক এই দুই প্রকার বিভাগ ন্যায্য ও সঙ্গত। তবে আজকাল বিশুদ্ধ কর্পূর ভারতে বড় আসে না। যাহাও আসে, তাহা আবার বোম্বাই প্রদেশে জলমিশ্রিত করিয়া ভারী করে ও অন্যান্য দ্রব্য ভেজাল দিয়া আরও অবিশুদ্ধ করিয়া তবে অন্যান্য প্রদেশে প্রেরিত হয়।

সুতরাং এই বঙ্গদেশে যে সমুদয় কর্পূর আসে, তাহা আদৌ বিশুদ্ধ নহে। একে চীন ও জাপান হইতে বিশুদ্ধ কর্পূর আসে না, তাহার উপর বোম্বাই প্রদেশে আরও ভেজাল দেওয়া হয়। আর আমরা তাহাই দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করিয়া বিক্রয় করি এবং বৈদ্যগণ ইহা হইতেই ঔষধ প্রস্তুত করেন। ঔষধের গুণও তদ্রূপ হয়। সুতরাং আবার যদি আমরা বিশুদ্ধ কর্পূর পাইতে চাই, তবে আমাদিগকে চীন, জাপান ও সুমাত্রা দ্বীপজাত কর্পূর আনয়ন করিতে হইবে। অন্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

কর্পূর প্রস্তুত করিবার প্রণালী

১ম। বর্ণিও ও সুমাত্রা দ্বীপজাত কর্পূর।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে যে কর্পূর-বৃক্ষ জন্মে, তাহাকে উক্ত দ্বীপবাসীরা "বরস" বৃক্ষ বলে। ল্যাটিন নাম—"ড্রাইওবেলানপ্স এরোমেটিকা"। বর্ণিও দ্বীপেও এই জাতীয় কর্পূরবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ভারত-মহাসাগরস্থিত অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জেও এই বৃক্ষ দেখা যায়। কিন্তু সংখ্যায় তত অধিক নহে, এই জন্য অন্যান্য দ্বীপজাত কর্পূর বড় একটা ভারতে আমদানী হয় না।

উক্ত বৃক্ষ ৫।৭ বৎসরের বড় না হইলে তন্মধ্যে কর্পূরের দানা বাঁধে না। বৃক্ষ যতই পুরাতন হয়, ততই তন্মধ্যে অধিক পরিমাণে

কর্পূর পাওয়া যায়। ১০ বা ১২ বৎসরের বৃক্ষমধ্য হইতে /৫॥০ বা /৬ সের আন্দাজ কর্পূর বাহির হয়। সুমাত্রাবাসীরা যেরূপে কর্পূর সংগ্রহ করে, তৎসম্বন্ধে Mr Macdoland মেকডোলাণ্ড সাহেব বলেন—সুমাত্রা-দ্বীপবাসিগণ কর্পূর সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে নানাপ্রকার দৈবানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, দৈবানুগ্রহ ব্যতিরেকে অধিক পরিমাণে কর্পূর পাওয়া যায় না। তাহার পর বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পুরাতন কর্পূরবৃক্ষগুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া—তীক্ষ্ণঅস্ত্র দ্বারা কাহারও স্কন্ধদেশ, কাহারও তলদেশ, কাহারও বা শাখা-প্রশাখা বিদ্ধ করিয়া দেখে, তন্মধ্য হইতে কিরূপ পরিমাণে তৈল বাহির হয়। কারণ, যে সকল বৃক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈলস্রাব হয়, সেইগুলির মধ্যেই অধিক পরিমাণে কর্পূরদানা পাওয়া যায়।

যে' বৃক্ষগুলিতে অধিক তৈলস্রাব হয়—একে একে সেই সকল বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া উৎপাটিত করে। পরে উহার শাখা ও গুঁড়িগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া, তন্মধ্য হইতে অতি সাবধানে কর্পূর দানা বাহির করিয়া লয়।

পুরাকালে সুমাত্রাদ্বীপবাসীরা প্রত্যেক কর্পূর-বৃক্ষ তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিত; যথা—শির, মধ্য ও তলদেশ। এবং প্রত্যেক অংশ হইতে যতটুকু করিয়া জমাট কর্পূর বাহির হইত, তাহা পৃথক্ করিয়া রাখিত এবং বিক্রয়ের সময় বিভিন্ন মূল্যে বিক্রয় করিত। এখন কিন্তু তাহারা সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। সুতরাং এক্ষণে সুমাত্রাজাত কর্পূর একপ্রকারেই বলিয়া বিক্রীত হয়।

অধুনা এক একটি বৃক্ষে অন্ততঃ ৫।৭ সের করিয়া কর্পূর বাহির হয়। তৎপরে সংগৃহীত কর্পূরকে পরিষ্কার করিবার জন্য সাবানের জলে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিয়া পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য, তাহা হইলে

কর্পূরের রং বেশ উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ-বিশিষ্ট হইবে এবং উহার ভিতর হইতে অন্যান্য দ্রব্য বাহির হইয়া যাইবে।

তাহার পর চালুনি দ্বারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া শির, উদর ও পাদ—এই তিন নাম দিয়াও কখনও কখনও বিক্রয় করিয়া থাকে। কারণ, দানা যত বড় ও শুভ্র হয়, মূল্যও তত অধিক হয়, এবং উদরজাত বলিয়া আরও অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। প্রকারের তবে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে না পারিলে তাহারা তিন কর্পূর একত্র করিয়া চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রেরণ করে।

আজকাল ঐ সকল কর্পূর অধিকাংশ য়ুরোপবাসীরা ক্রয় করিয়া লইয়া যায় এবং নিজ নিজ দেশে সংশোধিত করিয়া পুনরায় ভারত ও অন্যান্য দেশে বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া, অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজ নিজ দেশের ধনবৃদ্ধি করিতেছে। আর আমরা য়ুরোপীয় কর্পূর-জ্ঞানে অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে দ্বিধা বোধ করি না।

ডিমক প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে বর্ণিও ও সুমাত্রা হইতে যে কর্পূর আসে, তাহাকে ভারতীয়গণ "ভীমসেনী" কর্পূর বলিয়া অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে।

আজকাল বর্ণিও ও সুমাত্রাজাত বিশুদ্ধ কর্পূর ২০০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা সের দরে বিক্রীত হয় এবং অপেক্ষাকৃত হীনশ্রেণী কর্পূরের মূল্য ১০০৲ হইতে ১৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উক্ত কর্পূর জল অপেক্ষা অনেক ভারী, তজ্জন্য ঐ কর্পূর জলে ডুবিয়া যায়। সাধারণ কর্পূরের মত জলে ভাসে না এবং সহজে উড়িয়া (Evaporate) যায় না; কিম্বা বোতলে রাখিলে বোতলের গায়ে জমিয়া যায় না। অধিকন্তু এই কর্পূরকে দ্রব করিতে হইলে

অধিক উত্তাপের আবশ্যক। এই সকল কারণেই "ভীমসেনী" কর্পূরের এত আদর ও এত অধিক মূল্য।

২য়—চীন, জাপান ও ফরমোজাজাত কর্পূর

চীন, জাপান বা ফরমোজা দ্বীপের বৃক্ষগুলি আকৃতিতে তেমন বড় হয় না। উহা গুল্ম-বিশেষ, এবং এই বৃক্ষ অধিক বৎসরের পুরাতন হইলেও তন্মধ্যে কর্পূরের দানা জমাট বাঁধে না। সুতরাং এই সকল বৃক্ষের শাখা ও গুঁড়ি প্রত্যেক অংশের কাষ্ঠগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিয়া, পরে বড় বড় মাটির হাঁড়ায় জল দিয়া তন্মধ্যে কাষ্ঠগুলি ভিজাইয়া দেয়। তৎপরে বড় বড় উনান তৈয়ারী করিয়া উহার উপর মাটির হাঁড়াগুলি বসাইয়া দেয় এবং ২।৩ দিন ধরিয়া ক্রমাগত আগুনের জ্বাল দিতে থাকে। উত্তাপ পাইয়া বৃক্ষকাষ্ঠের মধ্য হইতে একপ্রকার শুভ্র-বর্ণের রস বহির্গত হইতে থাকে। তাহার পর যখন দেখা যায় যে, রস আর নির্গত হইতেছে না, তখন আগুন সরাইয়া লয় এবং উত্তপ্ত জল ক্রমে ক্রমে শীতল হয়। শীতল জলে কর্পূর কাচের মত ভাসিতে থাকে। তখন ঐগুলি একত্র করিয়া শুকাইতে আরম্ভ করে। তবে অধিক শুষ্ক হইলে উড়িয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য তরল অবস্থায় বড় বড় চতুষ্কোণ বা পিপাকৃতি টবের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলে। উহাই উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া নানা দেশবিদেশে প্রেরিত হয়। ইহাকেই—পক্ক অর্থাৎ জ্বাল দেওয়া কর্পূর বলে।

আজকাল জাপানীরা উক্ত কর্পূরের দ্রবকে বিশুদ্ধ করিয়া ছোট ছোট চাকৃতির মত করিয়া মধ্যছিদ্র গোলাকার টুক্‌রারূপে ভারতে প্রেরণ করে। ইহা চীনা কর্পূর অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ এবং মূল্যেও অধিক। ইহা শীঘ্র উড়িয়া যায় না। বিশুদ্ধ জাপানী কর্পূর টিনমোড়া-বাক্সে আসে। এক একটি বাক্সে প্রায় দুই সের তের চৌদ্দ ছটাক কর্পূর থাকে। ইহাকে

লোকে সচরাচর টিন-কর্পূর বলিয়া থাকে। আবার জাপানী কর্পূর অবিশুদ্ধ হইলেও দানাদার বটে এবং জড়াইয়া পিণ্ডাকার হয় না। চীনদেশীয় কর্পূরের মত উহা তরল নহে—শুষ্ক। সেই জন্য জাপানী কর্পূরের আদর আছে।

চীনদেশীয় কর্পূর টবে আসে, সেই জন্য ইহাকে টবকর্পূর বলে। ইহা ডবল টবের মধ্যে প্রেরিত হয়। এই টবের ভিতর টিন দেওয়া থাকে। জল-সংযুক্ত তরল অবস্থার কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, এইরূপ অবস্থায় কর্পূর উড়িয়া যায় না। অবিশুদ্ধ চীনক-কর্পূর ঈষৎ শুভ্র বা কটা রঙের দানাদার বস্তু। এক এক বাক্সে ১ মণ ১৬ সের আন্দাজ ওজনে থাকে।

কর্পূর ঔষধরূপে

চক্রদত্ত বলেন :—

"কর্পূর-পূরিতং বদ্ধং সঘৃতং সংপ্ররোহতি।
সদ্যঃ শস্ত্র-ক্ষতং পুংসো ব্যথাপাক-বিবর্জ্জিতম্ ॥"

অর্থ—কোন স্থান শস্ত্রে কাটিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ গব্যঘৃত সহ কর্পূর-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, সেই ক্ষত পূরণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে পাক ও ব্যথা জন্মিতে পারে না ; পরন্তু ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে।

ভাবপ্রকাশমতে :—

"বহুশো গোময়ৈস্তপ্তৈঃ স্বেদিতং পরিলেহিতম্।
ঘনসারৈঃ সমালিম্পেদজামূত্রেণ কল্কিতৈঃ ॥"

অর্থ—কাণের পাতায় বহুরসস্রাবী ক্লেদযুক্ত যে একপ্রকার ক্ষত দেখা যায়, তাহাকে পরিলেহী বলে। এই রোগে তপ্ত গোময়ের পুঁটুলী করিয়া স্বেদ দিয়া, ছাগমূত্রে কর্পূর-চূর্ণ পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে দিলে আরোগ্যলাভ হয়।

বঙ্গসেনে আছে—

"বটক্ষীরেণ সংযুক্তং শ্লক্ষ্ণকর্পূরজং রজঃ।
ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি চক্ষুশুক্রং ঘনোন্নতম্॥"

অর্থ—কর্পূরকে সূক্ষ্ম করিয়া চূর্ণ কর এবং বটের আটায় সিক্ত করিয়া নয়নাঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে চক্ষু-শুক্ররোগ আরোগ্য হয়।

কবিরাজীমতে কর্পূর কামোদ্দীপক, কিন্তু হকিমীমতে কাম দমন করে বলিয়া বর্ণিত হয়। আবার ডাক্তারী মতে কামোদ্দীপক বটে; কিন্তু অধিক দিন ব্যবহারে বা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে অবসাদ আসে।

ডাক্তারেরা বলেন—বাহ্য প্রয়োগে ত্বকের লৌহিত্য উৎপাদন করে অর্থাৎ ঘষিলে চর্ম্ম যেরূপ লাল হয়, কর্পূর প্রয়োগেও সেইরূপ হয়— Rubefaceint ইহাতে শোথ কমিয়া যায়।

যথামাত্রায় ব্যবহার করিলে ইহা হৃদ্‌রোগে উপকারী, নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস ও রক্তচলাচল সম্বন্ধে উপকার পাওয়া যায়।

স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করিলে গর্ভাশয়ের উত্তেজনা হয় ও স্রাব বৃদ্ধি করে।

কর্পূর-তৈল দিয়া মালিশ করিলে বেদনা নাশ হয়।

কর্পূর ভক্ষণ করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রতা উৎপাদন করে এবং অধিকমাত্রায় সেবন করিলে পাকস্থলী-প্রদাহ জন্মে; অধিকন্তু ঘর্ম্ম নিঃসারিত হয়। এমন কি, হৃদ্‌রোগ উৎপাদন করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটায়। পিচকারীতে করিয়া গুহ্যদেশে দিলে কৃমি নাশ করে। দন্তরোগে কর্পূর বিশেষ উপকারী এবং নাসারোগেও উপকার হয়। (Olive) অলিভ তৈলের সহিত কর্পূর-চূর্ণ ব্যবহার করিলে বাত ও অন্যান্য রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ৪ ভাগ তৈল ও ১ ভাগ কর্পূর দিবেন।

কর্পূর বিশুদ্ধ করিবার প্রক্রিয়া

য়ুরোপ কর্পূর-বৃক্ষ জন্মে না বটে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা চীন, ফরমোজা বর্ণিও, সুমিত্রা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে অবিশুদ্ধ কর্পূর ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, এবং নিজ নিজ দেশে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাই আবার বিশুদ্ধ করিয়া ভারতে এবং অন্যান্য দেশে প্রেরণ করিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। আর আমরা কর্পূর কি পদার্থ, কোথায় কোথায় জন্মে এবং কিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা বিশুদ্ধ করিতে হয়, তাহাও ভুলিয়া গিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ লোপ করিয়া দিয়াছি।

য়ুরোপীয়েরা যে অবিশুদ্ধ কর্পূর ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া লয়। তাহার পর ঐ চূর্ণ কর্পূরে ৩/১০০ বা ৫/১০০ অর্থাৎ শতকরা ৩ বা ৫ ভাগ গুঁড়া চুণ ও শতকরা ১ বা ২ অংশ লৌহ-চূর্ণ মিশাইয়া লয়। সুন্দররূপে মিশান হইলে ঐ চূর্ণ কাচের লম্বা লম্বা বোতলে পুরিয়া ফেলে এবং বোতলগুলি একে একে বালির মধ্যে পুঁতিয়া রাখে। তাহার পর উহার তলদেশে উত্তাপ দিতে থাকে। পাছে আগুনের উত্তাপে জ্বালিয়া উঠে, সেই জন্য বালির নিম্নে একটা ঘরের মত করিয়া সেইখানে উত্তপ্ত লৌহপাত্র সারি সারি সাজাইয়া রাখে এবং লৌহপাত্রগুলি ক্রমেই বেশী উত্তপ্ত করে। প্রথম প্রথম উহার উত্তাপ ১২০° ডিগ্রী হইতে ১৯০° পর্য্যন্ত রাখে। অর্দ্ধঘণ্টাকাল ঐরূপ উত্তাপে রাখিয়া লৌহপাত্রগুলি ক্রমে ক্রমে ২০৪° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া ফেলে এবং এই উত্তাপে ২৪ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত রাখে। তখন কর্পূর একেবারে গলিত হইয়া তরল হইয়া পড়ে। তাহার পর বোতলের মুখের খানিকটা অংশ খালি করিয়া তন্মধ্যে কাগজের ছিপি লাগাইয়া দেয়। এইরূপ করিবামাত্র বোতলের উপরের ভাগটা কিছু শীতল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে বাষ্প বাহির হইতে পারে না—তখন কর্পূরের যত অবিশুদ্ধ অংশ থাকে, তাহাই বোতলের

তলদেশে নামিয়া পড়ে। অর্থাৎ কাদার মত যত কিছু গাদ বোতলের তলায় পড়িয়া যায়, আর উপরিভাগে বাষ্পরূপে বিশুদ্ধ কর্পূর অবস্থিতি করে। বাষ্প বাহির হইতে না পারিয়া এবং উপরিভাগ নিম্নভাগ অপেক্ষা শীতলতর হওয়ায় বাষ্পভাগ জমিতে থাকে এবং বাতাস না পাওয়ায় ইহা স্বচ্ছ জমাট হইয়া যায়। এই সময়ে প্রত্যেক বোতলের মুখে একটি একটি করিয়া কাচের ঢাকন দিয়া চাপা দেয়। ৪৮ ঘণ্টা আন্দাজ এইরূপ-ভাবে রাখিলে সমস্ত বাষ্প জমাট বাঁধিয়া যায়। তখন ঐ বোতলের মুখে শীতল জলের ছিটা দিতে থাকে। উত্তপ্ত কাচের উপর হঠাৎ শীতল জলের ছিটা লাগায় বোতলের মুখ ফাটিয়া যায়। তখন একে একে জমাট কর্পূরগুলি বোতলের মধ্য হইতে বাহির করিয়া লয়। ঐ জমাট কর্পূর প্রায় ১০ বা ১২ ইঞ্চি ব্যাস ও তিন ইঞ্চি মোটা হয়, অর্থাৎ বোতলের মত মোটা হয়, এক একটি কর্পূরের ডালা ওজনে প্রায় ৴৫৷৷০ হইতে ৴৬ সের পর্য্যন্ত হয়।

বলা বাহুল্য, উত্তাপ ঠিক করিয়া দিতে হয়। উত্তাপ দিবার দোষগুণের উপরই সমস্ত নির্ভর করে। বোতলের তলদেশে যে সমস্ত কাদা জমে, তাহাতে কতকটা ভাগ ধুনা, কতকটা ভাগ গন্ধক দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে কয়লা দিয়া রং অতি শুভ্র করিয়া লয়। বালির মধ্যে পুতিয়া রাখায় এবং যে সময় কাগজের ছিপি লাগাইয়া দেয়, সে সময় কিছু কিছু বালুকণা বোতলের মধ্যে প্রবেশ করে, ইহার ফলে বাষ্পভাগ বাহির হইতে পারে না। এ সমস্তই অতি সাবধানে সম্পন্ন করিতে হয়। বিশেষতঃ যাহাতে বাষ্পভাগটা জলিয়া না যায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

জানি না, কতদিনে আমরা কর্পূর বিশুদ্ধ করিয়া এ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া নিজে ধনী হইব এবং দেশের লোককে বিশুদ্ধ কর্পূর প্রদান করিয়া

ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিতে পারিব। আমাদের দেশের আচার্য্য পি, সি, রায় মহাশয় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে অনেকে ইহা শিক্ষা করিয়া প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতে পারে।

৭ বৎসরে কত টাকা মূল্যের কর্পূর ভারতে আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে, তাহার তালিকা

বৎসর খৃষ্টাব্দ	আমদানী		রপ্তানী	
	ভীমসেনী মূল্য টাকা	অন্যান্য টাকা	ভীমসেনী টাকা	অন্যান্য টাকা
১৮৭৯-৮০	২০,৯০৯	৫,৩৪,০০১	২,৩১৬	২৩,১৭৪
১৮৮০-৮১	২২,৯২৪	৫,৫৩,৭৩২	১৪০	২৬,৫৫৯
১৮৮১-৮২	৩৮,৫৭৪	৫,৫২,৩৩৫	১,৬৪০	২১,১৩৮
১৮৮২-৮৩	৪৩,৬১৮	৪,৬৮,৭৯৪	৫২৯	২৫,২৩১
১৮৮৩-৮৪	৩৮,৫৭৯	৬,২৭,২৭৮	৭৯০	২৮,৭৩০
১৮৮৪-৮৫	৩৫,৫০১	৬,৮৩,৩৩৩	২৭০	১৩,৪৩২
১৮৮৫-৮৬	২৫,৯৪৪	৬,৫৩,৫৪৫	...	১৬,৭৭৯

উল্লিখিত তালিকা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে কত লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা এক কর্পূরের কারবারের উপর নির্ভর করে। তবে ইহাতে বাঙ্গালীর কিছু লভ্য নাই। হয় বিদেশী বণিকগণ, না হয় বোম্বাইয়ের বণিকেরা ইহার উপস্বত্ব উপভোগ করিয়া থাকে। আমাদের

লাভ হওয়া ত' দূরের কথা, কর্পূর কারবারে যে এত আয় হয়, তাহাও জানি না এবং জানিবার চেষ্টাও করি না। তথাপি আমরা বণিক্ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি এবং আমরা বৈশ্য বলিয়া উপবীত ধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠি। কেবল উপবীত ধারণ করিলেই বৈশ্য হয় না। আমরা যে বৈশ্য, তাহা কত দিনে কার্য্যতঃ প্রমাণ করিতে পারি, সেই দিকে লক্ষ্য রাখাই এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য। উপবীত-ধারণ ত' অর্থ খরচ করিলেই হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ বৈশ্যত্ব প্রমাণ করা অনেক চেষ্টা ও যত্নের ফল।

কর্পূর আমদানী

এক বঙ্গদেশে	১৯১৯-১৯২০	খৃষ্টাব্দে	৪,৯৭,৫৩০৲	টাকার কর্পূর
	১৯২০-২১	"	৩,৮০,৭৭০৲	"
	১৯২১-২২	"	৬,৪৪,৭৮৮৲	"
	১৯২২-২৩	"	৫,২২,৩৪৯৲	"

অর্থাৎ বৎসরে চার কোটি হইতে সাত কোটি টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের কর্পূর ভারতে আমদানী হয়।

কর্পূর-তৈল আমদানী

১৯২০-২১	খৃষ্টাব্দে	১৭,৭৭০৲
১৯২১-২২	"	১৪,৫০১৲
১৯২২-২৩	"	৩০, ৭২১৲

আর কর্পূর-তৈল বৎসরে ২০-২১ হাজার টাকার অধিক আমদানী হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবৎসর ভারতে প্রায় কোটি কোটি টাকার কর্পূর ও কর্পূর-তৈলের আমদানী হয়। ইহাতে বিদেশী বণিক্গণই লাভবান্ হয়েন। আর আমরা খুচরা বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাই,

লাভ যত হউক না হউক, বদনামই অধিক মাত্রায় হয়; কারণ, আমরা মহাজনের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বাজারে খুচরা বিক্রয় করি। বোম্বাইয়ের মহাজনেরা ইহাতে নানাপ্রকার ভেজাল দিয়া আমাদিগকে বিক্রয় করে; সুতরাং বদনাম আমাদের—লাভ অন্যের।

আবার দেখুন—১৯০০ খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে ৭৩৪ টন, চীন হইতে ৯৮ টন ও ফরমোজা হইতে ২৬৪০ টন ভারতে আমদানী হইয়াছিল। ১ টনে প্রায় ২৮ মণ ওজন হয়।

অনেকের বিশ্বাস যে, আমাদের ভারতবর্ষে কর্পূর-বৃক্ষ জন্মে না। তাহা সত্য নহে। ডিমক সাহেব বলেন, তিনি বোম্বাই প্রদেশে একপ্রকার কর্পূর-বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন—কিন্তু তৎপ্রদেশস্থ লোকেরা ইহা হইতে কর্পূর বা তৈল প্রস্তুত করে না; কেবল পোকা ও মাছি নষ্ট করিবার জন্য উক্ত বৃক্ষের পত্র ঝুলাইয়া রাখে।

আর আমাদের এই বঙ্গদেশে নারাঙ্গা নেবু হইতে, তামাকের পাতা হইতে ও নিম্পফিলা নামক বৃক্ষ হইতেও কর্পূর-তৈল প্রস্তুত হইতে পারে এবং পাচুলা নামক বৃক্ষ হইতে সার বাহির করিলে উত্তম কর্পূর-তৈল উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু আমরা কিছুই প্রস্তুত করিতে জানি না।

কলিকাতা বোটানিকেল উদ্যানে (Botanical Garden) কর্পূর-বৃক্ষ আছে, ইহা হইতে অনুমান হয়, যত্ন করিলে আমাদের বঙ্গদেশে কর্পূর-বৃক্ষের চাষ হইতে পারে।

লক্ষ্ণৌ নগরের কৃষি উদ্যানে (Lucknow Horticultural Garden) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কর্পূর-বৃক্ষের চাষ করিয়া তত্রস্থ ইংরাজগণ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতে কর্পূর-বৃক্ষের চাষ উত্তমরূপে হইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন সাহারাণপুর, দেরাদুন, নীলগিরি পর্ব্বত এবং হিমালয়-প্রদেশে ৯০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে কর্পূর-বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে আপনা আপনি

জন্মিতেছে এবং শুষ্ক হইয়া যাইতেছে ; কেহ বা তাহা হইতে কর্পূর প্রস্তুত করে, কেহ বা তৈল বাহির করে !

ডিমক সাহেব বলেন, এক ব্রহ্মদেশ ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে যে পরিমাণে কর্পূর-বৃক্ষ জন্মে, তাহা হইতে পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও অধিক ভাগের আবশ্যকমত কর্পূর প্রস্তুত হইয়া সকলের অভাব দূর করিতে পারে। তবে ভারতবাসী ও ব্রহ্মবাসীরা কর্পূর বা কর্পূর-তৈল প্রস্তুত করিতে জানে না, চেষ্টাও করে না।

এইরূপে আমরা কর্পূর সম্বন্ধে যতই নিগূঢ় তথ্য জানিবার জন্য ব্যস্ত ও উদ্‌গ্রীব হই, ততই আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আমরা যত্ন ও চেষ্টা করিলে আমাদের দেশে কর্পূর প্রস্তুত করিয়া ও কর্পূর-তৈল বাহির করিয়া অন্যান্য দেশে চালান করিতে পারি, এবং কর্পূরের ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ করিতে পারি। আর অবিশুদ্ধ কর্পূরকে বিশুদ্ধ করিয়া বহু অর্থও অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই। অভাব বৃক্ষের নহে, অভাব দ্রব্যের নহে, অভাব কেবল আমাদের যত্ন ও চেষ্টার।

হয়ত প্রথম প্রথম লাভ না হইতে পারে, হয়ত বা প্রথম কিছুদিন উৎকৃষ্ট কর্পূর প্রস্তুত করিতে সমর্থ না হইতে পারি ; কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, যদি আমরা অদম্য উৎসাহের সহিত এই বিষয়ে লিপ্ত হইয়া থাকি, তবে অচিরে আমরাও জাপানীগণের ন্যায় কর্পূর-ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হইতে সমর্থ হইব।

জানি না, কত দিনে আমাদের গন্ধবণিক্ বালকগণ এই কর্পূর-বৃক্ষের চাষ, কর্পূর প্রস্তুত ও তৈল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়া নিজে ধন্য হইবে এবং দেশের ও দশের মঙ্গল করিতে সমর্থ হইবে।

যুষ্ বা ক্কাথ

আমাদের ধারণা, যুষ্ শব্দটি ইংরাজী Juice শব্দ ; সুতরাং মাংসের যুষ—বিলাতী খাদ্য বলিয়া ধারণা আছে। যুষ ধাতু ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী, লট্ যুষতি ··

কিন্তু অভিধানে দেখা যায় যুস = যুষ + ক

মুদগাদি ক্কাথরস, মুদগাদির ঝোল। মৎস্যাদির যে ঝোল হয়, তাহাকে যুষ কহে।

যুষ বহুপ্রকার

১। **দাইল-যুষ**—দাইল ভাজিয়া তাহার তুস, (খোসা) ফেলিয়া দিবেন। পরে চারিভাগ জলে ইহা সিদ্ধ করিয়া, উহাতে লবণাদি মিশ্রিত করিয়া, উত্তমরূপে নিষ্পীড়ন করিয়া ছাঁকিয়া লইলে দালের যুস্ প্রস্তুত হয়।

"বৈদলান্ বিতুষান্ ভৃষ্টান্ চতুর্ভাগাম্বুসাধিতান্।
নিষ্পীড্য তোযমেতেষাং সংস্কৃতং যুস উচ্যতে॥"—পর্য্যায়সূত্র।

২। **মুদগ-যুষ**-বিষয়ে সুশ্রুতে লিখিত আছে—কফনাশক, অগ্নিকর, বমন ও বিরেচন দ্বারা শুদ্ধশরীর ব্যক্তিদিগের মুখপ্রিয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। তাহার উপর দাড়িম ও দ্রাক্ষা-রস-সংযোগে প্রস্তুত হইলে তাহাকে রাগষড়ব কহে। মসূর, মুদগ ও কুলত্থ লবণ সংযোগে প্রস্তুত হইলে রুচিকর, লঘুপাক ও দোষের অবরোধী হয়। ইহা কফ ও পিত্তের অবরোধী। বাতব্যাধির পক্ষে বিশেষ উপকারী। বায়ুরোগীর পক্ষে সুপথ্য, রুচিকর, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় ও লঘুপাক।

৩। **পটোল ও নিম্বের যুষ**—কফঘ্ন, মেদঃশোধক, পিত্তনাশক, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় এবং কৃমি, কুষ্ঠ ও জ্বর-নাশক।

৪। **মূলকের যুষ**—শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, প্রসেক, অরুচি ও জ্বরনাশক এবং কফ মেদ ও গলরোগে বিশেষ উপকারী।

৫। **কুলত্থের যুষ**—বায়ুনাশক এবং শ্বাস, পীনস, কাস, অর্শ, গুল্ম ও উদাবর্ত্ত রোগে হিতকর। দাড়িম ও আমলা দ্বারা উহা প্রস্তুত হইলে মুখপ্রিয়, সর্ব্বদোষের শমনকারী ও লঘুপাক হয়।

৬। **মুথা ও আমলকীর যুষ**—বলকারক, পিত্তজনক, মূর্চ্ছা ও মেদোনাশক, পিত্ত ও বায়ু-দমনকারী, সংগ্রাহী এবং বায়ু ও পিত্তের হিতকর।

৭। **যব, কুল ও কুলত্থের যুষ**—কণ্ঠশোধনকর ও বায়ুনাশক।

৮। **মুগ ও মাষী ধান্যের যুষ**—কণ্ঠশোধক, বায়ুনাশক, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক।

এই সকল যুষ আবার দুই প্রকার ;—কৃত ও অকৃত যুষ।

যেগুলি তৈল, লবণ, ঘৃত ও ঝাল দ্বারা প্রস্তুত না করা হয়, তাহাকে অকৃত যুষ বলে। আর যেগুলি তৈল, লবণ, ঝাল সংযুক্ত করিয়া প্রস্তুত হয়, তাহাকে কৃতযুষ বলে। তদ্‌ভিন্ন যেগুলি দধি, মণ্ড ও অম্ল দ্বারা পক্ব হইয়া রস প্রস্তুত হয়, তাহাকে কাম্বলী যুষ কহে।

৯। **মাংসের যুষ**—তৃপ্তিকর, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগনাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকারক, সাংঘাতকর এবং শুক্র ওজঃ ও বলবর্দ্ধক।

—সুশ্রুত, ৪৫ অঃ।

অন্য দিকে ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

"অষ্টাদশগুণে নীরে শমীধান্য-শৃতে রসঃ।
সিক্থহীনে ঘনঃ কিঞ্চিৎ পেয়াচ্চ যুষ উচ্যতে॥"

শমীধান্য (মুগ মসুর প্রভৃতি)—আঠার গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিলে—সিক্থ (অর্থাৎ সিট)-বিরহিত অথচ পেয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে যুষ বলা যায়।

উক্তঃ স এব নির্যূহো রুচিকৃচ্চ বিশেষতঃ। ইহা রুচিকর।

আর শুণ্ঠী অর্দ্ধতোলা ও পিপ্পলী অর্দ্ধতোলা একত্র চারি সের জলের সহিত পাক করিয়া যখন চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে যুষ কহে।

ইহা বলকারক, লঘুপাক, রুচিকারক, কফশোধক এবং কফনাশক।

হারীতেও যুষের বিধি ও গুণের বিষয় লিখিত আছে।



তুলসী

হিন্দুর বিশ্বাস—

"তুলসী-আরাম যেই করিয়া রোপণ।
ত্রিসন্ধ্যা স্তবন করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দন ॥
তারে তুষ্ট হন প্রভু দেব জগৎপতি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাপতি ॥" কাশীদাস মহাভারত।

তাই আমরা প্রত্যহ প্রাতে দেখিতে পাই, ভক্তপ্রবর বৈষ্ণবগণ অতি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়াই সর্ব্বাগ্রে তুলসী-বৃক্ষে জলসেচন করিতে করিতে বলেন—

"গোবিন্দ-বল্লভাং দেবীং জগচ্চৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং হরিভক্তি প্রদায়িনীম্ ॥"

আবার ভক্তি-সহকারে তুলসী পরিক্রমণ করিতে করিতে সুমধুর-স্বরে গান করিয়া বলেন—

"নমঃ নমঃ তুলসী মহারাণী তুলসী মহারাণী বৃন্দা মহারাণী।
যাকো পত্র মঞ্জরী কমল শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি।
ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন বিনা তুলসী কভু একো ন মানি।
শিব সনকাদি আরো ব্রহ্মাদিকো চলত ফিরত কিয়ে করপাণি।

(শালগ্রাম-পাটরাণী)

চন্দ্রসখি মায়ে তেরি যশো গাওয়ে ভকতি দিয়ে পাটরাণী।
তুলসী মহারাণী বৃন্দা মহারাণী মহিমা তব বেদপুরাণে বাখানি ॥
নমঃ নমঃ তুলসী মহারাণী"·····ইত্যাদি।

অবশেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলেন—

"নমস্তুলসি সর্ব্বজ্ঞে পুরুষোত্তম-বল্লভে।
পাহি মাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িকে॥"

এত রকম বৃক্ষ থাকিতে তুলসীর মাহাত্ম্য এত কিরূপে হইল, বলা বড় কঠিন। তবে তুলসী শব্দের আভিধানিক অর্থ—যাহার সাদৃশ্য আর নাই, (তুলা+সো+ড+ঈপ্) আর হিন্দুর বিশ্বাসও তুলসী-বৃক্ষের ন্যায় পূতবৃক্ষ আর নাই। কারণ, শাস্ত্রে আছে—

"যস্যা দেব্যাঃ সমো নাস্তি বিশ্বেষু নিখিলেষু চ।
তুলসী তেন বিখ্যাতা পবিত্রা বিশ্বপূজিতা॥"

এবং শাস্ত্র আরও বলেন—

"তুলস্যাং সকলা দেবা বসন্তি সততং যতঃ।
অতস্তামর্চ্চয়েল্লোকে সর্ব্বান্ দেবান্ সমর্চ্চয়ন্॥"

শুদ্ধ যে বৃক্ষ পবিত্র, তাহা নহে—ইহার মূলও পবিত্র, কারণ, ইহার মূলে সর্ব্বতীর্থের অধিষ্ঠান—

"তুলসী-তরুমূলে চ পুণ্যদেশে সুপুণ্যদে।
অধিষ্ঠানন্তু তীর্থানাং সর্ব্বেষাঞ্চ ভবিষ্যতি॥"

আর ইহার পত্রের ত' কথাই নাই—সহস্রঘট সুধাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ, শ্রীহরি ইহাতেই সন্তুষ্ট।

"সুধাঘট-সহস্রেণ যা তুষ্টির্ন ভবেদ্ধরেঃ।
সা চ তুষ্টির্ভবেন্নৃনাং তুলসীপত্রদানতঃ॥"

নিত্য তুলসীপত্র দ্বারা পূজনের ফল—

"নিত্যং যস্তুলসীং দত্ত্বা পূজয়ন্মাঞ্চ মানবঃ।
লক্ষাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়॥"

অন্তিম-শয়নে যে মানব গণ্ডূষমাত্র তুলসীপত্র-তোয়পান করিতে পান, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

"তুলসী-পত্র-তোয়ঞ্চ মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপাচ্চ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥"

তুলসী-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা ধারণে পদে পদে অশ্বমেধতুল্য ফললাভ হয়।

"তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিতাং মালাং গৃহ্লাতি যো নরঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্ ॥"

অপরদিকে শাস্ত্রের আদেশ,—তুলসী-পত্র হস্তে লইয়া মিথ্যালাপ করিবে না। কারণ—

"করোতি মিথ্যা-শপথং তুলস্যা যো হি মানবঃ।
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশাঃ ॥"

পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী-তিথিতে, রবিবারে, তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে, স্নান করিতে করিতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যাকালে ও নিশাগমে অথবা অশৌচাবস্থায় তুলসীপত্রে হাত দেবে না। কারণ—

"পূর্ণিমায়ামমায়াঞ্চ দ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে।
তৈলাভ্যঙ্গে চ স্নানে চ মধ্যাহ্নে নিশিসন্ধ্যয়োঃ ॥
অশৌচেঽশুচিকালে বা রাত্রিবাসোঽন্বিতা নরাঃ।
তুলসীং যে বিচিন্বন্তি তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ ॥"

শাস্ত্রেই এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া বেশ মনে হয় যে, ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে; নচেৎ অন্যান্য এত বৃক্ষ থাকিতে এরূপ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের এরূপ আদেশ হইবে কেন?

পুরাণাদি গ্রন্থে—তুলসী-বৃক্ষের উৎপত্তি-সম্বন্ধে দুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায়—১ম বিষ্ণুপুরাণমতে, ২য় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে।

প্রথম। বিষ্ণুপুরাণমতে—জলন্ধর নামে কোন রাক্ষস বিষ্ণুর বরলাভ করিয়া এত প্রবল ও দুর্দ্দান্ত হইয়া ওঠে যে, সে কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না, এমন কি, স্বর্গরাজ্য লাভের আশায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন। সুতরাং এ যুদ্ধে জলন্ধরের পতন অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া তাহার পতিপ্রাণা পত্নী বৃন্দা নিজ পতির জীবন-রক্ষার্থ একমনে বিষ্ণুর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাহারই ফলে জলন্ধর কোনরূপে পরাজিত হয় না। তখন দেবগণ সন্ত্রাসিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। অগত্যা দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দার তপোভঙ্গ করিলেন। তখন দেবগণ জলন্ধর রাক্ষসকে অনায়াসে নিধন করিয়া ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আনন্দিত হইলেন। অবশেষে বৃন্দা এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, বিষ্ণুকে অভিসম্পাত দিতে উদ্যতা হইলেন। তখন বিষ্ণু বৃন্দাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন—"হে সাধ্বি, তুমি স্বামীর অনুমৃতা হইলে তোমার ভস্ম হইতে যে বৃক্ষ হইবে, তাহা আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইবে।" তখন বৃন্দা স্বামীর অনুগামিনী হইলেন, এবং তাঁহার ভস্ম হইতে চারিটি বৃক্ষের উৎপত্তি হইল। তন্মধ্যে তুলসী-বৃক্ষ অন্যতম।

দ্বিতীয় উপাখ্যান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-মতে—তুলসী পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সখী ছিলেন। কোন কারণে শ্রীমতি তুলসীর প্রতি রুষ্টা হইয়া এই বলিয়া অভিসম্পাত দেন—"তুমি ধর্ম্মধ্বজের তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং দেবভোগ্যা না হইয়া অসুরভোগ্যা হইবে।" অতঃপর তুলসী ধর্ম্মধ্বজের তনয়া হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং যৌবন-প্রাপ্তা হইয়া শঙ্খচূড় নামক অসুরকে পতিত্বে বরণ করেন। কিছুদিন পরে শঙ্খচূড়ের সহিত দেবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পতিপ্রাণা তুলসী পতির মঙ্গলকামনায় বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে শঙ্খচূড়কে কেহই বধ

করিতে পারিল না। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু দেবগণের অনুরোধে শঙ্খচূড়ের বেশে তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করিলেন, এদিকে অসুররাজও নিহত হইল। অবশেষে পতিপরায়ণা তুলসী বিষ্ণুকে এই বলিয়া অভিসম্পাত দিলেন—

"হে নাথ তে দয়া নাস্তি পাষাণ-সদৃশশ্চ চ।
ছলেন ধর্ম্মভঙ্গেন মম স্বামী ত্বয়া হতঃ।
পাষাণ-সদৃশস্ত্বঞ্চ দয়াহীনো যতঃ প্রভো।
তস্মাৎ পাষাণরূপস্ত্বং ভব দেব ভবাধুনা॥"

অর্থাৎ হে নাথ, তুমি পাষাণ-সদৃশ, তোমার দয়ার লেশমাত্র নাই। কারণ. তুমি ছল করিয়া আমার স্বামীকে নিহত করিয়াছ। তুমি যখন এহেন পাষাণ-সদৃশ দয়াহীন, তখন তুমি পাষাণরূপ ধারণ কর এবং তুমি সেই পাষাণরূপেই জগতে পূজিত হইবে।

শ্রীভগবান্‌ও স্বীয় কর্ম্মে লজ্জিত হইয়া সাধ্বী সতীর দেহত্যাগে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন—

"ইদং শরীরং ত্যক্ত্বা চ দিব্যং দেহং বিধায় চ।
রাসে রম ময়া সার্দ্ধং ত্বং রমাসদৃশী ভব।
ইয়ং তনুর্নদীরূপা গণ্ডকীতি চ বিশ্রুতা।
পূতা সুপুণ্যদা নৃণাং পুণ্যা ভবতু ভারতে।
তব কেশ-সমূহশ্চ পুণ্যবৃক্ষো ভবিষ্যতি।
তুলসীকেশসম্ভূতঃ তুলসীতি চ বিশ্রুতঃ।
ত্রিলোকেষু চ পুষ্পাণাং পত্রাণাং দেবপূজনে।
প্রধানরূপা তুলসী ভবিষ্যতি বরাননে॥"

অর্থাৎ—"হে সাধ্বি, তুমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ কর এবং আমার সহিত রাসে রমণ কর। তোমার এই দেহ গণ্ডকী

নদীরূপে প্রবাহিত হউক এবং তোমার কেশসমূহ বৃক্ষরূপে পরিণত হউক। আর তোমার ঐ বৃক্ষ-পত্র ও পুষ্প এত পবিত্র হইবে যে, ঐ পত্র ও পুষ্প সকল দেবতার পূজার প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইবে।" সেই হেতুই তুলসী-বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প-মঞ্জরী এত পবিত্র এবং দেবপূজার প্রধান উপকরণ।

এদিকে সতীসাধ্বীর বাক্য ত' মিথ্যা হইবার নয়; সুতরাং ভগবান্ বলিলেন—

"অহঞ্চ শৈলরূপী চ গণ্ডকীতীরসন্নিধৌ।
অধিষ্ঠানং করিষ্যামি ভারতে তব শাপতঃ॥"

অর্থাৎ হে সাধ্বি, আমিও তোমার শাপে পাষাণময় হইয়া গণ্ডকীতীরে অবস্থান করিব—এবং বাস্তবিকই গণ্ডকী নদীর তীরেই শালগ্রাম পাওয়া যায়—এ যে স্বয়ং শ্রীহরির বাক্য।

এগুলি সব শাস্ত্রের কথা; সুতরাং যাঁহাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা এ সমুদয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-সভ্যতার অবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে অনেকেরই শাস্ত্রে তত শ্রদ্ধা নাই। তাঁহারা বলেন, যদি বিজ্ঞান দ্বারা দেখাইয়া দিতে পার, এ সমুদয় সত্য, তবেই বিশ্বাস্য, নচেৎ বিশ্বাস করিব কিরূপে?

তবে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের রমণীগণ এখনও শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন এবং শাস্ত্রমত যথাসাধ্য কার্য্য করিতে চেষ্টা করেন। তা হউক না পুরুষেরা অবিশ্বাসী, তাহাতে তাঁহাদের কিছু আসে যায় না। তাই এখনও হিন্দুর গৃহে তুলসী-বৃক্ষ সযত্নে রোপিত হয়—যথাযথ জলসিঞ্চন দ্বারা বর্দ্ধিত হয় এবং তাঁহারা বৈশাখ মাসে জলধারা দিবার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া গৃহে লক্ষ্মীশ্রী আনয়ন করিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিয়া থাকেন।

কার্ত্তিকমাসে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়া গললগ্নীবস্ত্রে নারীগণ প্রণাম করিতে করিতে বলেন—

তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুলসী হরি বৃন্দাবন
তোমার তলে দিই আলো
পরকালে করো ভালো।

আবার ছোট ছোট শিশু-সন্তানদিগের নজর লাগিলে বা কোন প্রকার সামান্য সামান্য ব্যাধি হইলে, হিন্দুরমণীগণ ভক্তিসহকারে তুলসীতলে একটি ছোট ঘটী জলপূর্ণ করিয়া, একটি তুলসীপত্রের উপর বসাইয়া রাখেন এবং জলমধ্যে একটি তুলসী-পত্র ও খড়িকা দিয়া রাখেন। সন্ধ্যার পর তুলসীকে প্রণাম করিয়া, সেই ঘটির দুই-চারি ফোঁটা জল শিশুসন্তানকে পান করাইয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, অধিকাংশ সময়ে শিশুসন্তানগণ নীরোগী হইয়া উঠে। তাঁহাদের বিশ্বাস, তুলসীর কৃপাদৃষ্টিই এরূপ আরোগ্যের মূল।

তুলসীমাহাত্ম্য সম্বন্ধে কাশীরাম দাসের মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

একদিন মহর্ষি নারদের উপদেশমত সত্যভামা একটী ব্রত করেন এবং অবশেষে তাঁহার আদেশ মত তুল করিলেন। এই ব্রতে শ্রীকৃষ্ণকে তুলের একধারে বসাইয়া অন্যধারে নানাবিধ ধনরত্নাদি চাপাইয়া দিলেন; ইচ্ছামত রত্ন দিয়া তাঁহার তুল হইবে, সমুদয় নারদকে দান করিবেন; কিন্তু এ কি হইল—

এক ভিতে বসাইল দেবকীনন্দন
আর ভিতে বসাইল যত রত্নধন।
সত্যভামা-গৃহে রত্ন যতেক আছিল
তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল।

ক্রমে রুক্মিণী, কালিন্দী, নাগ্নজিতী, জাম্ববতী, প্রভৃতি রমণীগণের গৃহের যত ধনরত্ন দিল—তবু তুল সমতল হইল না। তখন—

দ্বারকাবাসীর দ্রব্য যার ছিল যথা
না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা।

তখন সত্যভামা কান্দিয়া আকুল, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না—অবশেষে উদ্ধবের কথামত—

এত বলি আনি এক তুলসীর দাম
তাহে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম।
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত
ভারী হইল তুলসী উঠিলা জগন্নাথ।

এখানেও সেই তুলসীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুর প্রত্যেক শুভকর্ম্মে তুলসীর সেবা—তুলসীর পূজা।

আবার যখন হিন্দুর বাটীতে সহসা কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন হিন্দুরমণীগণ তুলসীর জন্য "হরিলুটের" ব্যবস্থা করেন। ইহার পরও কি বলিতে হইবে, হিন্দুর গৃহে তুলসীর আধিপত্য কত দূর?

এতদ্ভিন্ন আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, তুলসীজল এত পবিত্র যে, ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রত্যহ তুলসী-জল দিয়া শ্রীহরির পূজা করিতে করিতে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিতেন—হে হরি! একবার দয়া করিয়া এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়া, পাপিগণকে উদ্ধার করুন এবং যাহাতে আপনার নাম-মাহাত্ম্য এই মর্ত্ত্যধামে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন। শ্রীভগবান্‌ও ভক্তের তুলসীজলে তুষ্ট হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

"যাঁহার তুলসীজলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণসহিত চৈতন্যের অবতারে।"

আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতেও আছে—

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য
অদ্বৈত-আচার্য্য নাম সর্ব্বলোকে ধন্য।
তুলসী-মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে
নিরবধি সেবি কৃষ্ণে মহাকুতূহলে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে।

সুতরাং তুলসীমঞ্জরী দ্বারা পূজা করিলে ভগবান্ কিরূপ সন্তুষ্ট হন—তাহার সাক্ষাৎ-প্রমাণ কেবলমাত্র লোকভুলান শাস্ত্রবাক্য নহে।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতেই তুলসীর সেবা ও তুলসীর মাহাত্ম্যের প্রচার হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শাস্ত্রগ্রন্থদ্বয় হইতে বেশ বুঝা গেল, শ্রীচৈতন্যের বহুপূর্ব্ব হইতেই হিন্দুর তুলসীমাহাত্ম্যে বিশ্বাস ছিল এবং সে বিশ্বাস অটল, দৃঢ় ও চিরস্থায়ী।

শাস্ত্রেও আছে—

"সত্যে সত্যবতী চৈব ত্রেতায়াং মানবী তথা।
দ্বাপরে অবতীর্ণাসি বৃন্দা ত্বং তুলসী কলৌ॥"

অর্থাৎ যিনি সত্যযুগে সত্যবতী, ত্রেতাযুগে মানবী, দ্বাপরে বৃন্দা, তিনিই কলিতে তুলসীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

অন্যদিকে আমরা বৈদ্যশাস্ত্রে দেখিতে পাই, তুলসীবৃক্ষ পাঁচ প্রকার। যথা :—

"সুরসা বর্ব্বরশ্চৈব সুমুখঃ ফণিমজ্জকঃ।
কুঠেরকার্জ্জকশ্চেতি তুলসী পঞ্চধা স্মৃতা॥"

অর্থাৎ—১। সুরসা—গ্রাম্যতুলসী :—Ocymum Sanctum.

২। বর্ব্বর—বা বাবুই তুলসী—Ocymum Pilosum Roxb.

৩। সুমুখঃ—বা দুলালতুলসী O. Carys phyllatum Roxl

৪। ফণিমজ্জকঃ—বা রামতুলসী O. Gratiss'mum Wild.

৫। অর্জ্জককুঠেরক—বিল্বগন্ধী তুলসী O. Villosum.

দ্রব্যগুণাবলীতে লিখিত আছে :—

"তুলসী লঘুরুষ্ণা চ রুক্ষা কফবিনাশিনী।
ক্রিমিদোষং নিহন্ত্যেষা রুচিকৃদ্বহ্নিদীপনী॥"

এ স্থলে কয়েকটি বাক্যের অর্থ বিশেষভাবে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক; কারণ, বৈদ্যশাস্ত্রে এমন অনেক বাক্য ব্যবহৃত হয়, যাহা অভিধানে পাওয়া যায় না—বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন,—

(ক) লঘু—গুরুর বিপরীত—

গুরুর অর্থ—"সাদোপলেপবলকৃদ্ গুরুস্তর্পণ বৃংহণঃ" অর্থাৎ যাহা সাদকৃৎ (অঙ্গগ্লানিজনক)

উপলেপকৃৎ—(মলবৃদ্ধিকারী)
বলকৃৎ—(বলকারক)
তর্পণ—(তৃপ্তিজনক) (যেমন দ্রাক্ষাদি)
বৃংহণ—(দেহবৃদ্ধিকারক) (ধাতুবলবৃদ্ধিকর)

লঘু, গুরুর বিপরীত—"লঘুস্তদ্বিপরীতঃ স্যাল্লেখনো রোপণস্তথা" অর্থাৎ যে দ্রব্য লঘু, তাহা তর্পণ, সাদ, বৃংহণ, উপলেপ ও বলকৃৎ নহে। অপিচ, উহা লেখন (বৃংহণের বিপরীত অর্থে অর্থাৎ ধাতু-বলক্ষয়কর) এবং ক্ষতরোপণ।

"ধাতূন্-মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ"

অর্থাৎ যে বস্তু শরীরের ধাতু ও মল শোষণপূর্ব্বক কৃশ করে, তাহাকে কায়চিকিৎসকগণ লেখন বলেন—যেমন মধু, উষ্ণজল, বচ ও যব।

(খ) উষ্ণ—অমুক দ্রব্য শীত বলিলে বুঝাইবে যে, উহা হ্লাদন (সুখকারী), স্তম্ভন (অতিসার ও রক্তপ্রবৃত্তিরোধক) এবং মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা,

দাহ ও ঘর্ম্মপ্রশমনকারী। আর উষ্ণ তাহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ সুখকর নহে, অভিসারাদির রোধক নহে, অপিচ মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্মজনক এবং ব্রণাদিকে পাকাইয়া দেয়।

"হ্লাদনঃ স্তম্ভনঃ শীতো মূর্চ্ছাতৃড়্দাহস্বেদজিৎ।
উষ্ণস্তদ্বিপরীতঃ স্যাৎ পাচনশ্চ বিশেষতঃ॥"

(গ) রুক্ষ—রুক্ষ, স্নিগ্ধের বিপরীত গুণান্বিত।

অর্থাৎ উহা কর্কশতা ও কাঠিন্যের জনক, বল ও বর্ণের হ্রাসকারী এবং বিশেষতঃ খর ও স্তম্ভক।

খর—দাহজনক, স্তম্ভক—বায়ুপ্রকোপকারী (যেমন কুটজ, শোণাক)।

"স্নেহো মার্দ্দবকৃৎ স্নিগ্ধো বলবর্ণকরস্তথা।
রুক্ষস্তদ্বিপরীতঃ স্যাদ্বিশেষাৎ স্তম্ভনঃ খরঃ॥"

(ঘ) দীপনী—যে বস্তু পাচকাগ্নি দীপ্ত করে, কিন্তু আম পরিপাক করিতে পারে না। যেমন মৌরী।

এক্ষণে বুঝা গেল—তুলসী লঘু, উষ্ণ, রুক্ষ, কফবিনাশিনী, ক্রিমিদোষনষ্টকরী, রুচিকর ও পাচকাগ্নিদীপনকারী।

১। সুরসা—অর্থাৎ অধুনা দেশে দেশে সচরাচর যে তুলসী ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই সুরসা তুলসী বলে। ইহা গৃহে গৃহে ও গ্রামে গ্রামে সুলভ।

ধন্বন্তরি ইহাকে গ্রাম্যা, সুরভি, বহুমঞ্জরী ও দেবদুন্দুভি বলিয়াছেন। আর নরহরি ইহাকে পূতপত্রী ও বিষ্ণুবল্লভা বলিয়াছেন। এই সুরসা তুলসী আবার বর্ণভেদে দুই প্রকার দেখা যায়, কিন্তু উভয়ই একগুণবিশিষ্ট।

"শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা।"

ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে চরক বলেন—

"সক্ষৌদ্রাঃ কফকাসঘ্নাঃ সুরসাস্তসিতারসাঃ।"

অর্থাৎ—কৃষ্ণ সুরসার রস মধুর সহিত সেবন করিলে কফজ কাস বিনাশ পায়।

হারীত বলেন—

"শ্লৈষ্মিকে সুরসা-বাসা-রসেন বিহিতঞ্চ তৎ"।

অর্থাৎ—সুরসা ও বাসক উভয়ের রস মিলিত করিয়া নাস লইলে নাসারোগ আরোগ্য হয়।

ভাবমিশ্র বলেন—ইহা "স্নিগ্ধং, বাতহরং শ্লেষ্মকরং বৃষ্যং বলাবহম্।" অন্যদিকে আধুনিক বিচক্ষণ বৈদ্যগণ বলেন—তুলসী-পত্রের সহিত শুঁঠ ও শ্বেত মরিচ পেষণ করিয়া দুই বেলা সেবন করিলে সবিরাম ও অবিরাম উভয়বিধ জ্বররোগ হইতে আরোগ্যলাভ করা যায়।

আবার কেহ কেহ বলেন—আজকাল আমরা যাহাকে ম্যালেরিয়া জ্বর নামে অভিহিত করি, উক্ত জ্বরে তুলসী ও অশ্বত্থ উভয় বৃক্ষই বিশেষ উপকারী।

বাটীর চতুর্দ্দিকে, বিশেষতঃ শয়নগৃহের চারিদিকে বহুপরিমাণে তুলসীবৃক্ষের মঞ্চ করিয়া রাখিলে ম্যালেরিয়া প্রশমিত হয়।

তুলসীবৃক্ষের কল্ক দ্বারা পক্বতৈলের নাস লইলে কর্ণশূল ও পুতিন সাস্রাবে বিশেষ হিতকর।

লেবুর রসসহ তুলসী-পত্র পিষ্ট দিয়া দদ্রুগ্রস্ত স্থানে মর্দ্দন করিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

সুপক্ব তুলসী-মঞ্জরী—পিচ্ছিল (ভগ্ন ও ছিন্ন) মূত্রপ্রদ ও মূত্রকৃচ্ছ্র ব্যাধিতে ও কাসে প্রযোজ্য।

২। বর্ব্বর—রাঢ়ে ইহাকে বাবুই তুলসী বলে—আর কোচ-বিহারে ইহাকে বাবর বলে। ইংরাজীতে O. Pilosum এবং মুসলমানেরা বাবরী তুলসী বলে।

ইহা ঘর্ম্মকারক, পিচ্ছিল, বায়ুনাশক ও উষ্ণ।

পিচ্ছিল—"পিচ্ছিলো জীবনো বল্যং সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।"

অর্থাৎ যাহা পিচ্ছিল, তাহা জীবন ও প্রাণধারক, বলজনক। সন্ধান, শ্লেষ্মল ও গুরু।

সন্ধান—অর্থাৎ ভগ্ন ও ছিন্নের সংযোজক। সুতরাং বর্ব্বর তুলসীর পাতা পিষ্ট করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এমন কি, ভগ্ন অস্থিও সংযুক্ত করে। ইহার প্রলেপে ব্রণাদি পাকিয়া যায়; সুতরাং বিনা অস্ত্রে বর্ব্বর তুলসীর প্রলেপে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বৈদ্যশাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, বর্ব্বর তুলসী আমাতিসার, গণোরিয়া, কফরোগ, প্রসবের পরবর্ত্তী বেদনা, জীর্ণ-জ্বরের পীতাবস্থায় এবং বমন-প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। কর্ণশূলে ইহার রস বিন্দু বিন্দু করিয়া কর্ণরন্ধ্রে পাতিত করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা রক্তমূত্র, বৃক্কের পীড়া, আম বা রক্তাতিসারে ও কাসরোগে সেবিত হইয়া থাকে। ইহার বীজ জলে ভিজাইয়া আলোড়িত করিলে অণ্ডলালবৎ প্রাপ্ত হয়—তাহাই শুক্রমেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহার শিকড় পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে রক্তামাশয়রোগ এক-দিনে আরোগ্য হয়।

৩। সুমুখ—বঙ্গদেশে ইহা ছুলাল তুলসী নামে প্রসিদ্ধ। ধন্বন্তরি যাহাকে সুমুখ বলিয়াছেন, নরহরি তাহারই নাম দিয়াছেন বনবর্ব্বর বা বনবর্ব্বরিকা। ইহার পর্য্যায়—সুগন্ধি, কটুপত্র, সূক্ষ্মপত্রক, নিদ্রালু, শোকহারী।

আবার সুবক্তু, স্বাস্থ্য, সুবদন—নাম পাঠ করিয়া বোধ হয়—মুখ-মারুত সুরভি করিবার জন্য এই তুলসীর পত্রমঞ্জরী ব্যবহৃত হইত।

পল্লীগ্রামে এখনও লোকে তামাক সুগন্ধি করিবার জন্য ইহার পত্র ও মঞ্জরী ব্যবহার করেন। ইংরাজীতে ইহাকে Ocymum Caryophy-llotum Rexb বলে।

৪। **ফণিমজ্জকঃ—রামতুলসী** O. Gratissimum Wild. কোন কোন স্থানে রামদুলালী তুলসীও বলে।

সকল প্রকার তুলসীপাতার রস বোল্‌তা-ভীমরুল-দষ্ট স্থানে লাগাইলে জ্বালাযন্ত্রণা ভাল হয়। আর বৃশ্চিক কামড়াইলে এই তুলসীর পাতা বাটিয়া বেশ করিয়া প্রলেপ দিলে অচিরে জ্বালাযন্ত্রণা দূর হইয়া যায়। তবে কখন কখন একটু হিংসক বাটিয়া প্রলেপ দিলে অতি সত্বর আরোগ্যলাভ হয়।

শিশুদের গলা ঘড়-ঘড় করা ও পাঁজর টানা, কাসি ও নাক দিয়া জল পড়ায় এই তুলসীর রস খাওয়াইলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

দাদরোগে এই তুলসীর মূল, সোহাগার খৈ ও গন্ধক সমভাবে লইয়া কাগজী বা পাতিনেবুর রসে উত্তমরূপে পিষিয়া দাদে লাগাইলে ভাল হয়। একদিনে ৩।৪ বার লাগাইতে হয়। কিন্তু ঔষধ লাগাইবার সময় একখণ্ড ঘুঁটে দিয়ে চুলকাইয়া লইলে ভাল হয়। কখনও যেন নখ দ্বারা চুলকাইবেন না।

হামজ্বরে এই তুলসীমঞ্জরী ৴১ ও মেথি ৴০ এবং কুড় এক পাই, একপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া সকালে সন্ধ্যায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

রাজনিঘণ্টুতে আছে—

"বনবর্ব্বরিকা চোষ্কা সুগন্ধী কটুকা চ সা।
পিশাচবান্তিভূতঘ্নী ঘ্রাণসন্তর্পণী পরা॥"

৫। **অর্জ্জক ও কুঠেরক**—নরহরি যাহাকে অর্জ্জক বলেন, ধন্বন্তরি তাহাকেই কুঠেরক বলিয়াছেন। উভয়ই এক, বিভিন্ন নহে।

ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—"কুঠেরকস্তু বৈকুণ্ঠঃ ক্ষুদ্রপর্ণোঽর্জ্জকস্তথা"

অর্থাৎ ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট অর্জ্জককে কুঠেরক বলে।

"বটপত্রঃ কুঠেরোঽন্যঃ পর্ণাসো বিল্বগন্ধকঃ"

অর্থাৎ যাহার পত্র গোল ও বৃহৎ এবং যাহার গন্ধ বিল্বপত্র তুল্য, তাহা বটপত্র, কুঠের বা পর্ণাস।

নরহরি বলেন—"অর্জ্জকঃ ক্ষুদ্রতুলসী ক্ষুদ্রপর্ণো কুঠেরকঃ।
সিতার্জ্জকস্তু বৈকুণ্ঠো বটপত্রঃ কুঠেরকঃ।
কৃষ্ণার্জ্জকঃ কৃতমালো শালুকঃ কৃষ্ণশালুকঃ॥"

অর্থাৎ—সিতার্জ্জক বা পর্ণাস...**শ্বেততুলসী** আর কৃষ্ণার্জ্জক বা শালুক—**কৃষ্ণতুলসী** নামে প্রসিদ্ধ। ইংরাজীতে Ocymum Villosum বলে। অতএব বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, তুলসীবৃক্ষ বহুবিধ উদ্ভিদের আধার। কাজেই আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলেও অন্ততঃ বিশেষ উপকারী উদ্ভিদ আধার বলিয়া এরূপ বৃক্ষকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা উচিত নয় কি? নাই বা রহিল ধর্মে বিশ্বাস, নাই বা রহিল শাস্ত্রে বিশ্বাস।

তুলসী মহিমা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা নিজে তুলসীকে শ্রদ্ধা বা ভক্তি না করিলেও আমাদের রমণীগণ এখনও তুলসীকে যেরূপ ভক্তি করেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, অন্ততঃ আরও কয়েক শতাব্দী এইরূপভাবে চলিবে। তবে

দুরদৃষ্টবশতঃ যাঁহার বাটী এরূপ রমণীরত্ন-বিবর্জ্জিত, তাঁহার দুঃখে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত।

বঙ্গাল কবি স্ত্রীবিয়োগের পর "এষা" নামক গ্রন্থে যে-সকল দুঃখময় জীবন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারই একস্থানে আছে :—

হে পূত তুলসি বিষ্ণুর প্রেয়সি
বিবর্ণ তোমার দল,
প্রভাতে আসিয়া প্রণাম করিয়া
কেবা মূলে ঢালে জল।
সন্ধ্যায় আসিয়া গলে বস্ত্র দিয়া
কেবা তলে দীপ জ্বালে,
নীরস মঞ্জরী পড়ে ঝরি ঝরি
লুতা-তন্তু ডালে ডালে।
বলিত আমায় নমিতে তোমায়
দুগ্ধ-পুষ্প-তিল দিয়া,
তোমার নিশ্বাসে সর্ব্বরোগ নাশে
যায় দুঃখ পলাইয়া।

বাস্তবিক এরূপ এক সরলহৃদয়া, দেবীতুল্যা রমণীর অভাবে তুলসীর সেবার ব্যাঘাত ঘটিয়া সংসারকে আরও বিষাদময় করিয়া তুলে।

আশা করি, এখনও আমাদের অনেক হিন্দুর গৃহে এরূপ সুগৃহিণী বিরাজিতা থাকিয়া সংসারকে স্বর্গাদপি মধুময় করিয়াছেন।

তুলসীর সেবা ও পূজার ফল যাইবে কোথায়? কারণ—

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে আছে—

অন্তর্য্যামী রূপে কৃষ্ণ আছেন ইহায়,
এই জ্ঞানে তৃণে যদি করে মাননায়।

তবে তাহাদের নিষ্ঠা পূজাতে জন্ময়,
নিষ্ঠা হৈতে চিত্তের শোধন ক্রমে হয়।
চিত্ত শুদ্ধ হলে পরে কিবা থাকে বাকি,
কৃষ্ণ তারে দয়া করে, তাঁরি পদে রাখি।

এই জন্যই শ্রীভগবান্ স্বয়ং সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন, সত্যভামা! তুমি স্থির জানিও যে—

"দারিদ্র্যদুঃখ-রোগার্ত্তি-পাপানি সুবহূন্যপি।
হরতে তুলসীক্ষেত্রং রোগানিব হরীতকী॥"

অর্থাৎ—এক হরীতকী যেমন রোগসমূহ দূর করে, তদ্রূপ তুলসী-দেবীও দারিদ্র্যদুঃখ, রোগ, শোক ও সর্ব্ববিধ পাপ আশু ধ্বংস করিয়া দেন।

অতএব তুমি প্রত্যহ তুলসীদেবীকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান-পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিযা, ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া, এই বলিয়া প্রণাম করিবে—

"যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী, স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী,
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥"

—তুলসী-গীতা।

অর্থাৎ—যাঁহাকে দেখিলে নিখিল পাপসমূহ ধ্বংস পায়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, যাঁহাকে অভিনন্দন করিলে রোগরাশি বিদূরিত হয়, যাঁহার সিক্তজল স্পর্শ করিলে অন্তকভয় বিদ্যমান থাকে না, যাহাকে রোপণ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রত্যাসত্তি জন্মে, যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিলে মুক্তিফললাভ হয়—সেই তুলসীদেবীকে নমস্কার।

ইহার পর তুলসী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং এই-খানে আমি তুলসীদেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক বলি—হে তুলসীদেবি—

"ভগবত্যাস্তুলস্যাস্তু মাহাত্ম্যামৃতসাগরে।
লোভাৎ কুর্দ্দিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্রস্তৎ ক্ষম্যতাম্ ত্বয়া॥"

আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও আজ লোভবশে যে তোমার মাহাত্ম্যরূপ অমৃত সাগরে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি কৃপাপরবশ হইয়া আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর।

———

সমাপ্ত